# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যং সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

সম্পাদক

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

সপ্তদশকল্প।

তৃতীয় ভাগ।

১৮৩১ শক।

কলিকাতা

আদি-ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

সাল ১৩১৬। সম্বৎ ১৯৬৬। কলিগতাব্দ ৫০১০। ১ চৈত্র, মঙ্গলবার।

মূল্য ৩ টাকা মাত্র।

# তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সপ্তদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র /০

## বৈশাখ ৭৮৯ সংখ্যা।



## জ্যৈষ্ঠ ৭৯০ সংখ্যা।



## আষাঢ় ৭৯১ সংখ্যা।



## শ্রাবণ ৭৯২ সংখ্যা।



## ভাদ্র ৭৯৩ সংখ্যা।



## আশ্বিন ৭৯৪ সংখ্যা।



## কার্ত্তিক ৭৯৫ সংখ্যা।



## অগ্রহায়ণ ৭৯৬ সংখ্যা।



## পৌষ ৭৯৭ সংখ্যা।



## মাঘ ৭৯৮ সংখ্যা।



## ফাল্গুন ৭৯৯ সংখ্যা।



## চৈত্র ৮০০ সংখ্যা।

# অকারাদি বর্ণক্রমে সপ্তদশ কল্পের তৃতীয় ভাগের সূচীপত্র।

সপ্তদশ-কল্প
তৃতীয় ভাগ।
বৈশাখ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৮৯ সংখ্যা ১৮৩১ শক

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

## মঙ্গল।

(তৃতীয় উপদেশের অনুবৃত্তি)

আর একটি নীতিবাদের কথা বলিব যাহার বাহিরটা দেখিতে বেশ উন্নত কিন্তু যাহার ভিতরে একটা দূষিত নীতি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কেহ কেহ এইরূপ বিশ্বাস করেন যে, কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই চারিত্র-নীতির ভিত্তি স্থাপিত। সেই ইচ্ছার অনুসরণ ও লঙ্ঘনের সহিতই ঈশ্বর দণ্ড পুরস্কার জুড়িয়া দিয়াছেন, এবং সেই দণ্ড পুরস্কারের দ্বারা চালিত হইয়াই মনুষ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়।

এই বিষয়টি একটু সংকোচের সহিত আলোচনা করিতে হইবে।

এ কথা সত্য,—বিবিধ যুক্তির দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হয় যে ঈশ্বরই নীতির চরম ও পরম মূলতত্ত্ব;—এমন কি ইহা বেশ বলা যাইতে পারে যে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই মঙ্গল; কেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই সনাতন ন্যায়ধর্ম্মেরই অভিব্যক্তি যাহা তাঁহার মধ্যে নিত্য অবস্থিত। অবশ্য ঈশ্বরের এই ইচ্ছা—তিনি যে ন্যায়ের নিয়ম আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃদয়ের মধ্যে নিহিত করিয়াছেন, সেই নিয়ম অনুসারে আমরা কাজ করি; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হয় না,—তাঁহার খামখেয়ালি ইচ্ছা অনুসারে তিনি এই নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন। সে কথা দূরে থাকুক,—ন্যায়ের নিয়ম ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে এই জন্যই রহিয়াছে, যেহেতু সেই নিয়মের মূল তাঁহার জ্ঞানের মধ্যে, তাঁহার অন্তরতম স্বরূপের মধ্যেই চিরবিদ্যমান।

ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর যে নীতিবাদ স্থাপিত, সেই নীতিবাদের মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহা বাদ দিয়া তাহার মধ্যে যাহা মিথ্যা, যাহা অসঙ্গত, যাহা নীতিবিরুদ্ধ তাহাই আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

প্রথমত, যে কোন ইচ্ছাই হউক না কেন,—ইচ্ছার দ্বারা যেমন সত্য সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সেইরূপ ইচ্ছার দ্বারা মঙ্গলকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। ঐশ্বরিক ইচ্ছা সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা আমাদের নিজের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন।

ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিলে, এই দুই ইচ্ছার মধ্যে অসীম ও সসীমের প্রভেদ ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই। এখন দেখ, আমরা ইচ্ছার দ্বারা আমি লেশমাত্রও সত্যকে স্থাপন করিতে পারি না। আমার ইচ্ছা সসীম বলিয়াই কি পারি না? না, তাহা নহে; অসীমশক্তিসমন্বিত হইলেও ইচ্ছা এই বিষয়ে সমান অশক্ত। আমার ইচ্ছার প্রকৃতিই এই,—কোন কাজ করিবার সময় এই জ্ঞানটি থাকে,—আমি ইচ্ছা করিলে ইহার উল্টাটাও করিতে পারি; আর ইহা ইচ্ছার একটা আগন্তুক লক্ষণ নহে, ইহাই ইচ্ছার মুখ্য লক্ষণ; অতএব, এরূপ যদি মনে করা যায়, সত্য কিংবা সত্যের যে অংশকে ন্যায় বলে, তাহা—কি ঐশ্বরিক, কি মানবিক—কোন ইচ্ছার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, অন্য কার্য্যের দ্বারা অন্য আর কিছু স্থাপিত হইতেও পারিত; অন্যায়কে ন্যায় করা যাইতে পারিত, ন্যায়কে অন্যায় করা যাইতে পারিত; কিন্তু এরূপ অধ্রুবতা ন্যায় ও সত্যের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। বাস্তবপক্ষে, দার্শনিক তত্ত্বসমূহের ন্যায় নৈতিক তত্ত্বগুলিও স্বতঃসিদ্ধ ধ্রুবসত্য। কারণ ব্যতীত কার্য্যের সদ্ভাব, বস্তু বিনা গুণের সদ্ভাব ঈশ্বরও ঘটাইতে পারেন না; সত্য পালন করা, সত্যকে ভালবাসা, প্রবৃত্তিসমূহকে সংযত করা মন্দ—ইহাও ঈশ্বর স্থাপন করিতে পারেন না। জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধ সূত্রগুলির ন্যায় নৈতিক সূত্রগুলিও অপরিবর্ত্তনীয়। মন্‌টেস্‌কিউ সমস্ত নিয়ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ যাহা বলিয়াছেন, নৈতিক নিয়মের সম্বন্ধে সে কথা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে। ইহা সেই সব অবশ্যম্ভাবী সম্বন্ধ যাহা বস্তুসমূহের নিজস্ব প্রকৃতি কিংবা স্বরূপ হইতে উৎপন্ন।

ধরিয়া লও,—মঙ্গল ও ন্যায় ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আছে তাহাও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। কিন্তু কোন ইচ্ছার দ্বারাই অবশ্যকর্ত্তব্যতা স্থাপিত হইতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছা—একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের ইচ্ছা;—আর আমি একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব। একজন সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের সহিত একটি ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীবের এই যে সম্বন্ধ—ইহার মধ্যে কোন নৈতিক ভাব থাকিতে পারে না। বলের দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন বলবান্ ব্যক্তির আজ্ঞা আমরা পালন করি, কিন্তু অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে তাহা পালন করি না। ঈশ্বরের অন্যান্য উপাধি হইতে যদি মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পৃথক্ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখিব, ঐশ্বরিক ইচ্ছা-প্রেরিত দুর্লঙ্ঘ্য আদেশের মধ্যে ন্যায়ের কণামাত্রও কিরণ নাই; সুতরাং তাহা হইতে অবশ্য কর্ত্তব্যতার কণা মাত্র ছায়াও আমার হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে না।

কেহ কেহ এই কথা বলিয়া উঠিবেন:—এই যে অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও ন্যায়—ইহা ঈশ্বরের খাম্‌খেয়ালী ইচ্ছা হইতে নহে পরন্তু ঈশ্বরের ন্যায়-ইচ্ছা হইতেই স্থাপিত হইয়াছে। বেশ কথা। তাহা হইলে ত সবই উল্‌টাইয়া যায়। তবেই দাঁড়াইতেছে—নিরবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার উৎপত্তি নহে, পরন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহার ইচ্ছা নিয়মিত হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে যে ন্যায়ধর্ম্ম অবস্থিত, সেই জ্ঞানই, সেই ন্যায়ধর্ম্মই এই অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আমাদের মনে আনিয়া দেয়। অতএব, ন্যায়-অন্যায়ের যে প্রভেদ, তাহা তাঁহার ইচ্ছার কার্য্য নহে।

এই দুইয়ের মধ্যে একটা হওয়া চাই :— যদি কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছার উপরেই ধর্ম্মনীতিকে স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে ভাল মন্দের প্রভেদ, ন্যায় অন্যায়ের প্রভেদের কোন মূল্য থাকে না, এবং তাহা হইলে ধর্ম্মনীতির মধ্যে অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাবও কিছুই থাকে না। আবার যদি ন্যায়কেই ঈশ্বরেচ্ছার প্রমাণ বলিয়া ধর, যে ন্যায়, তোমার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই প্রামাণিকতা লাভ করে,—তাহা হইলে তুমি চক্র-ন্যায়ের ভ্রমে পতিত হইবে।

আর একটা চক্র-ন্যায়ের ভ্রম আরও স্পষ্টরূপে এই স্থলে লক্ষিত হয়। প্রথমে, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম উৎপন্ন— এই সিদ্ধান্ত বৈধরূপে স্থাপন করিতে হইলে, বাধ্য হইয়া তোমাকে মানিয়া লইতে হয় যে, এই ইচ্ছা ন্যায়মূলক, কিন্তু আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, শুধু এই ইচ্ছা হইতে ন্যায়ধর্ম্ম কখনই স্থাপিত হইতে পারে না। তা ছাড়া, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যদি পূর্ব্ব-হইতেই তোমার মনে ন্যায় সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা না থাকে, ঈশ্বরের কোন্ ইচ্ছা ন্যায়মূলক তাহা তুমি বুঝিতেই পারিবে না।

এক পক্ষে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি তাহা না জানিয়াও ন্যায় সম্বন্ধে তোমার একটা ধারণা থাকিতে পারে ও আছে; পক্ষান্তরে, ন্যায় সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা না থাকিলে, ঐশ্বরিক ইচ্ছার ন্যায্যতা তুমি বুঝিতে পারিবে না।

এখন দেখ, আমরা যে নীতিবাদ সম্বন্ধ বিচার করিতেছি তাহার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি এই ;—শুধু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই অমুক কাজ ন্যায্য ও অমুক কাজ অন্যায্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। শুধু একটা খামখেয়ালি আদেশের দ্বারাই যে এই ইচ্ছা অভিব্যক্ত হইতেছে তাহা নহে,—আবার এই ইচ্ছা, ঐ আদেশের সঙ্গে আশা ও ভয়ের ভাব জুড়িয়া দিয়াছে।

পারলৌকিক দণ্ডের ভয় ও পুরস্কারের আশা কোন্ মানব-বৃত্তির উপর কার্য্য করে? যে বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আমারা ইহলোকেই দুঃখকে ভয় করি, ও সুখের অন্বেষণ করি, সেই একই বৃত্তির উপর কাজ করে,—সেই বৃত্তিটি কি?—না, কল্পনার দ্বারা উত্তেজিত আমাদের ঐন্দ্রিয়িক অনুভবশক্তি অর্থাৎ আমাদের সেই বৃত্তি যাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তনশীল, এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহার তারতম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। পারলৌকিক সুখ ও দুঃখ, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা জ্বলন্ত অথচ চলন্ত দুইটি ভাবকে আমাদের অন্তরে, উত্তেজিত করে—সে দুইটি ভাব কি?— না, আশা ও ভয়। বয়স, স্বাস্থ্য, একখণ্ড চলন্ত মেঘ, সূর্য্যের একটি রশ্মি, এক পেয়ালা কাফি, এবং এইরূপ অসংখ্য পদার্থ— সমস্তই আমাদের আশা ও ভয়ের উদ্রেক করে। আমি এমন কতকগুলি লোককে জানি—এমন কি, এরূপ কতকগুলি দার্শনিক পণ্ডিতকে জানি, কোন কোন দিনে যাঁহাদের আশার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আর ইহারই উপর কিনা নীতির ভিত্তি পত্তন করিতে হইবে! ফলত ঐ নীতিবাদ, মানব-আচরণে শুধু একটা স্বার্থের উদ্দেশ্য খাড়া করিতে চাহে—তাহা ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্য্যের ফলাফল গণনা করিয়া আমি যে কাজ করি, সেই গণনা ঠিক্ হইতেও পারে ; তাহার দ্বারা আমি খুব সুখেরও আশা করিতে পারি ; কিন্তু তাহার মধ্যে এমন কোন ন্যায়ের ভাব দেখিতে পাই না যাহা অবশ্য

কর্ত্তব্য বলিয়া কোন কার্য্য করিতে আমাকে বাধ্য করিতে পারে; অথবা এই গণনা করিতে পারা, কি না-পারার মধ্যে, কোন পাপ পুণ্যও দেখিতে পাই না, (যদিও প্যাস্‌কাল তাহা দেখিতে পান); ফল কথা, আমাদের অনুভবশক্তি ও কল্পনাশক্তির তারতম্য অনুসারে, আমাদের প্রত্যেকের মনে আশা ও ভয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। শেষ কথা, পারলৌকি সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কারের আকারেই প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সব কর্ম্মই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য যাহা আসলে ভাল কিংবা আসলে মন্দ। যদি ভাল মন্দ বলিয়া আসলে কোন জিনিস না থাকে, ভাল মন্দের যদি অবশ্য প্রতিপাল্য কোন নিয়ম না থাকে, তবে তাহাতে না-আছে পাপ, না-আছে পুণ্য; তাহা হইলে সে পুরস্কার পুরস্কারই নহে, সে দণ্ড দণ্ডই নহে; কেন না ভালমন্দের ধারণা হইতে তাহা মঞ্জুরী প্রাপ্ত হয় না। যে স্থলে এই ভালমন্দের ধারণা নাই, সে স্থলে দণ্ড পুরস্কারের পরিবর্ত্তে সুধু সুখের আকর্ষণ ও যন্ত্রণার ভয় ধর্ম্মের অনুশাসন-বিধির সহিত যুড়িয়া দেওয়া হয় মাত্র; সে বিধির মধ্যে কোন ধর্ম্মনৈতিক ভাব নাই; তখন আবার আমরা সেই পার্থিব কায়িক দণ্ডবিধির ব্যবস্থায় ফিরিয়া আসি যাহা লোককল্পনাকে সন্ত্রাসিত করিবার জন্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যাহা ব্যবস্থাকর্ত্তাদের প্রচারিত আইনের উপরেই নির্ভর করে; এইরূপে, এই পার্থিব দণ্ড পুরস্কারকে, বিধি ব্যবস্থাকে, আমরা পরলোকেও লইয়া যাই। আমরা পরে দেখিব—আত্মার অমরত্ব, উহা অপেক্ষা দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত।

এই মিথ্যা ও অসম্পূর্ণ নীতিবাদগুলিকে অপসারিত করিয়া এমন একটি সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইব, যাহা আমাদের মতে, সম্পূর্ণ সত্য; কেন না, ঐ সিদ্ধান্ত, নিশ্চিত তথ্য ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করে না, কোন তথ্যকেই উপেক্ষা করে না, এবং সেই সব তথ্যের যথাযথ লক্ষণ ও মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়া থাকে।

---

## বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা।

### সৃষ্টিপ্রসঙ্গ।

মূল বেদান্তে এই দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ক্রমটাই জানিবার ও বলিবার ইচ্ছা হয়;—হইলেও সে কথা পরে বলা যাইবে। বেদান্তশাস্ত্রে সৃষ্টির কথা আছে,ইহা শুনিয়া প্রথমতঃ ইহাই মনে হইতে পারে যে, বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই মিথ্যা; সুতরাং তন্মতে আবার সৃষ্টি কি? এই অংশের প্রত্যুত্তরার্থ তন্মতের আচার্য্যেরা যাহা বলেন অগ্রে তাহাই বলা যাউক।

বেদান্তাচার্য্যেরা বলেন, বস্তুতঃই ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদয় পদার্থ মিথ্যা; যে কিছু দৃশ্য সে সমস্তই রজ্জুসর্পের ন্যায় ভ্রমদৃষ্ট। অপিচ, জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই, অজ্ঞানবশতঃ পরমাত্মাই জীব নামে ব্যবহৃত হইতেছেন। সুতরাং এতন্মতে সৃষ্টি ও তাহার ক্রম, বন্ধ্যার পুত্রের নামকরণের সহিত সমান বলিয়া গণ্য হইতে পারে বটে; তথাপি তদ্‌দ্বয়ের বর্ণনা বা উপদেশ করা ব্রহ্মতত্ত্ব বুভুৎসুর পক্ষে হিতকর, বিশেষ হিতকর। যেমন কোন বালককে তিক্ত ঔষধ সেবন করাইতে হইলে, তাহাকে প্রথমতঃ কিছু মিষ্ট দ্রব্য দেখাইতে হয়। নচেৎ সে কোনও ক্রমে তিক্ত ঔষধ সেবনে

ইচ্ছুক হইবে না। বালকের পক্ষে মিষ্ট দ্রব্য অপকারক, আর তিক্ত ঔষধ উপকারক হইলেও বালক আপনার বাল্যদোষে দূষিত হইয়া উপস্থিত রমণীয় মিষ্ট দ্রব্যকেই উপকারক ও দুঃসেব্য তিক্ত ঔষধকে অপকারক মনে করিতে থাকে। এই যেমন দৃষ্টান্ত, তেমনি, বেদান্ত-বক্তারা বলেন যে, চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান সুখকর জগতের মিথ্যাত্ব প্রভৃতি স্বীকার ও তাহাকে বুদ্ধ্যারোহিত করা অজ্ঞান দোষে কলুষিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে অত্যন্ত অসম্ভব। ইহাদের তাদৃশ হৃদয়ে জগতের সত্যতা পক্ষই নিত্যারূঢ় রহিয়াছে সুতরাং তৎপক্ষেরই যুক্তি প্রভৃতি তাহাদের হৃদয়ে উদিত হইয়া নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানোৎপত্তি হওয়ার বাধা উত্থাপন করে। অতএব, অজ্ঞ হৃদয়ে নির্গুণ নিরাকার নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম সহজে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই দেখিয়াই জননীর ন্যায় হিতৈষিণী শ্রুতি প্রথমতঃ জগতের সত্যত্ব মানিয়া লইয়া সৃষ্টি ও তাহার ক্রম উপদেশ করিয়াছেন। মরুমরীচিকায় জলভ্রম হইলে, যাবৎ না ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের তথ্য বিদিত হওয়া যায়, তাবৎ ঐ জলকে কোনও ক্রমে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে না। সত্য বলিয়াই বোধ হইবে। কিন্তু যখন অনুসন্ধান দ্বারা ঐ ভ্রান্তিকল্পিত জলের তথ্য জানা যায়, তখন আর তাহার সত্যতা থাকে না। তখন বুঝা যায় যে, ঐ জল মিথ্যা বা ভ্রান্তিকল্পিত। সে জল তখন মরীচিকাতেই পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং যাহা সত্য তাহাই তৎকালে প্রকাশমান হইতে থাকে। এইরূপ, যতকাল পরব্রহ্মে পরিকল্পিত এই জগতের মূল তথ্য অনুসন্ধানের গোচরে আসিবে ও সম্যক্ জ্ঞানের গোচর হইবে, ততকাল অসৎ হইলেও সৎরূপে প্রতীত হইবে। অনুসন্ধানাদির দ্বারা যখন ইহার প্রকৃত তথ্য বিদিত হওয়া যাইবে তখন অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় ইহার মূল বিনষ্ট হইবে অর্থাৎ তখন আর ইহার সত্যতা থাকিবে না। তখন ইহাকে সৎ বলিয়া বোধ হইবে না, পরন্তু মিথ্যা ব'লিয়াই প্রতীয়মান হইবে। তখন কেবল পরম সত্য ব্রহ্মই প্রকাশমান থাকিবেন, আর সব মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইবে। অতএব, এই জগৎ মূলতঃ মিথ্যা হইলেও, ইহার প্রতীয়মান সত্যতা মানিয়া লইয়া, স্বীকার করিয়া, সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম প্রদর্শন করা যোগ্য বৈ অযোগ্য নহে। বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টি ও তাহার ক্রম বর্ণন কেবল হইল মিথ্যাত্ব প্রদর্শন জন্য, অন্য কোন উপযোগের জন্য নহে। অতএব, ব্রহ্মাদ্বৈত উপদেশ প্রস্তাবে সৃষ্টি ও তাহার একটা ক্রম বর্ণন করা অপ্রাসঙ্গিক ও অনুপযোগী নহে। প্রত্যুত তাহার প্রকৃতোপযোগিতা সুস্পষ্ট। অপিচ, অজ্ঞান নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার-দশায় জগৎকে সত্য বলা যায়, এবং তদন্তে ইহাকে বাধ্য হইয়া অসত্য বা মিথ্যা বলিতে হয়। এইরূপে একই জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ব উভয় ভাব অবিরল হইতেছে। উপদিশ্যমান সৃষ্টি যে কতকাল পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা অনির্ণেয় অর্থাৎ নির্ণীত হইবার নহে। বেদান্তাচার্য্যেরা সামান্য একটি কল্পনাকে কল্পনা করিয়া এইমাত্র বলেন যে, সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি।

এস্থানে এমন কথা উঠিতে পারে যে, যখন সকল বস্তুরই আদি দেখিতেছি, তখন সৃষ্টিও আদি অর্থাৎ এক সময়ে ইহা ছিলনা, পরে হইয়াছে। এ কথার প্রত্যুত্তরে বেদান্তবাদীরা বলেন, উক্ত অনাদি শব্দের তাৎপর্য্যার্থ অন্যবিধ। সৃষ্টি, স্থিতি,

লয়, পুনঃ সৃষ্টি, পুনঃ স্থিতি, পুনঃ প্রলয় মহাপ্রলয়, এইরূপ যে ধারা বা প্রবাহ, সেই প্রবাহটাই অনাদি; প্রতিবিম্বরূপ ইহার অনাদিত্ব প্রমাণসহ নহে। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক ইন্দ্রজাল নামধেয় মায়া বিশেষ দ্বারা মিথ্যা ও কৌতুকাবহ পদার্থরাশি স্থাপন করে, করিয়া দর্শকদিগের ঔৎসুক্য নিবারণ করিয়া পুনর্ব্বার সেই সকল মায়া-সৃষ্ট পদার্থরাশির উপসংহার করে; সেই-রূপ, পরম ঐন্দ্রজালিক ঈশ্বরও অচিন্ত্যশক্তি স্বমায়ারদ্বারা এই জগৎ সৃজন করেন, জীবগণের সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ প্রদানান্তে পুনর্ব্বার ইহাকে উপসংহৃত করেন। সেই উপসংহারের নাম প্রলয়।

বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় প্রলয় চারিপ্রকার। নিত্য, প্রাকৃত, নৈমি-ত্তিক ও আত্যন্তিক। এই যে জনগণের প্রাত্যহিক সুষুপ্তি, অর্থাৎ নিঃস্বপ্ন নিদ্রা, বেদান্তীরা বলেন, এই সুষুপ্তি নিত্য প্রলয় বলিয়া গণ্য। কেননা সুষুপ্তি কালেও কোন পদার্থের দর্শন থাকে না, সমস্তই লীন বা লুপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং সুষুপ্ত জীবের পক্ষে সুষুপ্তিও প্রলয়পদাভিধেয় হইতে পারে।

অত্যন্ত নিদ্রাভিভূত ব্যক্তির ঘট প-টাদি বাহ্যবিষয়ের জ্ঞান থাকে না। সেই জন্য সুষুপ্তিনামক অবস্থাকে দৈনন্দিন প্রলয় ও নিত্য প্রলয় বলা হয়। এই নিত্য প্রলয়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার ও লিঙ্গশরীর প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ কারণরূপে স্থিত থাকে, আর সকল প্রলয়গত হইয়া যায়। পরন্তু এই নিত্য প্রলয়ের বা সুষুপ্তির পরেই আবার পূর্ব্বোক্ত সংসার দর্শন হইতে থাকে। সেইজন্য এই দৈনন্দিন প্রলয় প্রলয় বলিয়া অনুভূত বা গণ্য হয় না।

জীবদিগের জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা প্রত্যহই ভোগ হয়, তন্মধ্যে সুষুপ্তি অবস্থাই উৎকৃষ্ট। কেননা, এই অবস্থায় জীবের ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এই সময়ে কেবলমাত্র সত্যা-নন্দের কিঞ্চিদংশ অনুভূত হইতে থাকে, অন্যকিছু অনুভূত হয় না।

ব্রহ্মার লয় জনিত কার্য্যমাত্রের বিল-য়কে প্রাকৃত লয় কহে। এই লয়ের ক্রম এইরূপ। যিনি অতি কঠোর তপস্যা-দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডাধিকারী অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ঐরূপ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়া ব্রহ্মত্ব পদ পাইবার পূর্ব্বেই হউক, আর পরেই হউক, তত্ত্বজ্ঞান আয়ত্ত করি-য়াছেন, তিনি উক্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ অর্থাৎ ব্রহ্মত্বপদ অনুভবের অন্তে, বিদেহ-কৈবল্য নামক পরমামুক্তি প্রাপ্ত হন। তৎকালে এই ব্রহ্মার অধিকৃত ব্রহ্মলোকে যত ব্রহ্মজ্ঞ অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁ-হারও ব্রহ্মার সহিত একসঙ্গে মুক্ত হন। এই ব্রহ্মকে কার্য্যব্রহ্ম ও তাঁহার ঐ মুক্তিকে কার্য্যব্রহ্মবিলয় কহে। কার্য্য-ব্রহ্মার লয়ে তাঁহার অধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডের মূলমায়ার লয় হইয়া থাকে এবং এই লয়কে মহাপ্রলয় সংজ্ঞা দেওয়া হয়। অপিচ মায়াত্মিকা প্রকৃতিতে লয় হও-য়ায় প্রাকৃতিক প্রলয়ও বলা হয়। পূ-র্ব্বোক্ত কার্য্য-ব্রহ্মার দিনাবসানে নিমি-ত্তক ত্রৈলোক্যের লয়কে সেই সেই নৈমি-ত্তিক প্রলয়ও বলিয়া থাকেন। কার্য্যব্রহ্মা আপন দিনের অবসানে আবার ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়া শয়ন করেন, আবার দিনরাত্রির অবসানে পুনরপি সৃষ্টি করেন। এ সৃষ্টিও পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মার দিনরাত্রির পরি-মাণ অল্প নয়। আমাদের হিসাবে চতুর্য্যুগ সহস্র পরিমিত কালে ব্রহ্মার এক দিন। আর ঐরূপ কালে তাঁহার এক রাত্রি হইয়া

থাকে। ব্রহ্মার তাদৃশ রাত্রে এই লোকত্রয়ের কিছুই থাকে না। এতদ্‌দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, মহাপ্রলয়ের স্থিতিকাল কি পরিমাণ।

ব্রহ্মজ্ঞান নিমিত্তক পরমামুক্তিকে বেদান্তাচার্য্যেরা অতিরিক্ত মুক্তি বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা সংসারের মূল কারণ মূল-অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তৎসংক্রান্ত সংসার-স্থিতির বা পুনরুৎপত্তির সম্ভাবনা কি?

প্রলয়ের ক্রম এই যে, প্রথমতঃ পৃথিবীর লয়কাল; জলের লয় তেজে, তেজের লয় বায়ুতে, বায়ুর লয় আকাশে, আকাশের লয় জীবের মহত্তসারে, তাহার লয় সমষ্টি জীবাভিমানী হিরণ্যগর্ভের মহত্তসারে এবং তাহার লয় মূল অজ্ঞানে হয়। কারণে কার্য্যের লয়, এই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য পদার্থেরও লয় ক্রমে কল্পনা করিতে হয়। বেদান্তবাদী মুনিঋষি ও আর্য্যগণ এইরূপ লয়ক্রম উপদেশ করিয়াছেন এবং বিষ্ণুপুরাণাদি গ্রন্থেও এইরূপ ক্রম বর্ণিত হইয়াছে।

---

## বিষয়সুখ ও ব্রহ্মানন্দ।

দুই দিকে আকর্ষণ। এক দিকে সংসারের সুখ, ইন্দ্রিয়সুখ—অন্য দিকে ধর্ম্মের সুখ। আমরা এই দুয়ের মধ্যস্থলে। দুই দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে।

ঘোর বৈরাগী মনে করেন, সাংসারিক সুখ ঘৃণিত, পরিত্যজ্য। তাঁহার মতে সাংসারিক সুখ মুক্তিপথের অন্তরায়। যত সাংসারিক সুখ ভোগ করিবে, ততই ধর্ম্মকে হারাইবে। ঘোর বৈরাগীর মতে সংসার নরক।

এ বিষয়ে সত্যধর্ম্ম কি বলেন? ধর্ম্ম বলিতেছেন, এ কথা কখনই সত্য নহে। ধর্ম্ম সংসারের সহায়। ধর্ম্ম সংসারের উন্নতি সাধন করেন। ধর্ম্ম বলিতেছেন, বৈধ ভোগে দোষ নাই, উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। পরমেশ্বর জীবের জন্য ইহসংসারকে অসংখ্য প্রকার সুখের উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। ধর্ম্ম, সাংসারিক সুখ ইন্দ্রিয়সুখের বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি যেমন প্রকৃত ভাবে সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে পারেন, সেরূপ অন্য লোকে পারে না।

ভগবদ্ভক্তের নিকট এক গুণ সাংসারিক সুখ, শত গুণ হয়;—এক গুণ পারিবারিক সুখ শত গুণ হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের মধ্যে যে সুখ রহিয়াছে, জগতের অসংখ্য জীব তাহা কেমন সম্ভোগ করিতেছে! কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহাতে শত গুণ, সহস্র গুণ, অধিকতর সুখ, অধিকতর আনন্দ সম্ভোগ করেন।

ভগবদ্ভক্ত জগতের রূপ সকলের মধ্যে তাঁহার প্রভুর আনন্দরূপ দর্শন করেন, রসের মধ্যে তাঁহার আনন্দরস পান করেন, গন্ধের মধ্যে তাঁহার পবিত্রতার আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন, স্পর্শের মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শসুখ ভোগ করেন, শব্দের মধ্যে তাঁহার নীরব বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন।

সুন্দর বস্তু দেখিয়া কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, সকল সুন্দর পদার্থের মধ্যে, সেই নিরবদ্য সৌন্দর্য্যসারের নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন। সুরস সামগ্রীর আস্বাদ লইয়া কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহাতে তাঁহার প্রেমাস্পদের প্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া আনন্দিত হন। সুগন্ধ পদার্থের ঘ্রাণ লইয়া কে না সুখানুভব করে? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহার মধ্যে সেই পবিত্র

পুরুষের পবিত্রতার আঘ্রাণ পাইয়া ধন্য হন। স্পর্শসুখে কে না সুখী হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত, তাহার মধ্যে ব্রহ্মস্পর্শ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হন। মধুর শব্দলহরী শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিলে কে না আনন্দিত হয়? কিন্তু ভগবদ্ভক্ত তাহার মধ্যে তাঁহার প্রেমাস্পদ পরম দেবতার মধুর বাণী শ্রবণ করিয়া পরমানন্দে পূর্ণ হন।

ইন্দ্রিয়সুখভোগে যেমন, সাংসারিক সম্বন্ধজনিত সুখেও সেইরূপ। স্বামী স্ত্রী, মাতা পিতা ও সন্তান; বন্ধুতা ও আত্মীয়তা; এই সকল সম্বন্ধ হইতে যে সুখামৃত নিঃসৃত হয়, তাহা কে না ভোগ করে? এই সকল পারিবারিক ও আত্মীয়তাজনিত সুখে জগৎ বিমোহিত।

কিন্তু এই সকল সুখ, শতগুণ বর্দ্ধিত আকারে, ভগবদ্ভক্তকে আলিঙ্গন করে। তাঁহার নিকটে দাম্পত্য, বাৎসল্য, বন্ধুতা, আত্মীয়তা, গুরুজনের প্রতি ভক্তি, এই সকলই প্রেমময়ের প্রেমলীলা,—সেই পূর্ণ প্রেমস্বরূপের প্রেমের প্রকাশ। আমাদের একটী সঙ্গীতে আছে;—

"এক ভানু অযুত কিরণে,
উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রেম হইয়া শতধা,
বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী হৃদয়ে করে বসতি।"

কিন্তু সাংসারিক সুখ, বিষয়সুখ ভোগে কি দোষ নাই? আছে বই কি? আসক্ত হইলেই দোষ। যে পরিমাণে সাংসারিক সুখে আসক্তি, সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিকতা হইতে বিচ্যুতি।

জগতে এমন সহস্র সহস্র লোক আছেন, বিষয়সুখই তাঁহাদের লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাহার উপায় মাত্র। বিষয়সুখের জন্য ধর্ম্ম। ধর্ম্মের আদেশে বিষয় সুখ ভোগ নহে। তাঁহারা উপাস্য দেবতাকে বলেন, "ধনং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে।" তাঁহারা বিষয় বাসনা ও বিষয় ভোগকে স্বর্গে পর্য্যন্ত লইয়া যান। তাঁহারা আশা করেন যে, এখানে অবৈধ ইন্দ্রিয় সুখ ও পানাদি হইতে বিরত থাকিলে স্বর্গে সুরা অপ্সরা মিলিবে। তাঁহারা পৃথিবীর ময়লা, এখানকার দুর্গন্ধ, স্বর্গ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে চান।

ধর্ম্মের সুখ, ব্রহ্মসহবাসের সুখ, যিনি লাভ করিয়াছেন, আর কিছুতেই তাঁহার স্পৃহা থাকে না। সাংসারিক সুখ হয়, ভাল, না হয়, ক্ষতি নাই। না হইলে তিনি তজ্জন্য কাতর হন না। অন্তরে যাহা পাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি পূর্ণ। মূল-ধন সঞ্চিত আছে, অন্য ক্ষতিতে তিনি কাতর নহেন। সাংসারিক সুখ হয়, ভাল, না হইলে কোন চিন্তা নাই। ভিতর পূর্ণ আছে।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভগবদ্ভক্তের অবস্থা দেখিয়াছি। ইন্দ্রিয় সকল জীর্ণ হইয়া আসিতেছে, বাহিরের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইতেছে। চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ভিতরে ক্রমশঃই ব্রহ্মানন্দের উন্নতি। বাহিরের সঙ্গে সম্বন্ধ হ্রাস হই-তেছে বলিয়া বাহিরে সুখ ভোগের শক্তি ক্রমে কমিয়া যাইতেছে বলিয়া, তিনি দুঃখিত নহেন। অন্তরে আনন্দ ক্রমশই বাড়িতেছে। তিনি বিষয়ভোগে নিস্পৃহ। তাঁহার দেহ ক্রমশঃই ক্ষীণ হইতেছে; এক দিন নষ্ট হইয়া যাইবে। তজ্জন্য তিনি দুঃখিত নহেন।

তিনি দিব্য চক্ষুতে দেখিতেছেন যে, যখন এ দেহ নষ্ট হইবে, তখন বিদেহী হইয়া পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মানন্দ রস পান করিবেন।

যখন দেহ-পিঞ্জর ভগ্ন হইবে, তখন জীবাত্মা পক্ষী মুক্ত হইয়া ব্রহ্মাকাশে পরমানন্দে উত্তীর্ণ হইবে।

আমি বলিয়াছি যে, ধর্ম্মানুগত বিষয় ভোগে দোষ নাই। কিন্তু বিষয়সুখলাভ করিয়া ধর্ম্মকে কখন ভুলিও না। বিষয়-সুখে আসক্তি থাকিলে, পরমাত্মাকে জানা যায় না।

কঠোপনিষদে নচিকেতার উপাখ্যানে প্রাচীন আর্য্য ঋষি, এ বিষয়ে কেমন সুন্দর উপদেশ দিতেছেন! নচিকেতা যমরাজের নিকট আত্মবিদ্যা শিক্ষার বর প্রার্থনা করিলে, যমরাজ বলিলেন উহা বড় কঠিন, তুমি শিক্ষা করিতে পারিবে না। এ বরের পরিবর্ত্তে, তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর।

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ,

শতায়ু বিশিষ্ট পুত্রপৌত্ররূপ বর গ্রহণ কর।

"বহূন পশূন্ হস্তিহিরণ্যমখান্"

বহু পশু হস্তী হিরণ্য ও অশ্বসকল গ্রহণ কর।

"ভূমের্মহদায়তনং বৃনীষ"

মহদায়তন ভূমি বর প্রার্থনা কর। অর্থাৎ রাজত্ব গ্রহণ কর এই সকল কথা শুনিয়া নচিকেতা বলিলেন,-

"সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাং জরয়ন্তিতেজঃ"

এই সকল বিষয়ভোগের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়ের তেজ নষ্ট হয়।

ন বিত্তেন তর্পনীয়ো মনুষ্যঃ

বিত্তের দ্বারা মনুষ্য কখন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

নচিকেতা রাজ্যাদি ভোগ অস্বীকার করিলেন। যমরাজের নিকট আত্মবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য তিনি প্রার্থনা করিলেন। তখন যমরাজ নচিকেতাকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই উপাখ্যানে প্রাচীন মহর্ষি এই উপদেশ দিতেছেন যে, যে ব্যক্তির বিষয়-লালসা দুর হয় নাই, সে আত্মতত্ত্ব, পরমাত্ম তত্ত্ব শিক্ষা করিবার অধিকারী নয়। এক দিকে, ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মশক্তি অপরদিকে পার্থিব ধনৈশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়সুখদ সামগ্রী সকল; ইহার মধ্যে যাঁহার চিত্ত, পার্থিব সুখের দিকেই ধাবমান, তিনি কখন প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু নহেন। তিনি পার্থিব সর্ব্বপ্রকার সুখকে তুচ্ছ করিয়া সেই এক পরম বস্তুর অন্বেষণ করেন। যিনি সাংসারিক সুখের জন্য লালাইত, তিনি আত্মতত্ত্ব,পরমাত্মতত্ত্ব, শিক্ষার অধিকারী নহেন। নচিকেতো-পাখ্যানে মহর্ষি কৌশল করিয়া এই মহা-মূল্য উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

যেমন ধর্ম্মানুগত হইয়া বিষয়সুখ ভোগ করিবে, সেইরূপ, ধর্ম্মের আদেশে, বিষয়-সুখ পরিত্যাগ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে। যদি ধর্ম্ম আদেশ করেন, ঐ ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়, ঐ বিষয় সম্পত্তি ছাড়, তখন তাহা হাসিতে হাসিতে ছাড়িতে পার কি না? ধর্ম্মের আদেশে বিষয়ভোগ করিবে। আবার ধর্ম্মের আদেশে সকলই ছাড়িতে প্রস্তুত থাকিবে।

বিষয় সুখই যাহাদের লক্ষ্য, ধর্ম্ম তাহাদের উপায় মাত্র। তাহদের নিকট ধর্ম্ম বড় কঠোর, বড় তিক্ত। বিষয়সুখের ক্ষতি হইলে, তাহারা ধর্ম্মকে, আর ধর্ম্মাবহ ঈশ্বরকে দোষ দেয়।

কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সাধু, সহস্র কষ্ট। যন্ত্রণা পাইয়াও কি বলেন? "প্রভো! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ্ যা হয়, হউক; কিন্তু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" সাধু লোক-দিগের, মহাত্মাদিগের জীবন দেখ। তাঁহারা সহস্র প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও,

প্রভুর আজ্ঞা পালন করেন, তাঁহার মহিমা মহীয়ান্ করেন।

ধর্ম্মপথে চলিতে হইলে, যদি বিষয়সুখ পরিত্যাগ করিতে হয়, ভগবদ্ভক্ত তাহা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ধর্ম্মের জন্য, যদি আত্মীয় স্বজন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট, বিরক্ত হন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহাতেও বা তিনি কি করিবেন? ধর্ম্মের জন্য তিনি সকলই সহ্য করিতে প্রস্তুত। তখন, ভগবানের দাস, বলেন;—

"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্,
শুনে চলি তোমারই ডাক্।"

স্বার্থত্যাগ ভিন্ন, কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করা ভিন্ন, ধর্ম্মজীবন গঠিত হয় না। তাঁহার জন্য যত বিষয় সুখ ত্যাগ করিবে, সেই পরিমাণে, সেই পরম সুখ লাভ করিতে পারিবে। ধর্ম্মের জন্য যত অনিত্য অসারকে ত্যাগ করিবে, তত সেই নিত্য ও সার পদার্থকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। যত ছায়াকে ছাড়িবে, তত সেই ধ্রুব সত্যকে পাইবার উপযুক্ত হইবে।

হে পূর্ণানন্দ পরমেশ্বর! তুমি কৃপা করিয়া যাহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে, আপনার হৃদয়রঞ্জন মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে, সে কি আর কিছুতে ভুলিতে পারে? যে তোমাকে কখন দেখে নাই, সেই সংসারমোহে বিমুগ্ধ হইয়া তোমাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে। তোমার যিনি যথার্থ ভক্ত, তিনি তোমাকেই চান, তোমাকেই চান, তোমাকেই চান। সংসারে এমন কি আছে যে তোমার ভক্তকে ভুলাইতে পারে? অকিঞ্চিৎকর অসার, নশ্বর, মলিন বিষয়সুখ কি তোমার প্রকৃত ভক্তকে ভুলাইয়া রাখিতে পারে? তোমার ভক্ত, সকলের মধ্যে তোমাকে, এবং তোমার মধ্যে সকলকে দর্শন করেন। সুখে, দুঃখে, সম্পদে বিপদে, রোগে সুস্থতায়; হাস্য, ক্রন্দনে, আলোকে, অন্ধকারে; বিচ্ছেদে, মিলনে, সকল অবস্থায়, তিনি তোমারই হইয়া থাকেন। তিনি তোমার দাস; তোমার দাসানুদাস। তোমার স্মরণে, চিন্তনে, ধ্যানে, গুণকীর্ত্তনে তোমার ভক্ত যে পরমানন্দ সম্ভোগ করেন, কোন প্রকার সাংসারিক সুখের সহিত কি, তাহার তুলনা হয়?

"বিপদরাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে?
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে।"

তুমি তোমার ভক্তের নিকট এক গুণ পার্থিব সুখ শতগুণ করিয়া দাও। তুমি তোমার ভক্তকে, নিজে হস্ত ধারণ করিয়া অনন্ত আনন্দ পথে লইয়া যাও। অনন্ত জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ, যোগানন্দ, ব্রহ্মানন্দ তুমি তোমার ভক্তের জন্য রাখিয়া দিয়াছ।

"তুমি যারে কর হে সুখী,
সেই সুখী হয়, এসংসারে;
বিপদ প্রলোভনে, নাথ, তার কি
করিতে পারে?"

তোমাকে ভুলিয়া
কি বিষয়সুখে মজিব?
কাচখণ্ডের বিনিময়ে অমূল্য
কোহিনূরে বঞ্চিত হইব?

হে আনন্দময়! চিরদিন তুমি আমার সর্ব্বস্বধন হইয়া থাক। আমার তৃষিত চিত্ত আর কিছু কখন যেন না চায়। হে প্রভো! তোমার চরণামৃত পানেই যেন আমার প্রাণের তৃষ্ণা নিবারিত হয়। আত্মার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, তোমার কৃপাপ্রদত্ত সত্যান্ন, ও প্রেমান্ন ব্যতীত আর কিসে শান্ত হইবে। হে প্রভো! আর কিছু চাহিনা।

"তব চরণামৃত, পানপিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।"

ওঁ ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।

# সেখ সাদি।

## সন্তোষ।

আমি সন্তোষ চাই। সন্তোষের মত ধন আর কি আছে। যাহার সহিষ্ণুতা নাই, সে কিসের জন্ম জ্ঞানের গর্ব্ব করে?

একজন দরিদ্র সাধু, রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, আপনি রাজ্যলাভ করিয়াছেন, আর আমি জ্ঞান লাভ করিয়াছি। আমি অতি দীন, লোকে আমাকে মাড়াইয়া চলুক, তাহাতে কি? আমি আপনার মত কণ্টক নহি, যে অপরের পায়ে ফুটিব।

একজন সাধু তাহার ছিন্ন কন্থা সেলাই করিতেছিল। তাহা দেখিয়া অপরে বলিল, নিকটে একজন দাতা আছেন, চলুন, তিনি এখনই আপনাকে নূতন বস্ত্র দান করিয়া ধন্য হইবেন। সাধু বলিল নিজের দারিদ্র জানাইয়া অপরের নিকট ভিক্ষা করিতে চাহি না। ছিন্ন কন্থাতেই আমি সন্তুষ্ট; কেন ধনীর নিকট ভিক্ষা করিতে যাইব? অপরের সাহায্যে স্বর্গগমনেও আমি নরকের যন্ত্রণা অনুভব করি।

চিকিৎসক উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত; কিন্তু রোগীর স্বাস্থ্য, পথ্য ও নিয়মের উপর নির্ভর করে।

দেখিতেছি আহারে তোমার সংযম শক্তি একগাছি কেশ অপেক্ষাও ক্ষীণ; কিন্তু তোমার ঔদারিকতার প্রভাব লৌহ-রজ্জু ছিন্ন করিতেও সক্ষম।

আহারের উদ্দেশ্য কি—জীবিত থাকিয়া ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন করা। কিন্তু তোমাকে দেখিয়া মনে হয় আহারের জন্যই জীবন।

পরিমিত আহার তোমাকে ধারণ করিয়া রাখিবে। কিন্তু অপরিমিত আহার তোমাকে বহন করিতে হইবে।

যিনি সংযমী, তিনি সর্ব্ববিধ কষ্টভোগ করিতে সমর্থ; কিন্তু বিলাসী কষ্টে পড়িলে আশু-মৃত্যু তাহার সুনিশ্চিত।

ভিক্ষার লাঞ্ছনা অপেক্ষা উপবাস করা বরং ভাল। যদি অন্তরের কষ্ট জানাইতে হয়, তাহার নিকট গিয়া বল, যাহার প্রসন্ন বদন হইতে তুমি সান্ত্বনা প্রত্যাশা করিতে পার।

সিংহ ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলেও সে কুক্কুরের ভোজনাবশিষ্ট খাইতে চায় না। ক্ষুধিত হইলে তুমি নীচের নিকটে প্রার্থনা জানাইও না।

মূল্যবান বেশ পরিহিত অপদার্থ লোক, আর স্বর্ণমণ্ডিত কর্দ্দম-প্রাচীর, উভয়েরই মূল্য এক।

অপরের প্রসাদভোজী অপেক্ষা যিনি নিজ পরিশ্রমে জীবিকা আহরণ করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ।

ঈশ্বর, যিনি ষড় ঋতুর প্রবর্ত্তক, তিনি প্রত্যেক প্রাণীর প্রয়োজন যথাযোগ্য বিধান করিতেছেন। বিড়ালকে যদি তিনি পক্ষ দিতেন, একটি পক্ষীরও ডিম্ব রক্ষা পাইত না। যিনি তোমাকে দরিদ্র করিয়াছেন, তিনি জানেন, কোন্ অবস্থা তোমার পক্ষে অধিকতর উপযোগী।

মরুদেশ-যাত্রী ক্ষুৎপিপাসা-কাতর ওষ্ঠাগত-প্রাণ জনৈক পথিক, পথে যাইতে যাইতে একটি থলিয়া পাইল। আহার্য্য সামগ্রী পরিপূর্ণ মনে করিয়া সহর্ষে খুলিয়া দেখে উহা মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ। তখন তাহার আর ক্ষোভের সীমা রহিল না। হায়, ক্ষুধার্ত্তের নিকটে ধূলিমুষ্টি আর সুবর্ণখণ্ড উভয়ই এক।

আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় নিত্য তৃপ্ত। কিন্তু এক সময়ে জুতার অভাবে আমার বড়ই কষ্ট বোধ হইতেছিল। সেই সময়ে এক দিন মসজিদে গিয়া দেখি একজনের পা নাই। তখন নিজের প্রতি ঈশ্বরের করুণা অনুভব করিয়া তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিলাম। সে দিন হইতে জুতার অভাব আর অনুভব করি না।

ঊর্দ্ধে হাত দুইখানি তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনায় কি হইবে, যদি যথাযোগ্য পাত্রে দানের সময় সে হস্ত প্রসারিত না হয়।

সদ্বংশজাত দারিদ্রে নিপতিত হইলেও তাহার মহত্ব বিনষ্ট হয় না।

চোর সাধুকে বলিয়াছিল, অপরের নিকট মুষ্টি ভিক্ষা করিতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না। সাধু বলিল চৌর্য্যাপরাধে রাজদণ্ডে হস্ত বিচ্ছিন্ন হওয়া অপেক্ষা ভিক্ষা প্রশংসনীয়।

নিরবচ্ছিন্ন বলের দ্বারা সৌভাগ্য লাভ হয় না।

বিদেশ যাত্রায় সুখলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। ব্যবসায়ী, যাহার অর্থের অভাব নাই, অরণ্য পর্ব্বত মরুভূমি সকল স্থানেই তিনি সুখে সঞ্চরণ করিতে পারেন। যিনি বিদ্বান, সুবর্ণ মুদ্রার ন্যায় বিদেশেও তাঁহার সমাদর; তিনি কিছু আর ধনীর সন্তানের ন্যায় নহেন, যে নোটের মত দেশের ভিতরেই তাহার সমাদর ও প্রচলন। সুন্দর যুবা, পিতৃমাতৃতাড়িত হইলেও বিদেশে সে সম্মান ও আশ্রয় লাভ করে। সুকণ্ঠ গায়ক, তাহার বীণা লইয়া বিদেশে গিয়াও অপরকে বিমুগ্ধ করে; সেখানে তাহার সম্মানের অভাব কি। সামান্য শিল্পী বিদেশে যাইলেও তাহার উদরান্নের অভাব ঘটে না।

সমুদ্র মহা ভীষণ হইলেও ( water fowl ) সমুদ্র বিহারী-পক্ষী বারিধি-বক্ষে বিরাম লাভ করে। কিন্তু

উগ্গার তরঙ্গের তাড়নে প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডও তীরে উৎক্ষিপ্ত হয়।

মক্ষিকা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিলে প্রকাণ্ড হস্তীকেও তাহারা বিপর্য্যস্ত করিতে পারে—সিংহের চর্ম্মও তুলিয়া লইতে পারে।

শত্রু, মিত্র সাজিয়া দংশন করিলে, সে দংশন অতীব সাংঘাতিক।

অদৃষ্টে যাহা ঘটিবার তাহা ত হইবেই ; তাই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।

লোভ পরিত্যাগ কর, রাজার ন্যায় স্বাধীন হও, তাহা হইলেই তোমার মনের সন্তোষ মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইতে পারিবে।

---

## PRAYERS FROM THE BOOK OF VYAKHYAN

### VI

O Lord most high, Thou art our stay and comfort. Thou art our Treasure, our only Friend. Thou art our Father and Thou art our Mother. Do Thou exalt our love to Thee and so ordain that all inclinations and affections of our mind may follow the spirit of goodness that is of Thee. All our strength we have derived from Thee, may we devote it to Thy service. In whatever direction our work may lie, may we there behold Thy eyes fixed upon us. O Supreme Spirit, lead us to Thy path of truth and purity and reveal Thyself to our eyes of faith. We have no other prayer to offer.

### VII

O Spirit Supreme, Soul uncreate, Thou dwellest in our soul and rulest it as Thou rulest the universe. To every creature living under Thy protection Thou hast assigned its proper vocation. He who loveth to do thy work doeth work that is holy. He who hath seen the glory of Thy countenance—the beneficence of thy handiwork never dreams of severing himself from Thee. The littleness of his own self, so addicted to evil doing, becomes repulsive to him and the lofty sublimity of Thy being reveals its beauty to his eyes and draws him to Thee. I look within at my soul, so prone to evil, and my heart is filled with penitence ; but when I contemplate Thy holiness, my heart is sanctified. My soul is mortified when it thinks of its ever-recurring sorrows and miseries, but my heart rejoiceth when it beholds the light of Thy countenance. O Lord my God, Thou art our all. When we discern Thy hand and understand Thy truth and strive to attain Thy goodness, even in the minutest degree, we feel exceeding joy. Everlasting is the union of the soul with Thee. Dwelling in our hearts, Thou speakest in Thy still small voice, ceaselessly dost Thou impart to us such counsel as may conduce to our present good and future happiness. What need have we to obey other voice, when it is Thou that speakest in accents sweet and pure ? Why should we not listen, rapt in silence, to those words of truth and goodness, when it is Thou who utterest them and instillest them into our understanding. Should we not keep our ears turned to the direction from which Thy voice proceeds ? At every step of our life dost Thou impart unto us Thy commandments, and whenever we stumble Thou dost strengthen our souls with the strength of righteousness, hence are we enabled to stand erect, else, like a stick unsupported, we must have been levelled to the dust. Whatever be the commandments that Thou layest upon us, they are to be laid to heart and whatever be the work which Thou commandest us to do, it is our bounden duty to perform. Forsake us not, O God my Lord, in this terrible world abandon us not. We seek Thy shelter, we place ourselves under Thy protection, take us, O take us unto Thy lap as the mother takes up her children.

Danger and difficulties beset us ; the din of the world tends to estrange us from Thee—Do Thou, who :art all-merciful, protect us and so ordain that nothing can separate us from Thee. Grant, O Lord, that we may devote ourselves to Thy work as long as life remains, in the full assurance that Thou art ever with us' as our Father and our Mother—Santih—Santih

VIII

O Lord our God, draw us unto Thee. What need have we to pray to Thee for worldly possessions ? All the day long, all the night through, it is Thy mercy that nourishes our body and mind. It is from Thy hand that prosperity and adversity, joy and sorrow, reward and punishment come to us and contribute to our well-being and advancement. From the moment we were born Thou hast showered Thy mercy arround us without stint. What shall we then pray for to Thee ? Let Thy will be done, for that alone is good that Thou dost will. Let Thy will be done that peace and good-will may reign over the world for ever and evermore. We know not what conduces to our welfare and what to our misery—only this we know that to obtain Thee is the highest good attainable by man. If the renunciation of all wealth and possessions, all honour and rank and even life-itself be the way to obtain Thee, such renunciation must be the greatest good for us ; but if forsaking Thee be the way to the throne of • the monarch of the world, no evil can be greater then such a consummation. When Thou comest to our heart we obtain all the good in the world. Therefore we pray to Thee for only one boon—the boon of the light of Thy countenance. We call unto Thee saying "আবিরাবীর্ম্মএধি" reveal Thyself to us, remain in our heart, abide in it as its Lord—and do then take us unto Thyself. Our vision is fixed neither on the earth nor on the heaven but on Thee alone. Thee only do we behold and :Thee only do we covet. Our heart yearns for Thy company, and for Thy words of comfort and consolation ; come and dwell in this broken heart, and descend to this poor cottage of our bodily frame. We have no hope that our powers will avail us much, we have no strength of our own, and we can not do much for Thy sake. Thy mercy is our all. Thou art our all. Enclose us within Thy embrace ; grant us protection under the shadow of Thy feet, bring us within the sphere of Thy love, and deliver us from all misery and affliction.

Whenever, O God, I have prayed to Thee, Thou hast heard my prayer. On the lofty mountain-top have I beheld Thee and when in the heart of the desolate forest I have sought Thee longing, Thou hast even then shed on my heart the cooling waters of Thy peace. Whenever I pray to Thee in this holy temple dedicated to Thy worship, Thou manifestest Thyself to me: I perceive that Thou seest my heart, that Thine eyes of love are fixed on my eyes. Inaccessible art Thou to these material eyes of mine ; the eye of the soul, the eye of wisdom can alone behold Thee. What my eyes now thirst for is the dust of Thy feet, imprinted on the faces of Thy devout worshippers, the faces glowing in the ecstacy of love and adoration. And my ears are eager to hear Thy deep solemn voice, the voice that issues in the stillness of the night from the billions of stars travelling in their orbits and kept in majestic order in their spheres by law immutable. In my mind's eyes I obtain glimpses of Thy goodness. Wherever I turn, the pure love of the devoted constant wife—the disinterested, unwavering affection of the mother and the sincere attachment of the friend are now clearly brought home to my understanding as reflections caught from Thy supreme Goodness.

O Lord my God, grant that I may be privileged to behold Thee to the end of my days and when departing from this life I wake up in Thy new kingdom, may I have the power to sing again Thy glory, to offer Thee the gift of my tears of love and to do the works that Thou lovest.

Brethern, our hearts are now full, let us all jointly pray to Him.—

অসতোমা সদ্গময় তমসোমা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতংগময়। আবিরাবীর্ম্মএধি রুদ্র যত্তে
দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।

Lead us, O Lord, from the false to the true, lead us from darkness unto light, from death unto immortality. Thou who art the

source of all light, reveal Thyself unto us. O Thou dread Lord, may Thy benign countenance protect us for ever and ever.

Santih—Santih.

---

## নানা কথা।

**ধূমকেতু।**—পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদাই আকাশের গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিপথে অনেক সময়ে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে এক একটা আমাদের পৃথিবীর খুব নিকটস্থ হয়, তখন জ্যোতির্ব্বিদেরা অনুমান করেন, এইবার বুঝি আমাদের প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পৃথিবীর সঙ্গে একবার একটা এইরূপ জ্বলন্ত পিণ্ডের সংঘর্ষণ হইলে পৃথিবীর যে কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। হয়ত এই পৃথিবী একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া অণুকণায় পরিণত হইবে। কিম্বা উত্তাপে সমস্ত পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া এক উত্তপ্ত বাষ্পগোলক গঠিত হইবে। এইরূপ একটা আশঙ্কার কথা প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রেও একটা আশ্বাসবাণী পাইয়া থাকি "ন দেবাঃ সৃষ্টিনাশকাঃ"। এইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট গতি ব্যোমচারী আগন্তুক সম্প্রতি আমাদের পৃথিবীর প্রায় গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই ধূমকেতুটি আবার তীব্র বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। এইরূপ ধূমকেতু ইত্যগ্রে কখনও দেখা যায় নাই। জ্যোতির্ব্বিদেরা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে জাগতিক পরিবারের মধ্যে এমন একটা কুগ্রহ আছে। ইহার নিশ্বাস যদি পৃথিবীর গাত্রে একবার লাগিত তাহা হইলে পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব জন্তু, এমন কি তরুলতারাও প্রাণ হারাইত। এই ধূমকেতুটি "সাইনোজেন" নামক একরকম বাষ্পে পরিপূর্ণ—এই বাষ্প এরূপ মারাত্মক যে ইহার কণামাত্র সমস্ত জীব-জগৎকে ধ্বংস করিতে পারে। করুণাময় পরমেশ্বরের অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই গ্রহটী এখন পৃথিবী হইতে বহুলক্ষ যোজন দূরে অন্তর্হিত হইয়াছে, এজন্য এখন আর আমাদের বিশেষ চিন্তার কারণ নাই।

সেপ্টেম্বরের প্রথমে যুক্ত-আমেরিকা ও মার্সেলিসের দুইজন জ্যোতির্ব্বিৎ দুই বিভিন্ন মানমন্দির হইতে প্রায় একই সময়ে এই ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। প্রথমে দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহা একটি অস্পষ্ট ক্ষুদ্র বাষ্পপিণ্ডবৎ দেখা যায়। একমাসের মধ্যে ইহা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল এবং সহজ চক্ষুতেই দেখা গেল। ইহার অনেকগুলি আলোক-চিত্র লওয়া হইয়াছে। ইহাতে অনেক তথ্য সুস্পষ্ট হইয়াছে। প্রথম চিত্র লইবার সময়ই ইহার পুচ্ছ আছে দেখা যায়—তৎপরে দেখা যায় সম্মার্জ্জনীর ন্যায় পুচ্ছ বহুঅংশে বিভক্ত এবং তথা হইতে আলোকশিখা ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ধূমকেতুর পুচ্ছগুলি সূর্য্যের বিপরীত দিকে থাকে, ইহা অনেক দিন হইতে জানা আছে। সূর্য্যরশ্মি সমূহ ধূমকেতু গুলির উপর পড়িয়া যেন জোর করিয়া উহাদিগের শিখাগুলিকে বিপরীত দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। এই তথ্যটী উল্লিখিত ধূমকেতুতে সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়াছে। ইহার পুচ্ছ বিস্তারিত হইয়া কোটী ক্রোশেরও অধিক চলিয়া গিয়াছে। আলোক বিশ্লেষণ ( Spectroscope ) যন্ত্রের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে অন্যান্য ধূমকেতুর ন্যায় ইহা "হাইড্রোকারবন" বাষ্পে গঠিত নহে। ইহার প্রধান উপাদান "সাইনোজেন" বাষ্প; এই বাষ্প "আজোট"ও "কার্ব্বন" মিশ্রনে উৎপন্ন হয় এবং ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ইহার এই বাষ্পময় পুচ্ছের কিয়দংশ মহীমণ্ডলস্থ বায়ুরাশির সহিত মিশ্রিত হইলে সকল প্রাণীকুল জীবন হারাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি আন্দোলন চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইত। এখন ধূমকেতুটি কোটী কোটী ক্রোশ দূরে গিয়াছে, আমরাও সুস্থমনে ইহার আলোচনা করিতেছি।

**অচল নক্ষত্র।**—আকাশে যে অচল নক্ষত্র গুলি দেখা যায়, উহাদের আকৃতি সুবৃহৎ। দূরবীক্ষণদ্বারাও লক্ষ্য করা যায় না। কেবল একটি একটি আলোক বিন্দুবৎ প্রতীয়মান হয়। উহাদের উজ্জ্বলতার তারতম্য অনুসারে সহজ চক্ষু কোনটিকে অতিক্ষুদ্র ও কোনটিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ দেখে। আলোক বিন্দুর উজ্জ্বলতার তারতম্য আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে কিরূপে নিয়মিত করে, তাহা বুঝিতে হইলে "দর্শন ক্রিয়া" কি রকমে সম্পন্ন হয় সেটা জানিতে হইবে। অক্ষিগোলকের পশ্চাদ্বর্ত্তী ঝিল্লী বিশেষকে অক্ষিপট বলে। বাহ্যবস্তুর প্রতিকৃতি উহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা চাক্ষুষ-শিরাদ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। তখন আমাদের দর্শনজ্ঞান জন্মে। এই অক্ষিপটে অনেকগুলি স্তর আছে। ইহার মধ্যে একটি স্তর সমবর্ত্তুল ও মোচাকার কোষসমূহে গঠিত। আলোক বিন্দু অক্ষিপটের অন্তর্গত ঐ স্তরের উপরে যে পরিমানে আলোক বিকীরণ করে উহাও সেই অনুপাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ দেখায়। এবং এই জন্য অচল নক্ষত্রগুলিও ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতীত হয়।

**লৌহ-সংস্কার।**—বিশুদ্ধ লৌহ আকর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উহার সহিত অনেক প্রকার দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। ক্রমে পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও লৌহকে একেবারে নির্ম্মল করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি জর্ম্মনদেশীয় রসায়ণতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ক্রোজলার (Dr.Krausler) বহুবিধ রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়া দ্বারা অতি সুকৌশলে উহা সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি বলেন সাধারণ লৌহের সহিত এই নির্ম্মল লৌহ অনেকাংশেই মিলে না। ইহার সহিত প্লাটিনাম ধাতুর সাদৃশ্য আছে।

শ্রীমনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

Science Jotting—"Empire"

---

**বিলাতে মাঘোৎসব।**—লণ্ডন নগরে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রগণের উৎসাহে ও চেষ্টায় Essex Hall এ মাঘোৎসব হইয়াছিল। রেঃ চার্লস ভয়েসী সাহেব একদিন বক্তৃতা দেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি বলেন "Beware of any form of christianity" খৃষ্টীয় ভাব হইতে ব্রাহ্মগণকে সাবধান থাকিতে হইবে। Harrison সাহেব ও Rev. John Page Hopps সাহেবও বক্তৃতা দান করেন।

**অনুবাদ।**—মহর্ষির আত্মজীবনী বাঙ্গালা হইতে উর্দ্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু উহার ইংরাজি অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশ করিবেন আশা আছে।

**বিবাহে বিচ্ছেদ।**—The christian Life পরিতাপের সহিত ২৩এ জানুয়ারি তারিখের পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে বিবাহে বিচ্ছেদের (divorce) আধিক্য দেশের দুর্গতি সূচনা করে। United Estates ইউনাইটেড্ ষ্টেটসে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইহার সংখ্যা নিতান্ত অধিক; দিন দিন বাড়িয়া চলিতেছে হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না। এমন কি প্রত্যেক বারটি বিবাহের মধ্যে একটি বিচ্ছেদে পরিণত হয়।

**অপরাধ।**—বিগত ৫০ বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স দেশে যদিও লোকসংখ্যা বর্দ্ধিত হয় নাই কিন্তু, অপরাধ সংখ্যা তিন গুণ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

**সংযম।**—রেখাক্ষরের (short-hand) সৃষ্টিকর্ত্তা পিটমানের (Sir Isaac Pitman) জীবনী বাহির হইয়াছে। ৮৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি ভয়ানক পরিশ্রমী ছিলেন। পিটমান সাহেব বলেন ত্রিশ বৎসর বয়সে আমি অজীর্ণ রোগে মৃতপ্রায় হইয়াছিলাম। ডাক্তারেরা দিনের ভিতরে তিনবার মদ্য ও মাংস ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ফলে রোগ আরও ভীষণ আকার ধারণ করিল। তাহা দেখিয়া আমি মদ্য মাংস একেবারে পরিত্যাগ করিলাম। ক্রমে আমার পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পাইল। ত্রিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি প্রতিদিন চৌদ্দ ঘণ্টা লেখাপড়ার কার্য্য করিয়াছি; এবং সুস্পষ্ট ধারণা হইয়াছে যে মদ্য মাংস ত্যাগ ও ধুমপান বিরতি আমার স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম শক্তির নিদান। Lord Mayor লর্ডমেয়র ৭৪ বৎসর বয়সে একবার তাঁহাকে Mansion Houseএ নিমন্ত্রণ করেন এবং সেখানে পিটমান সাহেবের আহার পানের জন্ত কেবলমাত্র আলু ও এক গ্লাস জল ছিল।

**উৎসব।**—বিগত ২৩।ফাল্গুন তারিখে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব বিশেষ অনুরাগের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী সেন মহাশয়ের এক মাত্র উদ্যম ও যত্নে এখানকার ব্রাহ্মসমাজ বহুকাল হইতে নানা-বিধ বিপদ ও বিনাশের মধ্য দিয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আসিতেছে। বিনোদ বাবু স্বয়ং আসিয়া উৎসবের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়কে ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত কাঙ্গালীচরণ সেনকে লইয়া যান। তাঁহারা পূর্ব্বদিবস সন্ধ্যার সময়ে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া পরলোক গত সম্পাদক যোগেশচন্দ্র সরকারের বাটীতে উপাসনা করেন। প্রত্যেক বৎসর ঐ দিবসে এই বাটীতে পারিবারিক উপাসনা হইয়া থাকে। পর দিবস সমাজ গৃহে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা ও উপদেশাদি হইয়াছিল। উৎসবে পরিমিত সংখ্যক লোকের সমাগম হইলেও তাঁহারা শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে ঔপনিষদ ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ শুনিয়া বিশেষ সুখী ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ স্থাপন করিয়াছেন। পর দিবস প্রাতে বিনোদ বাবুর বাটীতে পারিবারিক উপাসনা ও উপদেশ হয়। বন্ধু বান্ধব ও পারিবারিক স্ত্রীগণ গৃহ কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া মধুময় প্রভাতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ রসের যে কি এক অনুপম মহিমা এই সময়ে তাহার এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হইয়াছিল। জনৈক সুপণ্ডিত কবিরাজের সহিত কোন ব্রাহ্ম পরিবারের বাটীর সীমা লইয়া বিবাদ চলিতেছিল এবং তাঁহারা উভয়ে রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু উপাসনার অব্যবহিত পরেই শাস্ত্রী মহাশয় যখন সেই বাদী ও বিবাদী উভয় ব্যক্তিকেই ঈশ্বরের মঙ্গল ও শান্তিভাব স্মরণ করিয়া সদ্ভাবে ও কুশলে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, তখনই তাহা সুফল প্রসব করিল! তাঁহারা অনুতপ্ত চিত্তে বিবাদ মিটাইয়া সদ্ভাবে বাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর সন্ধ্যার সময়ে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু গঙ্গানারায়ণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে ব্রহ্মোপাসনা ও উপদেশ হয়। চিকের অন্তরালে মহিলাগণ ও বাহিরে অনেকগুলি সুশিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক সমাসীন হইয়াছিলেন। উপাসনা উপদেশ ও সঙ্গীতের মধুর ভাবে সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

যে যে পরিবারে উপাসনা হইয়াছিল, তাঁহারা প্রায় সকলেই হিন্দু-সমাজ ভুক্ত। কিন্তু হিন্দু বলিয়া ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের প্রতি কাহারও ঘৃণা বা অরুচি দূরে থাকুক বরং তদ্বিপরীত শ্রদ্ধা ও অনুরাগের বিশেষ পরিচয় সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়াছে। মার্জ্জিত হিন্দু আচারের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পতিত হইলে হেমন্ত প্রভাতে তৃণোপরি শিশির-বিন্দুর ন্যায় শোভা ধারণ করে।

শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৬ চৈত্র শ্রীরামপুর প্রবাসী শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রীর আদ্য-শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতা দক্ষিণেশ্বর এবং শ্রীরামপুরের অনেকগুলি ভদ্র বন্ধু আসিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। তারিণী বাবু ও তাঁহার পুত্রেরা এই ধার্ম্মিকা সতীর ইচ্ছানুসারে আদি-সমাজের পদ্ধতি অনুসারে শ্রাদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শ্রাদ্ধের গুরুত্ব রক্ষা করিয়াছেন। গঙ্গা বক্ষে দ্বিতল প্রকোষ্ঠে শ্রাদ্ধের বেদ মন্ত্র সকল উচ্চারিত হইতেছে। নিম্নে বিশাল গঙ্গাস্রোত ও প্রার্থনা কালীন মাতৃভক্ত সুশীল পুত্রগণের অশ্রুধারা একত্র মিশিয়া সেই পরলোকগত জননীর আত্মাকে সিক্ত করিতেছে। এই দৃশ্যে শ্রাদ্ধ স্থল অনুপম শোভা ধারণ করিয়াছিল। আমরা প্রার্থনা করি এই পরলোক গতা সতীর আত্মাকে পরম-পিতা পরমেশ্বর শাশ্বত আনন্দে অভিষিক্ত রাখুন।

---

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, আশ্বিন হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ২২৮৮৸৶৬ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩২৫২৸০ |
| সমষ্টি | ... | ৫৫৪১॥৶৬ |
| ব্যয় | ... | ২২৫৭৻৬ |
| স্থিত | ... | ৩২৮৪॥৶০ |

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ

২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত

৬৮৪॥৶০

৩২৮৪।৶

আয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ... | ১১০৬।৩ |

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান

১০০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় | ১০৲ |

আনুষ্ঠানিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী | ১০৲ |
| শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দত্ত | ১৲ |

মাঘোৎসবের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত | ২৲ |
| শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী বসু | ২৲ |
| শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত | ২৲ |
| শ্রীযুক্ত হরকুমার সরকার | ১৲ |
| দানাধারে প্রাপ্ত | ৷৩ |
| ইলেকট্রিক লাইটের হাওলাত আদায় | ৭৫৲ |
| | ১১০৬।৩ |

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৭৮৲ |
| পুস্তকালয় | ... | ৫৯॥০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৪৭৯৸৶৩ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ১০৭।০ |
| ইলেক্ট্রিক লাইট | ... | ৪৫৮৲ |
| সমষ্টি | ... | ২২৮৮৸৶৬ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ১০৮৪৸৶৬ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ১৫৮॥৬ |
| পুস্তকালয় | ... | ২০॥৶৬ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৫২৪৶৯ |
| ব্রাঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ১৬।৶৬ |
| ইলেক্ট্রিক্ লাইট | | ৪৫২⁄৯ |
| সমষ্টি | ... | ২২৫৭৻৬ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

---

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"
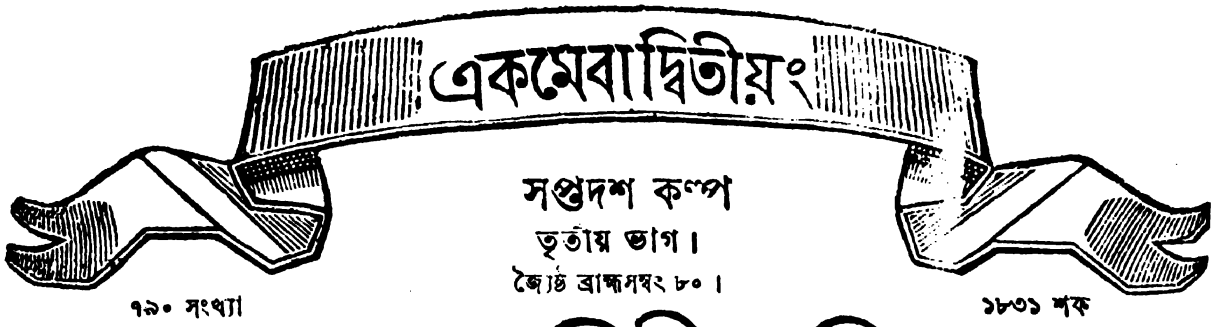
## নববর্ষ।

সে গৃহ ভাঙ্গিয়া তুমি নিয়াছ আমার
জীবনের বিনিময়ে কভু কি আবার
ফিরায়ে পাইব, নববর্ষের মতন ?
চাহিনা নূতন কিছু, সব পুরাতন
দেও দেব, সেই হাসি চির সমুজ্জ্বল,
সেই প্রেম জাহ্নবীর সঙ্গম কল্লোল
অনন্ত প্রবাহে, স্নিগ্ধ পরশ হিল্লোলে
কত যুগ যুগান্তের হৃদি উৎসজলে
ভরিয়া উঠিত সুখ, প্লাবন উচ্ছ্বাসে
ছয় ঋতু সঞ্চা-রিয়া বরষে বরষে,
তোমার মহিমা প্রাণে দিত জাগাইয়া
মূর্ত্তিমান করি তোমা, পূজিবারে হিয়া ;
পরিপূর্ণ জীবনের সে দিন হেলায়
কাড়িয়া লয়েছ, আজি নাহিক হেথায়
অতীতের সুখ চিহ্ন ; শুধু স্মৃতি তার
বহিয়া এমন করি কতদিন আর
রহিব তোমার বিশ্বে তোমারে ভুলিয়া,
আপনার শোক দুঃখে এমনি ডুবিয়া ?
অসীম করুণা তব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
জীবে শান্তি প্রদানিছে বরষ আনিয়া,
সেই নব বর্ষ আজ, শান্তির ভিখারী
আসিয়াছি তব কাছে শোকতাপহারী।

১লা বৈশাখ ১৩১৬। শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

---

## নববর্ষ।

সুমঙ্গল সুপ্রভাত জাগে আজি প্রাণে,—
সেজেছে প্রকৃতি-সতী নব পরিধানে ;
প্রস্ফুটিত পুষ্পরাজি সৌরভ বিলায় আজি
চারিদিকে নবভাব নবীন বাসনা ;
হৃদয়ে বিকশি উঠে তব আরাধনা।
নীলাম্বরে নীলমেঘ চন্দ্রাতপ সম
দিতেছে কোমল আভা স্নিগ্ধ অনুপম ;
হাসে আজি ধরাতল, হাসিতেছে অস্তস্থল,
আসিবেন পিতা আজি আমাদের ঘরে
দিতে তাঁর পদ ধূলি বৎসরের পরে।
নব বল নবোৎসাহ কর সবে দান।
তব প্রেমে পূর্ণ কর আমাদের প্রাণ।
তাই মোরা জোড়হাত করিতেছি প্রণিপাত,
তোমারে ছাড়িয়া চলে' নাহি কভু যাই—
অধর্ম্মের পথে যেন সদা ব্যথা পাই।
সবার মাঝারে দাও ধৈর্য্য বীর্য্য ক্ষমা,—
সুকোমল স্নেহ দাও, হৃদয়ে সুষমা ;
সন্তোষ আনন্দ দেহ প্রাণনাথ প্রাণে রহ,
সুখ দুখ সমভাবে হৃদে যেন সহি ;
সবার মাঝারে যেন তব নাম লই।
এ নব বরষে সখা এই মুলগনে
করহ সফলকাম তোমার মিলনে ;
পরশিয়া ও চরণ লভি তব আলিঙ্গন
পুলকিত কর মন অনন্ত সে প্রেমে ;
ফুটিয়া উঠুক দেব স্বর্গ ধরাধামে।

শ্রীলীলা দেবী।

## মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

প্রাতঃকালে যখন শয্যাত্যাগ করিতে অনিচ্ছা হইবে, তখন এই কথাগুলি আপনার নিকট বলিবেঃ—মানুষের কাজ করিবার জন্য আমি এখন গাত্রোত্থান করিতেছি, কিন্তু যে কার্য্যসাধনের জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি, যাহার জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি, সে কার্য্য সাধন করিতে আমার মন যাইতেছে না। তবে কি শুধু ঝিমাইবার জন্য, নেপের ভিতর গরম থাকিবার জন্য আমি সৃষ্ট হইয়াছি? তা হোক্! কিন্তু ইহাতে বেশ আরামে থাকা যায়। মানিলাম। কিন্তু তুমি কি শুধু সুখভোগ করিবার জন্যই জন্মিয়াছ? তোমার কি কোন কাজ করিবার নাই? কার্য্যই কি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে? গাছপালা, পক্ষী, পিপীলিকা, মাকড়সা, মৌমাছি, ইহাদের দিকে একবার তাকাইয়া দেখ দিকি—দেখিবে, তাহারা সকলেই আপনার স্বভাবানুযায়ী নিজ নিজ কাজ করিতেছে। তবে শুধু কি মানুষই মানুষের মত কাজ করিবে না? তোমার বৃত্তিসমূহকে জাগাইয়া তুমি কি তোমার স্বভাব অনুসারে কাজ করিবার জন্য ধাবমান হইবে না? তাহা হইলেও, বিশ্রাম না করিয়া বাঁচা যায় না। সত্য, কিন্তু প্রকৃতি পানাহারের জন্য একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এ বিষয়ে ত তুমি প্রায়ই সীমা অতিক্রম কর; যাহা তোমার পক্ষে যথেষ্ট, তাহা ছাড়াইয়া যাও। কিন্তু শুধু কাজ করিবার সময়েই, যাহা তোমার সাধ্যায়ত্ত, তাহা অপেক্ষাও কম করিবার দিকে তোমার প্রবণতা দেখা যায়। আসলে, আপনার প্রতি তোমার অনুরাগ নাই। যদি তাহা থাকিত, তাহা হইলে তুমি তোমার মানব-স্বভাবকে ভালবাসিতে এবং সেই মানব-স্বভাবের আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে। দেখ না কেন, যখন কোন ব্যক্তি নিজের ব্যবসায় ভালবাসে, তখন সে তাহার কাজ যাহাতে সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়, তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একজন ছুতোর, ছুতোরের কাজকে,—একজন নৃত্যের শিক্ষক নৃত্যকলাকে যেরূপ সম্মান দেয়, তুমি তোমার মনুষ্যধর্ম্মকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান দেও। কিন্তু ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য, খ্যাতিলাভের জন্য, গর্ব্বস্ফীত ও ধনলুব্ধ ব্যক্তিদিগের কতই না আগ্রহ দেখা যায়। এই সকল লোক যখন একটা কিছু পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে, তখন তাহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। তুমি কি মনে কর, এই সকল তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ অপেক্ষা তাহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য সকল কম মূল্যবান?

যতক্ষণ না আমার চলৎশক্তি রহিত হয় ততক্ষণ আমি প্রকৃতির পথে—ধর্ম্মের পথে চলিব, তাহার পর আমি বিশ্রাম করিব; যে বায়ু হইতে আমার দৈনিক নিঃশ্বাস পাইয়াছি, সেই বায়ুর মধ্যে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিব; যে ধরণী আমার পিতৃপুরুষদিগকে পোষণ করিয়াছেন, আমার ধাত্রীকে দুগ্ধ যোগাইয়াছেন এবং এতদিন আমার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহের অপব্যবহার করিলেও যিনি সমস্ত সহ্য করিয়াছেন, অন্তিমে সেই ধরণীর ক্রোড়েই শয়ন করিব।

উপকার করিয়া কেহ কেহ প্রতিদান স্বরূপ তোমার নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা চাহিয়া থাকে; কেহ কেহ ইহা অপেক্ষা বিনীত; তাহারা তোমার যে উপকার করে,

তাহা মনে করিয়া রাখে, এবং তুমি যে তাহার নিকট ঋণী কতকটা সেই ভাবে তোমাকে দেখে। আর এক প্রকৃতির লোক আছে, তাহারা উপকার করে অথচ জানে না তাহারা উপকার করিতেছে। উহারা কতকটা দ্রাক্ষালতার মত; দ্রাক্ষালতা ফল ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট; গুচ্ছ গুচ্ছ আঙ্গুর ধারণ করে অথচ তাহার জন্য ধন্যবাদ প্রত্যাশা করে না। একটা শীকারী কুকুর যখন ভাল করিয়া তাহার কাজ করে কিংবা যখন কোন মৌমাছি একটু মধু সঞ্চয় করে তখন তাহারা কোন সোর-সরাবৎ করে না। যাহারা উপকার করিয়া সে কথা কিছু মনে করে না, তাহাদিগেরই আচরণ আমাদের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক কোন রোগীর জন্য অশ্বারোহণের ব্যবস্থা করেন, কোন রোগীকে ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে উপদেশ দেন। বিশ্বপ্রকৃতিও কতকটা এই উদ্দেশেই কাহারও জন্য পীড়া, কাহারও জন্য অঙ্গনাশ, সম্পত্তি নাশ, এবং এইরূপ অন্যান্য বিপদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। যেরূপ প্রথম স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উপদেশ, সেইরূপ শেযোক্ত স্থলে "ব্যবস্থার" অর্থ, প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি ও অদৃষ্টের উপযোগী বিশেষ বিশেষ প্রয়োগ। দেয়ালে পাথরগুলা ভাল করিয়া যোড়া দেওয়া হইলে কারিগররা বলিয়া থাকে, পাথরগুলা বেশ খাপে খাপে বসিয়াছে; আমাদের জীবনের কঠোর ঘটনাগুলিকে এইরূপ ভাবে দেখা উচিত। যেমন এই জগৎ বিশ্বপ্রকৃতির উপাদানেই গঠিত, বিশ্বপ্রকৃতি হইতেই এই জগৎ স্বকীয় রূপ ও সমগ্রতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ ইহার মধ্যে যে কার্য্যকারণ-পরম্পরা রহিয়াছে তাহারই যোগাযোগে অদৃষ্টের বিশেষ ফলাফল প্রসূত হয়। সাধারণ লোকে এ কথা বেশ বোঝে। তাহাদের বলিবার ধরণটা এই ঃ—"অমুকের এইরূপ ঘটিয়াছে, কেন না, ইহা তাহার অদৃষ্টে ছিল।" চিকিৎসকের ব্যবস্থা পত্র অনুসারে যেমন আমরা চলিয়া থাকি, সেইরূপ আমাদের ললাটলিখনের কথাও যেন আমরা অকাতরে পালন করি। অরুচিকর ও তিক্ত হইলেও, স্বাস্থ্যের খাতিরে ঔষধ যেমন আমরা হৃষ্টচিত্তে গলাধঃকরণ করি; সেইরূপ, প্রকৃতি যাহাকে হিতজনক ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাকে তোমার নিজের স্বাস্থ্যের মত মনে করিবে। অতএব যখন কোন বিপর্য্যয় ঘটিবে, তখন তাহা শান্ত ভাবে গ্রহণ করিবে। ইহা বিশ্বজগতের স্বাস্থ্যের উদ্দেশেই ঘটিয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত জানিও, যদি জগতের হিত না হইত, তাহা হইলে কখনই এই দুর্ঘটনা তোমার নিকট প্রেরিত হইত না। আর প্রকৃতি কখনই খামখেয়ালি ভাবে কাজ করেন না, তিনি এমন কোন কাজ করেন না, যাহা তাঁহার শাসনাধীন জীবসমূহের অনুপযোগী। অতএব, দুই কারণে তোমার নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে ঃ—প্রথমত,—অতীব উচ্চ ও অতীব পুরাতন কারণসমূহ হইতে তুমি এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ এবং ইহা গোড়া হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আছে। দ্বিতীয়তঃ, সমগ্র জগতের সাধারণ হিতের জন্য ব্যক্তিবিশেষের অদৃষ্ট নির্দ্ধারিত হয়। সমগ্র হইতে কিয়দংশ ছাঁটিয়া ফেলিলে সমগ্রকে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলা হয়, সমগ্রের ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। অতএব, তুমি যদি আপনার অবস্থায় অসন্তুষ্ট হও,—তাহার অর্থ এই তুমি বিশ্বপ্রকৃতির অঙ্গহানি করিতে চাহ, তোমার

যতটা সাধ্য, জগৎকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিতে চাহ।

বস্তু ও রূপ লইয়া—অর্থাৎ শরীর ও আত্মা লইয়াই আমার সত্তা; ইহার কোনটাই ধ্বংস হইবার নহে; কেন না, উহারা 'নাস্তি' কিংবা 'কিছু না' হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সুতরাং আমার সত্তার প্রত্যেক অংশ জগতের কোন-না-কোন কাজে লাগিবে, এবং এই অংশ আবার অপর অংশে পরিবর্ত্তিত হইবে—এবং এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকিবে। এই চিরপরিবর্ত্তনের পদ্ধতি হইতেই আমার সত্তা উৎপন্ন হইয়াছে,—আমার পূর্ব্বে, আমার পিতার সত্তাও এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছে—এইরূপ অনাদি অতীত কাল হইতেই এই প্রবাহ চলিতেছে।

প্রজ্ঞা ও যুক্তি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত—অপরের সাহায্য উহাদের প্রয়োজন হয় না। উহারা আপনার মধ্যেই বিচরণ করে এবং অব্যবহিতরূপে কার্য্য করে; প্রজ্ঞা ও যুক্তি অনুসারে আমরা যে কাজ করি তাহাই ঠিক্ কাজ, উহা ঠিক্ পথ দিয়া আমাদিগকে লইয়া যায়।

মানুষের হিসাবে যে সমস্ত জিনিস মানুষের তাহাই মানুষের নিজস্ব, তাহা ছাড়া মানুষের নিজস্ব কিছুই নহে। কেন না, মনুষ্যত্বের ভাবের মধ্যে ঐ সমস্ত জিনিসের সমাবেশ নাই, সুতরাং মানুষের হিসাবে সে সমস্ত জিনিসে আমাদের প্রয়োজন নাই; আমাদের মনুষ্যত্ব সেই সকল জিনিস দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করে না, এবং সেই সকল জিনিসে আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণতাও সম্পাদিত হয় না। সুতরাং সেই সমস্ত মানুষের প্রধান লক্ষ্য নহে। যদি এই সমস্ত বাস্তবিকই আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইত, তাহা হইলে ঐ সকলের জন্য কেন আমাদের অবজ্ঞা উপস্থিত হয়, এবং সেই সমস্ত ছাড়িয়া সুখী হইতে পারিলে কেন উহা এত প্রশংসার বিষয় হইয়া থাকে? যদি বাস্তবিকই ঐ সকল জিনিস আমাদের পক্ষে ভাল হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত সুবিধা ছাড়িয়া দেওয়া কি নিতান্ত বাতুলতার কাজ নহে? কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। কেন না, আমরা ইহা বেশ জানি,—এই সকল বিষয় সম্বন্ধে আত্মত্যাগ ও ঔদাসীন্য, এবং ঐ সকল বিষয় আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেলে যে ধৈর্য্য আবশ্যক সেই ধৈর্য্যই সাধু ব্যক্তির লক্ষণ।

---

## মনুর উপদেশ।

### মোক্ষসাধন কর্ম্ম।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানমিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযমঃ
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥

বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা—এই সমস্ত পরম নিঃশ্রেয়স্কর কর্ম্ম অর্থাৎ মোক্ষের উৎকৃষ্ট সাধন।

সর্ব্বেষামপি চৈতেষাং শুভানমিহ কর্ম্মণাম্
কিঞ্চিচ্ছ্রেয়স্করতরং কর্ম্মোক্তং পুরুষং প্রতি॥

এই সকল শুভ কর্ম্মের মধ্যে পুরুষের পক্ষে কোন্ কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অধিকতর শ্রেয়স্কর?

সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্
তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাম্ প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥

এই সকল মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; উহা সকল বিদ্যার মধ্যে প্রধান; উহা হইতেই অমৃত লাভ হয়।

ষন্নামেষান্তু সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং প্রেত্য চেহ চ
শ্রেয়স্করতরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বদা কর্ম্ম বৈদিকম্॥

কি ইহকালে কি পরকালে, উপরোক্ত

ছয়টি মোক্ষসাধন কর্ম্মের মধ্যে, বৈদিক কর্ম্মই সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর জানিবে।

বৈদিকে কর্ম্মযোগে তু সর্ব্বাণ্যেতান্যশেষতঃ
অন্তর্ভবন্তি ক্রমশস্তস্মিং স্তস্মিন্ ক্রিয়াবিধৌ॥

পূর্ব্বোক্ত সমুদয় কর্ম্মই ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগে সেই সেই ক্রিয়াবিধির অন্তর্ভূত হইয়া থাকে।

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার—প্রবৃত্ত কর্ম্ম ও নিবৃত্ত কর্ম্ম; প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হয় এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মুক্তিলাভ হয়।

ইহ চামুত্র বা কামং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥

ইহলোক-সম্বন্ধে অথবা পরলোক সম্বন্ধে, কোন কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত-কর্ম্মবলে; কিন্তু জ্ঞান পূর্ব্বক নিষ্কাম যে কর্ম্ম তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে।

প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্
নিবৃত্তং সেবমানস্ত ভুতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

প্রবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠানে দেবতাদিগেরও সমান হওয়া যায়, আর নিবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে পঞ্চভূতকেও অতিক্রম করা যায়।

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

আত্মযাজী, আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে সমভাবে দেখিয়া স্বারাজ্য লাভ করে (ইহাই অধ্যাত্মিক "স্বরাজ")।

যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ
আত্মজ্ঞানে শমে চ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যথোক্ত সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও আত্মজ্ঞান, শম (ইন্দ্রিয়জয়) প্রণব উপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন।

এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ
প্রাপৈত্যৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥

এই সকলই দ্বিজাতির-বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্মসাফল্যের মূলীভূত; ইহা লাভ করিয়াই দ্বিজ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, ইহার অন্যথা নাই।

—

## জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে ফোটোগ্রাফি।

যন্ত্রব্যবহার আজকাল অনেক দুঃসাধ্য কাজকে অনায়াসসাধ্য করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি অনেক ব্যাপারে এখন যন্ত্রই প্রধান অবলম্বন। বিজ্ঞানও যন্ত্রের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। দূরবীক্ষণ অণুবীক্ষণ এবং স্পেক্ট্রোস্কোপ্ (Spectroscope) প্রভৃতি যন্ত্রগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক প্রহেলিকার মীমাংসা করিয়াছে সত্যই তাহার ইয়ত্তা হয় না। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে হার্শেল সাহেব যখন তাঁহার স্বহস্ত-নির্ম্মিত দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্যে ইউরেনাস্ গ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন জ্যোতিঃশাস্ত্রের ন্যায় একটা গণিতপ্রধান বিদ্যায় যন্ত্রব্যবহারের উপযোগিতা দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। এখন আর সে বিস্ময়ের কারণ নাই। ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভেরিয়ার (Le Verier) এবং ইংরাজ বৈজ্ঞানিক আডামস্ সাহেব যে দিন কেবল গণিতের সাহায্যে নেপ্চুন্ গ্রহের আবিষ্কার সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত কেবল গাণিতিক হিসাবে আর কোন জ্যোতিষ্কের আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কর্ত্তারা এখন যন্ত্রকেই গবেষণার প্রধান অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছেন।

নানা জ্যোতিষিক যন্ত্রের মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্ মহলে আজকাল ফোটো-

গ্রাফের ক্যামেরার বড়ই আদর। এই ক্ষুদ্র যন্ত্রটির সাহায্যে গত ষাট বৎসরের মধ্যে যে সকল জ্যোতিষিক আবিষ্কার সুসম্পন্ন হইয়াছে, আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাদেরি একটি স্থূল বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব। পূর্ব্বে ফোটোগ্রাফের যন্ত্র কেবল ছবি তোলার জন্যই ব্যবহৃত হইত; ইহা যে কোন কালে বৈজ্ঞানিকদিগের হস্তে পড়িয়া চক্ষুর অগোচর নানা জ্যোতিষ্কের পরিচয় সংগ্রহ করিতে থাকিবে, তাহা সেই সময়ে কেহ কল্পনাই করিতে পারেন নাই।

মানবচক্ষুর গঠনপ্রণালী খুব সুন্দর হইলেও বিধাতা ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া দেন নাই। অতিদূর জ্যোতিষ্কের ক্ষীণ আলোকে মানবচক্ষু সাড়া দেয় না। কিন্তু রাসায়নিক প্রলেপ-যুক্ত ফোটোগ্রাফের কাচের উপর সেই ক্ষীণালোকই দীর্ঘকাল ধরিয়া পড়িতে থাকিলে কাচে ইন্দ্রিয়াগ্রাহ্য ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কটির ছবি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। বহুক্ষণ কোন অস্পষ্ট জিনিসের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিলে মানবচক্ষু অবসন্ন হইয়া আসে। তখন আর সেই জিনিসটিকে দেখা যায় না। ফোটোগ্রাফের কাচের অবসাদ নাই। রাত্রির পর রাত্রি একই অনুজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের দিকে উন্মুক্ত রাখ, তাহার খুঁটিনাটি সকল বিবরণ কাচের উপরকার চিত্রে ফুটিয়া উঠিবে। আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, আকাশপর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের এই সকল উপযোগিতা বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং কিছুদিন পরেই ইঁহারা এই যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষ্কের চিত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেবল চিত্রদৃষ্টে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কত ধূমকেতু নিহারিকা এবং ক্ষুদ্রগ্রহ (Asteroids) আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

গত ১৮৬০সালে স্পেন্ অঞ্চলে যে পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহারি পর্য্যবেক্ষণে সর্ব্বপ্রথম ফোটোগ্রাফ যন্ত্রের ব্যবহার হইয়াছিল। পূর্ণগ্রহণের সময়ে যখন সূর্য্যমণ্ডল চন্দ্রদ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তখন চন্দ্রের ঘোর কৃষ্ণবিম্বের চারিদিক হইতে রক্তশিখাকারে একপ্রকার আলোক বাহির হইতে আরম্ভ করে। এগুলি চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হয় বলিয়া পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকগণ অনুমান করিতেন, কিন্তু এই অনুমানের পোষক কোন প্রমাণই তাঁহারা দেখাইতে পারিতেন না। স্পেনের সূর্য্যগ্রহণের ছবি উঠাইয়া বিষয়টির মীমাংসা করিবার জন্য দুই জন জ্যোতিষী নানা আয়োজন করিয়াছিলেন। যথাসময়ে ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায় দেখা গিয়াছিল, নগ্নচক্ষুতে দৃষ্ট শিখাগুলি ব্যতীত আরো কতকগুলি ক্ষীণ শিখার সুস্পষ্ট ছবি চিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার দৃষ্টিশক্তি মানবদৃষ্টিশক্তির তুলনায় যে কত প্রখর, বৈজ্ঞানিকগণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন, এবং কেবল পূর্ব্বোক্ত ছবিগুলি পরীক্ষা করিয়া, রক্তশিখাগুলি যে সূর্য্য হইতেই নির্গত হয় তাহাও বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেরই শত শত ছবি উঠানো হইয়াছে। এই সকল চিত্র পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের আকাশমণ্ডল ও তাহার প্রাকৃতিক অবস্থাসম্বন্ধে যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা অন্য উপায়ে আবিষ্কার করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

সৌরতত্ত্বাবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির যতটা

সাহায্য পাওয়া গিয়াছে, গ্রহতত্ত্ব নিরূপণে ইহা ততটা সাহায্য করে নাই। ফোটোগ্রাফের ছবিতে নিকটস্থ গ্রহজাতীয় জ্যোতিষ্কের উপরকার দ্রষ্টব্যগুলি ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে না। এইজন্য ভাল দূরবীন্ দ্বারা গ্রহবিম্ব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণ নিয়মে তাহাদের ছবি অঙ্কন করিবার রীতি আজও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ক্রমে ফোটোগ্রাফির যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, তাহাতে আশা করা যায় গ্রহগণেরও নিখুঁৎ ফোটো উঠাইবার উপায় শীঘ্রই আবিষ্কৃত হইবে।

যে দিন জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ সেই দিনই বুঝিয়াছিলেন নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণে ইহা তাঁহাদের একটি প্রধান সহায় হইবে। এখন তাঁহাদের সেই অনুমান সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে জ্যোতিষীদিগের নিকট ভাল নাক্ষত্রিক মানচিত্র ছিল না। নগ্নচক্ষুতে আকাশে প্রায় ছয় হাজার নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুলির অবস্থান স্থির করিয়া তাহা যথাযথ ভাবে মানচিত্রে নির্দ্দেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কাজেই হস্তাঙ্কিত মানচিত্রে অনেক ভুল থাকিয়া যাইত। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের মানচিত্রাঙ্কন এখন অতি সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্রান্সের দুইজন জ্যোতিষী নক্ষত্রখচিত সমগ্র আকাশের মানচিত্র প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নানা দেশের জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। কার্য্য শেষ হইলে মানচিত্রটি নিশ্চয়ই এক অপূর্ব্ব সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইবে।

এতদ্ব্যতীত পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের (Variable Stars) আবিষ্কারে ফোটোগ্রাফির অনেক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর নক্ষত্রগুলির জ্যোতিঃ সকল সময় সমান থাকে না। এক একটি নির্দ্দিষ্ট কালের শেষে ইহাদের উজ্জ্বলতা স্পষ্ট কমিয়া আসে। জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণে ফোটোগ্রাফির প্রচলন হইবার পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবর্ত্তনশীল তারকার সহিত পরিচিত ছিলেন। এখন একই নক্ষত্রপুঞ্জের নানা সময়ের ছবি তুলনা করিয়া শত শত নক্ষত্রকে পরিবর্ত্তনশীল দেখা যাইতেছে। আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগদ্বিখ্যাত জ্যোতিষী পিকারিং সাহেব অল্প দিনের মধ্যে শতাধিক পরিবর্ত্তনশীল নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন।

নূতন নক্ষত্রের আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব আজকাল একটি অতি সুলভ জ্যোতিষিক ঘটনা বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ কেবলমাত্র দুই একটি নক্ষত্রের আকস্মিক প্রজ্বলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নক্ষত্রমণ্ডলীর ফোটোগ্রাফের ছবি গ্রহণ করার পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার পর নূতন নক্ষত্র আর জ্যোতিষীদিগের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিতে পারিতেছে না। নক্ষত্রপুঞ্জের নানাকালের বহু চিত্র তুলনা করিয়া ইঁহারা অনেকগুলি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। গত ১৮৯২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রজাপতি (Auriga) রাশিতে হঠাৎ একটি নূতন উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা গিয়াছিল। জ্যোতিষিগণ মনে করিয়াছিলেন ঐ দিনেই বুঝি নক্ষত্রটি প্রজ্বলিত হইয়া পড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে উক্ত রাশির যে ছবি উঠানো হইয়াছিল, অনুসন্ধান করায় তাহাতেও ঐ নক্ষত্রটিকে ক্ষীণাকারে দেখা গিয়াছিল। সুতরাং বলিতে হয় জন্মের দুইমাস পরে,

নূতন জ্যোতিষ্কটি জ্যোতির্ব্বিদ্দিগের নিকট ধরা দিয়াছিল। এই ঘটনার পর জ্যোতিষিগণ আকাশের সর্ব্বাংশে খরদৃষ্টি রাখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নূতন নক্ষত্রগুলির লুক্কায়িত থাকিবার এখন আর উপায় নাই।

নানাশ্রেণীর নক্ষত্রগুলির মধ্যে যুগলজাতীয় নক্ষত্রের (Double Stars) গতিবিধি লইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্গণ প্রায়ই আলোচনা করিয়া থাকেন। এই নক্ষত্রগুলি যুগ্মাবস্থায় থাকিয়া এবং কখনো কখনো তিন চারিটি একসঙ্গে থাকিয়া তাহাদের সাধারণ ভারকেন্দ্রের (Centre of gravity) চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্গণ কয়েকটিমাত্র যুগলতারকার সন্ধান জানিতেন। ফোটোগ্রাফের ছবি পরীক্ষা করায় এখন যুগলনক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় দুই হাজার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ঐ উপায়ে ইহাদের অনেকগুলির গতির পরিমাণও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে সকল যুগলনক্ষত্রের জ্যোতিষ্কদ্বয় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী থাকে, তাহাদের যুগ্মতা বুঝিয়া লওয়া বড়ই কঠিন। সাধারণ যুগলনক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা নগ্নচক্ষুতে তাহাকে যেমন একক নক্ষত্রের ন্যায়ই দেখি, বৃহৎ দূরবীন্ দিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে পূর্ব্বোক্ত অতিনিকট যুগলগুলিকে সেইপ্রকার একক নক্ষত্র বলিয়াই ভ্রম হয়। ফোটোগ্রাফের ছবিদ্বারা এই শ্রেণীর অনেক নক্ষত্রের যুগ্মতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। রশ্মিনির্ব্বাচনযন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে ইহাদের যে বর্ণচ্ছত্র (Spectrum) উৎপন্ন হয়, তাহার ছবি উঠাইলে, ফোটোগ্রাফের কাচে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বর্ণচ্ছত্র উপর্য্যুপরি অঙ্কিত হইয়া পড়ে। কাজেই নক্ষত্রগুলিকে দূরবীক্ষণে একক দেখাইলেও তাহারা যে বাস্তবিক একক নয়, তাহা বর্ণছত্রের যুগলছবি দেখিয়া বেশ বুঝা যায়।

নিহারিকাপুঞ্জের (Nebula) সহিত অতিপ্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্দিগেরও পরিচয় ছিল। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতিষিগণ এন্ড্রোমিডা (Andromeda) ও মৃগশিরা রাশির বৃহৎ নিহারিকা দুটিকে নগ্নচক্ষুতে দেখিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী পণ্ডিতগণ এগুলিকে দূরবীন্ দিয়াও পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই ইহাদের প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে এখন এই নিহারিকাদ্বয়ের শত শত ছবি অঙ্কিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া আকাশের নানা অংশের ছবি তুলিয়া আরো যে কত বিচিত্র আকারের নিহারিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। যে সকল নিহারিকাকে বৃহৎ দূরবীনেও দেখা যায় নাই, ফোটোগ্রাফের কাচে তাহাদের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ধূমকেতুর উচ্ছৃঙ্খলতা চিরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহার ন্যায় জ্যোতিষ্ক যে ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিবে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও জ্যোতির্ব্বিদ্গণ তাহা মনে করিতে পারেন নাই। ১৮৯২ সালে অধ্যাপক বারনার্ড (Barnard) সর্ব্বপ্রথমে ফোটোগ্রাফের ছবি দেখিয়া একটি ধূমকেতুর আবিষ্কার করেন। দূরবীনে ইহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই, কেবল ছবি দেখিয়াই তাহার আকার প্রকার গতিবিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই ঘটনার পর শত শত ধূমকেতুর ছবি উঠানো হইয়াছে, এবং সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিলে ইহাদের পুচ্ছ ও মুণ্ডাদি কিপ্রকার বিচিত্র আকার ধারণ করিতে আরম্ভ করে, একই ধূমকেতুর নানা সময়ের ছবি তুলনা ক-

রিয়া তাহা সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। আগামী শীতের শেষে জগদ্বিখ্যাত হ্যালির ধূমকেতুর (Halley's Comet) উদয় হইবে। এটি প্রায় ৭৬ বৎসরে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ শেষ করিয়া এক একবার পৃথিবীকে দেখা দিয়া যায়। গত ১৮৩৫ সালে ইহার শেষ উদয় হইয়াছিল, সুতরাং আগামী ১৯১০ সালে ইহার প্রদক্ষিণকাল পূর্ণ হইবে। দূরবীক্ষণে এবং নগ্নচক্ষুতে দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে এটি নিশ্চয়ই ফোটোগ্রাফের ছবিতে ধরা দিবে। *

অনন্ত নক্ষত্রলোকের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের সৌরজগতের ক্ষুদ্র পরিধির ভিতর ফোটোগ্রাফি কি কার্য্য করিয়াছে, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি গ্রহতত্ত্বের গবেষণায় ফোটোগ্রাফি বৈজ্ঞানিকদিগকে বিশেষ সাহায্য করে নাই। কিন্তু উপগ্রহতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ করিলে আর সে কথা বলা চলে না। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের আবিষ্কার হইয়াছে তাহার প্রায় সকলগুলিরই সন্ধানে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ফোটোগ্রাফির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে যেমন একটিমাত্র চন্দ্র ঘুরিয়া বেড়ায়, দূরবীন্ দিয়া দেখিলে শনিগ্রহের চারিদিকে সেইপ্রকার আটটি চন্দ্রকে ঘুরিতে দেখা যায়। সুতরাং এপর্য্যন্ত শনির উপগ্রহের সংখ্যা আটটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯৮ সালে মার্কিন জ্যোতিবিদ্ পিকারিং সাহেব শনির নিকটবর্ত্তী আকাশের ছবিতে হঠাৎ একটি নূতন জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ ছবি উঠাইয়া পরীক্ষা করায়, প্রত্যেক চিত্রেই জ্যোতিষ্কটিকে স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল, এবং সেটি যেন ক্রমে স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে বলিয়াও বোধ হইয়াছিল। এইপ্রকারে জ্যোতিষ্কটি ধরা দিলে, অধ্যাপক পিকারিং ও বারনাড সাহেব তাহাকে শনিরই একটি উপগ্রহ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আজ দুই বৎসর হইল ঐ পিকারিং সাহেবই ফোটোগ্রাফ্ পরীক্ষা করিয়া শনির আর একটি উপগ্রহের সন্ধান দিয়াছেন। কেবল ফোটোগ্রাফির সাহায্যে কয়েকবৎসর পূর্ব্বেকার অষ্ট উপগ্রহযুক্ত শনি এখন দশচন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গ্রহরাজ বৃহস্পতিরও চন্দ্র সংখ্যা ফোটোগ্রাফির সাহায্যে সম্প্রতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্যালিলিয়োর সময় হইতে এপর্য্যন্ত এই গ্রহটির চন্দ্রের সংখ্যা চারিটি বলিয়াই স্থির ছিল। গত ১৮৯২ সালে ইহার পঞ্চম গ্রহের আবিষ্কার হইয়াছিল। এই ঘটনার পর প্রায় দশবৎসর কালের মধ্যে বৃহস্পতিপরিবারস্থ কোন নূতন জ্যোতিষ্কের আর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। গত ১৯০৪ এবং ১৯০৫ সালে পেরিন্ সাহেব (Perrine) বৃহস্পতিক্ষেত্রের ছবি পরীক্ষা করিতে গিয়া ক্রমে আরো দুইটি উপগ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন, এবং গতপূর্ব্ব বৎসর ইংরাজ জ্যোতিষী মেলট্ (Melotte) সাহেব গ্রীন্‌উইচ্ মানমন্দির হইতে ছবি উঠাইয়া বৃহস্পতির আর একটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে এক ফোটোগ্রাফির দ্বারাই বৃহস্পতির উপগ্রহসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এখন আটটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

চক্ষু উন্মিলিত রাখিয়া প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, কত তুচ্ছ ব্যাপারের

* আগামী বৎসর যে বৃহৎ ধূমকেতুটির উদয় হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। ইহার ইতিহাস এবং আবিষ্কারবিবরণ বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

ভিতর দিয়া যে জগদীশ্বরের অপার মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। জ্যোতিষ্কলোকের স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানা গিয়াছে ভাবিয়া যখন বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চিন্ত ছিলেন, ফোটোগ্রাফের ক্যামেরার ন্যায় একটি ক্ষুদ্র যন্ত্র মানুষের জ্ঞানবুদ্ধি যে কত অল্প তাহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছিল। জগদীশ্বরের অনন্ত শক্তির যে এক ক্ষুদ্রকণা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শৃঙ্খলিত করিয়া কঠোর নিয়মবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা যে কত বিশাল ও দূরব্যাপী ক্ষুদ্রযন্ত্রটি সঙ্গে সঙ্গে সেটিও চাক্ষুষ দেখাইয়াছিল। যে সকল মানুষ জগদীশ্বরের আনন্দময় অসীম শক্তির এই সকল অদ্ভুত লীলা অহরহ দেখিয়াও তাহাদের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না, তাহারা বাস্তবিকই অন্ধ এবং কৃপার পাত্র।

---

## অসীমের সহিত সুর বাঁধা।

### মনুষ্যজীবনের সর্ব্বোচ্চ সত্য।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এক অসীম আত্মা সকলের আদি কারণ, এবং তাঁহা হইতে সকলই আসিতেছে; বিশ্বের কেন্দ্রস্বরূপ এই মহাসত্যে আমরা এইক্ষণে উপনীত হইয়াছি। এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। এই মহাসত্য জ্ঞানপূর্ব্বক জীবন্তরূপে উপলব্ধি করা এবং অনন্ত প্রস্রবণ হইতে যে প্রবাহ বহমান হইতেছে, সেই দিব্য প্রবাহের পথে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত রাখা, ইহা কি প্রত্যেক মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য নহে? অসীম আত্মার সহিত আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ আমরা যে পরিমাণে জ্ঞানপূর্ব্বক উপলব্ধি করিতে পারি, দিব্য প্রবাহের পথে যে পরিমাণে আমরা জীবনকে উন্মুক্ত রাখিতে সক্ষম হই, ঠিক সেই পরিমাণে আমরা অসীম আত্মার গুণ ও ক্ষমতা সকল লাভ করিতে থাকি।

এরূপ হয় কেন? এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, এই উপায়ে আমরা নিজের সহিত যথার্থরূপে পরিচিত হই, জগতের মহান নিয়ম ও শক্তি সমূহের সহিত নিজের জীবনের সুর বাঁধিতে শিখি এবং জগতের সমস্ত ঋষি মুনি বুদ্ধ আদি যথার্থ মহামহিমান্বিত ব্যক্তিদিগের ন্যায়, আমরাও নিজের অন্তরে দৈববাণী শুনিতে পাইবার যোগ্য হই। আমাদের এই প্রকারে উপলব্ধ শক্তি যতই বাড়িতে থাকে, সেই অসীম মূলাধারের সহিত যোগসাধনে আমরা যতই অগ্রসর হই, আমাদের অন্তরে উচ্চতর শক্তি সকলের লীলাভূমি, কার্য্যক্ষেত্র, আবির্ভাব-পথ ততই প্রশস্ত হইতে থাকে।

আমাদের অজ্ঞানতার বাঁধে দেবশক্তির দিব্যপ্রবাহের গতি রোধ হয়, আমাদের অজ্ঞান অন্ধকারে দেব আবির্ভাব অপ্রকাশ থাকে। অথবা আমরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের অন্তরের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া দেব সহায়তা হইতে নিজেদের বঞ্চিত করি! তাহা যদি না হয়, আমাদের চেষ্টা ও যত্ন থাকিলে, অসীম আত্মার সহিত আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ এমন জীবন্তরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, আমাদের অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিয়া, দিব্য প্রবাহের পথ সুগম করিয়া দিয়া, আমরা এতাদৃশ দৈব সহায়তা, দৈবশক্তি, দৈবাদেশ লাভে সমর্থ হই যে ক্রমে আমরা দেবতুল্য মনুষ্য হইয়া উঠিতে পারি।

দেবতুল্য মনুষ্য কাহাকে বলা যায়? যে মনুষ্যের অন্তরে, ইহজীবনেই, দৈবশক্তি প্রকাশ পাইতে থাকে তিনিই দেবতুল্য মনুষ্য। অজ্ঞানবশতই অধিকাংশ

মনুষ্য নিজের ন্যায্য প্রাপ্য দেব বিভব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া দীন হীন অপরিবর্দ্ধিত জীবন যাপন করে। তাহাদের কখনই নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মায় না।

পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ মানবজাতি আজিও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই, অজ্ঞানবশত অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিতে আজিও শেখে নাই, এইহেতু তাহাদের অন্তরে দৈবশক্তির স্রোত প্রবাহিত হইতে পারে না। যখন আমরা নিজেকে কেবলমাত্র মানুষ বলিয়া মানি তখন আমরা কেবলমাত্র মানুষের ক্ষমতা লইয়া জীবন যাপন করি। যখন পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া চলিতে শিখি, তখন আমরা দৈবশক্তি লাভ করিয়া তদনুরূপ জীবন যাপন করি। আমরা যে পরিমাণে আমাদের অন্তরের দ্বার অবারিত রাখিয়া দিব্য প্রবাহের পথ সুগম করিয়া দিই, ঠিক সেই পরিমাণে আমাদের সাধারণ মনুষ্যত্ব দেবত্বের দিকে অগ্রসর হয়।

আমার এক বন্ধুর একটি পদ্ম সুশোভিত সরোবর আছে। দূরবর্ত্তী পর্ব্বত পাদস্থিত এক জলাধার হইতে জল আনয়ন করিয়া সরোবরটী জলপূর্ণ রাখা হয়; জল প্রণালীর মুখের কপাটদ্বারা জল প্রবাহের পরিমান নিরূপিত হয়। স্থানটী অলৌকিক সৌন্দর্য্যে ভরপূর। প্রস্ফুটিত পদ্মগুলি নির্ম্মল স্বচ্ছ জলবক্ষে সুখশায়িত। সরোবর তীরে গোলাপ এবং নানা জাতি বনফুল ফুটিয়া আছে। কত শত পাখীরা সরোবরে স্নান ও জলপান করিতে আসে, ঊষাকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত পাখীদের গান শোনা যায়। মধুমক্ষিকারা অবিরাম বন-ফুলে-মধু সঞ্চয় করিতেছে। সরোবরের পশ্চাদ্দিকে, দৃষ্টির সীমান্ত প্রসারিত এক কুঞ্জবন, তাহাতে নানা জাতীয় বনফল লতা ও কাঁটাগাছ।

আমার বন্ধু দেবতুল্য লোক উদারচিত্ত; তিনি তাঁর বাগানের কোনও খানে "প্রবেশ নিষেধ" বা "অনধিকার প্রবেশকারী দণ্ডিত হইবে" এরূপ কোন তাড়না বাক্য লিখিয়া রাখেন নাই। কুঞ্জবনের মধ্য দিয়া পদ্ম সরোবরে আসিবার পথের প্রবেশ দ্বারে সুস্পষ্ট অক্ষরে লেখা আছে "পদ্ম সরোবর দেখিতে সকলে আসুন।" আমার বন্ধুকে সকলে ভালবাসে। যদি বল কেন? তাহার কারণ, কেহ তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে না। তিনি সকলকে এমন ভালবাসেন যে, তাঁর জিনিস সকলে নিজের জিনিসের মত করিয়া দেখে।

এই মনোরম স্থানটিতে প্রায়ই দেখা যায়, কোথাও একদল বালক বালিকাদের হাস্য কোলাহলময় খেলা চলিতেছে; কোথাও শ্রান্ত ক্লান্ত নর নারীরা বসিয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছে। শ্রান্ত ক্লান্ত লোকেরা বিশ্রাম করিয়া চলিয়া যাইবার সময় তাহাদের মুখের ভাবে একটি পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, যেন তাহাদের সমস্ত ভার নামিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে যায় "ভগবান কর্ত্তার ভাল করুন।" অনেকে এই স্থানটিকে স্বর্গের উদ্যান বলেন। আমার বন্ধু ইহাকে তাঁর আত্মার উদ্যান বলেন, আর এইখানে নির্জ্জনে অনেকটা সময় যাপন করেন। কতবার দেখি, যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে, তিনি একাকী এইখানে বেড়াইতেছেন, কিম্বা নির্ম্মল জোৎস্নালোকে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া বনফুলের সৌরভ উপভোগ করিতেছেন। তাঁর অতি সুন্দর সরল প্রকৃতি।

তিনি বলেন, এইস্থানে জীবনের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব তাঁহার সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তাঁহার জীবনে তিনি যে সকল বড় বড় কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন সে সমস্ত কার্য্যের সাধনোপায় এইখানেই উদ্ভাবিত হইয়াছে।

এই স্থানটী হইতে যেন করুণা, হিতৈ-ষণা, আরাম ও স্বচ্ছন্দতা মিশ্রিত একটি ভাব চতুষ্পার্শ্বে বিকীর্ণ হইতেছে। কুঞ্জ-বন বেষ্টিত পুরাতন প্রস্তর-প্রাচীরের বাহিরে দাঁড়াইয়া, এই রমণীয় স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গো মেষাদি পশুরাও যেন মনুষ্যের ন্যায় মুগ্ধ হইয়া যায়। তাহা-দের ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন বাঞ্ছিত বস্তুলাভে তাহাদের মুখ হাস্য-বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

সরোবরের জল-প্রণালীর কপাট সর্ব্বদা এরূপভাবে খুলিয়া রাখা হয় যাহাতে সরো-বর পূর্ণ থাকিয়া তাহা হইতে একটি স্রোত বাহির হইতে পারে। পার্ব্বত্য ঝরণার বিমল জলপূর্ণ এই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী কত মাঠ কত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া বহিয়া যায়, গো মেষাদি কত পশুও তৃষ্ণা নিবারণ করে, কত শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করে।

একবার, কোন কার্য্যবশতঃ, আমার বন্ধুর একবৎসরকাল বিদেশে থাকিতে হইল। তখন তিনি তাঁর বাড়ি বাগান সমস্ত একজনকে ভাড়া দিলেন। যিনি ভাড়া লইলেন তিনি একজন ঘোর সংসা-রিক লোক, যাহাতে কোনও লাভ নাই এমন কাজের জন্য তাঁর একটু অবসর ছিল না। জলপ্রণালীর কপাট বন্ধ হইয়া গেল, পার্ব্বত্য স্ফটিকজল আসিয়া আর পদ্মসরোবর ছাপাইয়া স্রোত বহিত না। কুঞ্জবনের প্রবেশদ্বারে "পদ্ম সরোবর দে-খিতে সকলে আসুন" এই সাদর আহ্বান লিখন মুছিয়া ফেলা হইল। সরোবর তীরে বালক বালিকাদের আনন্দপূর্ণ খেলা—নর নারীদের সৌন্দর্য্য ও শান্তিসুখ উপভোগ বন্ধ হইল। সকল জিনিসের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল, জীবনদায়ক জলের অভাবে পদ্মবৃন্ত শিথিল হইয়া প-ড়িল, সরোবর তলে কর্দ্দমোপরি পদ্ম লুণ্ঠিত হইল। স্বচ্ছ সলিলে ক্রীড়াকারী মাছেরা মরিতে লাগিল, মাছের পূতিগন্ধে কেহ সরোবরের নিকটে যাইতে চাহেনা। সরোবর তীরে আর ফুল ফোটে না। পাখীরা আর জলপান ও স্নান করিতে আসে না। মধুমক্ষিকার গুণগুণধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় না। সরোবর হইতে প্রবা-হিত ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী শুকাইয়া গিয়াছে। গো মেষাদি পশুরা আর নির্ম্মল পার্ব্বত্যজল পান করিতে পায় না।

ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সরো-বরের অবস্থার ঈদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিবার কারণ জলপ্রণালীর কপাট বন্ধ হওয়া। পর্ব্বতস্থিত জলাধার সরোবরের জীবন স্বরূপ; সেই জলাধার হইতে জল আসিবার পথ রুদ্ধ থাকাতেই সরোবরের এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। জীবনস্বরূপ জলাধারের পথ রুদ্ধ থাকাতে কেবলমাত্র সরোবরেরই শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে এমন নহে, পার্শ্ব-বর্ত্তী ক্ষেত্র সকল ও তীরে বিচরণকারী গো মেষাদি পশু স্রোতস্বিনীর জল হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

এইস্থলে, মনুষ্য জীবনের সহিত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কি স্পষ্ট প্রতীয়মান হই-তেছে না? সকল জীবনের মূলাধার অসীম আত্মার সহিত আমাদের আত্মার যোগ, আমাদের ঐকাত্ম্য সম্বন্ধ যে পরি-মাণে উপলব্ধি করি, দিব্য প্রবাহের পথে আমাদের অন্তরের কপাট যে পরিমাণে

উন্মুক্ত রাখি, সেই পরিমাণে আমরা সর্ব্বোচ্চ সর্ব্ব-শক্তিমান ও সর্ব্ব সুন্দরের সহিত সর্ব্বত্রে মিলিত হই। আমরা যে পরিমাণে এইরূপে মিলিত হইতে পারি, সেই পরিমাণে আমাদের হৃদয় পরিপূরিত হইয়া ছাপাইয়া উঠিতে থাকে, যাহারা আমাদের সংস্পর্শে আসে তাহারাও হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত স্রোতে সিক্ত হইয়া যায়। আমার বন্ধুর হৃদয়ই তাঁহার পদ্ম সরোবর, বিশ্বের সমস্ত সত্য, শিব ও সুন্দর বস্তু তাঁহার প্রেম প্রবাহে সিক্ত হয়। জীবনের মূলাধারের সহিত আমাদের ঐক্য উপলব্ধি করিতে আমরা যতই অপারক হই, অন্তরের দ্বার রুদ্ধ রাখিয়া দিব্য প্রবাহের গতি যতই রোধ করি, তদনুসারে আমাদের মনের এমন অবস্থা ঘটে যে, আমরা কোথাও ভাল কিছু দেখিতে পাইনা, কিছুতে কোন সৌন্দর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না, নিজের শক্তি হারাইয়া ফেলি। মনের ঈদৃশ অবস্থা ঘটিলে, তখন যাহারা আমাদের সংস্পর্শে আসে, তাহারা আমাদের নিকট হইতে ভাল কিছুই পায় না, বরং তাহাদের অনিষ্ট ঘটে। ভাড়াটিয়ার হাতে পড়িয়া পদ্ম-সরোবরের সহিত তোমার ও আমার জীবনের প্রভেদ এই— সরোবরের নিজের এমন কোন ক্ষমতা নাই যে তাহার অন্তর্মুখী প্রবাহের পথের কপাট খুলিয়া রাখিয়া মূলাধারের সহিত নিজের যোগ রক্ষা করে; এ সম্বন্ধে সে নিরুপায় এবং পরমুখাপেক্ষী। তোমার ও আমার সে ক্ষমতা আছে, সে ক্ষমতা আমাদের অন্তরে নিহিত আছে, আমরা আমাদের অন্তর্মুখী দিব্যপ্রবাহের পথ, স্বেচ্ছানুসারে মুক্ত বা রুদ্ধ রাখিতে পারি।

---

## PRAYERS.

### IX.

O Lord my God, how can I describe Thy glory? I do not know where to begin and where to end. Thou dwellest in that light which no man can approach unto. But the nearer I come to the end of my days on this earth, closer and closer do I feel Thee in my soul. My hair once dark has now grown white, the lustre of my eyes has become dim, my body is daily growing more and more feeble, but Thy mercy knows no decline. At this very moment Thy mercy makes its way into my inner being, and invigorates my soul with fresh strength and life. O thou Lord of mercy, lead me to thy abode of bliss. I now yearn for nothing but Thee. Here I am keenly agitated by praise and blame, by the sorrows of life and the pangs of separation from those near and dear to me. Thou alone art my Refuge. Thou bearest the burden of the whole universe and wilt Thou not bear the burden of this little heart of mine? Thou, O Lord, art my hope and stay. When Thou art near me, misery cannot approach nor can any danger assail me, but when Thou art far away, even the point of a blade of kusa grass becomes as grievous as the heavy iron goad is to the elephant in the hands of its driver. O Lord my God, sorely afflicted by the tumult of the world, I come to Thee and seek Thy shelter; do Thou make me worthy of thy abode of bliss. Amen.

Santih. Santih.

### X.

O Lord our Saviour, save us from the torture and agony of sinfulness and all moral obliquity. May we all fully obey Thy law of righteousness and be ever

guiltless before Thee. We have known Thy love for us. An in lands blessed with righteousness and knowledge is Thy mercy manifest, so in countries dark and degraded is Thy mercy also apparent. A bit of wood that catches fire is soon reduced to ashes and then cooled: likewise the sinner's heart, burnt by the fire of agony, becomes the very dust of Thy path when the waters of Thy mercy are poured upon it. Thy love, Thy mercy are without bounds. We have nothing to fear if we put our trust in Thy goodness. To seek Thy refuge is the only remedy for all pain and anguish. O Lord Supreme, be Thou our help.

Santih. Santih.

---

## নানা কথা।

বিগত গুডফ্রাইডের অবকাশ উপলক্ষে কলিকাতাস্থ টাউনহলে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের বিশেষ উদ্‌যোগে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বির মত আলোচনা করিবার জন্য (Convention of Religion) ধর্ম্মসঙ্ঘের তিনদিবস ব্যাপী অধিবেশন হইয়াছিল। ১৮৯৩ অব্দে আমেরিকার সিকাগো নামক স্থানে যে Parliament of Religion বসিয়াছিল, ক্ষুদ্রাকারে ইহা তাহারই অনুরূপ। হিন্দু মুসলমান জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান ও য়িহুদি প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দূরদূরান্তর হইতে আসিয়া সৎভাবে বিশেষ আগ্রহের সহিত এই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। দারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করেন। সভাস্থল শ্রোতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিবর্গে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। পরস্পরের প্রতি যেরূপ উদার ভ্রাতৃভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে এই ধর্ম্মসঙ্ঘ স্থায়ীত্ব লাভ করিলে দেশের যে প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি হইয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

উদ্বোধন সঙ্গীত।

জগতের পতি, অতিথি তোমার দ্বারে।
অগতির গতি, পদে নতি বারে বারে॥
স্বরূপেতে তুমি রূপের অতীত,
পুরুষ অনাদি উপাধি রহিত,
সাধকের সাধে কতই কল্পিত,
যুগে যুগে রূপ নাম যে জল্পিত,
সর্ব্বনাম তাঁর অবস্থিত সর্ব্বাধারে॥

২

পরব্রহ্মে তুমি পরম ঈশ্বর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু জিষ্ণু বহ্নি মহেশ্বর,
কেহ নহে অন্য তুমিই চৈতন্য,
গণেশ রমেশ রাম নামে গণ্য,
একে ভিন্ন ভিন্ন নানা শূন্যে বা সাকারে॥

৩

জগদ্ধাত্রী মাতৃ দুর্গা কালী মায়া,
অন্নদা জ্ঞানদা লক্ষ্মী পদ্মালয়া,
কালা বনমালী রাধা হৃদি রথী,
পাঞ্চালীর সখা পার্থের সারথি,
বিশ্বরূপ ধারী মুকুন্দ মুরারি হরে॥

৪

শুদ্ধবোধি বুদ্ধ, পিদ্ধন অজিন
সিতাম্বর দিগম্বর তুমি দেব জিন,
তুমি খোদাতাল্লা আল্লা মোক্ষদাতা,
ঈশা মুসা যীশু ত্রাতা ভাবে ভ্রাতা,
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র গুরুগ্রন্থ একাধারে॥

৫

রম্য দৃশ্য বিশ্ব সমাজ আমার,
মস্‌জিদ্‌, মন্দির, গুরুদরবার,
অর্চ্চনার চর্চ্চ, সিনাগগ্‌, মঠ,
সর্ব্বতীর্থ যোগ জাহ্নবীর তট,
পরিচয় নয়, পর ভেবনায়ে কারে॥

৬

যে পথে যে যাই, গতি এক ঠাঁই,
তোমা বিনা আর দ্বিতীয় তো নাই,
ডাকি যাই বলে ডেকে নাও কোলে,
ছলে ভোলা মন, ধাঁধা খেয়ে দোলে,
মাতা পিতা পতি গুরু প্রভু সখা,
কর্ত্তা হর্ত্তা পাতা সবই তুমি একা,
আমা হ'তে তুমি গো আমার এ সংসারে;
সম্প্রদায় ভেদ করিলে উচ্ছেদ রামকৃষ্ণ অবতারে।

শ্রদ্ধেয় সারদা বাবু তাঁহার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় বলিলেন যে সমগ্র জগতের অধিকাংশ অধিবাসী যে যে ধর্ম্মের অন্তর্ভূত সেই সকল ধর্ম্মের সমুত্থান ভারতেই ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষ ঐ সকলেরই আদি-জননী। ঈশ্বরোপাসনা ও প্রেম (worship and love) সকল ধর্ম্মেরই মূলমন্ত্র। বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে আকারগত বৈষম্য থাকিলেও সকলের মূল সেই একেরই দিকে। কিন্তু আমরা অন্যান্য ধর্ম্মকে উদারভাবে নিরীক্ষণ করি

না ; বাহ্য বৈষম্য দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হই। অনেক সময়ে আমরা নিজ নিজ ধর্ম্মকেও সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এই সকল অভাব দূর করিবার জন্য এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘের সূচনা। অবতার ও সাধুপুরুষের আবির্ভাব সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে। দুর্নীতি দূরীকরণ এবং জনসমাজের উন্নতিবিধান তাঁহাদের সকলেরই একমাত্র লক্ষ্য। আমরা ভ্রাতৃভাবে এখানে মিলিত হইয়াছি, আমাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিয়া যাউক। জগতের কল্যাণসাধনই আমাদের উদ্দেশ্য হউক। আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে যেন পরস্পর মিলিত হইতে পারি।

দারবঙ্গের অধিপতি সভাপতির আসন পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন, আমরা পরস্পরের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মমত আদান প্রদান করিবার জন্য মিলিয়াছি। বৈষম্যের আবরণ ভেদ করিলে আমরা পরস্পরের যে কত নিকটে তাহা অনুভব করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। এরূপ সম্মিলন ভারতে অশ্রুতপূর্ব্ব নহে। অতীব পুরাকালে (ব্রাহ্মণ্য যুগে) ব্রাহ্মণেরা ইতরজাতিকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার প্রদান না করিলেও খৃষ্টপূর্ব্ব-ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুত্থান সময়ে হিন্দু-সমাজের ভিতরে পরিবর্ত্তনের ভাব আসিয়া পড়িয়াছিল। রাজগির ( বিহার ) নামক স্থানে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে এইরূপ সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপরে বৈশালিতে ( মজঃফরপুর ) খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪৩ অব্দে অনুরূপ সভা সংগঠিত হয়। তৃতীয় সভা পাটলিপুত্র নগরে খৃঃ পূঃ ২২৫ অব্দে রাজা অশোকের নিয়ন্তৃত্বে এবং চতুর্থ সভা জলন্ধরে ( পঞ্জাব ) ৭৮ অব্দে রাজা কণিষ্কের সময় আহুত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে কান্যকুব্জের রাজা হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রতি পঞ্চমবর্ষে ধর্ম্মমত আলোচনা করিবার জন্য অনুরূপ সভার অধিবেশন হইত। জৈনগণও মধ্যে মধ্যে এইরূপ সভা আহ্বান করিতেন। দ্বিতীয় শতাব্দিতে মথুরাতে তাঁহাদের কর্ত্তৃক যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের সংস্কারক কুমরিল্ল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য সভা অহ্বান করিয়া নিজ নিজ মত লইয়া অপরের সঙ্গে বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। বাদশাহ আকবরও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিকে ডাকাইয়া সভা বসাইতেন।

আমরা এই ধর্ম্ম-সঙ্ঘে আজ মিলিত হইয়াছি। মনুষ্যের সহিত মনুষ্যকে যাহা ধরিয়া থাকে এবং ঈশ্বরের সহিত যাহা দ্বারা মনুষ্যের যোগ রক্ষিত হয়, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই অর্থের যাহাতে সার্থকতা হয়, অদ্যকার আলোচনা সেই ভাবে করিতে হইবে। যদিও আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত, ঈশ্বর আমাদের সকলেরই নেতা। আমাদিগকে সর্ব্ববিধ বিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। মানব সমাজ বিভিন্ন পথ দিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেও এক সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের দিকে সকলেরই গতি। সেই গন্তব্যস্থানে পৌছিতে বিলম্ব থাকিতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের ভাব "ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বোধ।" এই সত্যটি আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, জীবনে তাহা সাধন করিতে হইবে।

আমরা বিভিন্ন মন্ত্রে বিভিন্ন দেবতার বাহ্য পূজা পিতৃপিতামহগত প্রণালীতে সম্পন্ন করিয়া থাকি। তাহার মধ্যে প্রণালী ও আকারগত বৈষম্য থাকিলেও আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে সকলে প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করি। সাধন প্রণালী লইয়াই জগতে মতভেদ চলিতেছে কিন্তু অন্তরের ভিতরে সেই একই পবিত্রতা বিরাজমান।

আচার অনুষ্ঠান বা কোন বাহ্য-অবলম্বন (Symbols) যাহার সাহায্যে উপাসনা সাধিত হয়, প্রথম আবিষ্কারের সময়ে তাহা অর্থপূর্ণ ও অধ্যাত্ম-জীবনের সহায় ছিল, কিন্তু কালক্রমে উহারা অর্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের সমস্ত অন্তঃসার চলিয়া গিয়াছে। সকল দেশের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই এই ভাব দেখা যায়। আমরা পরস্পরে ধর্ম্মের বাহ্য পরিচ্ছদ লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত ; কিন্তু ধর্ম্মমাত্রেরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখিব আমরা সকলে এক। প্রীতি পবিত্রতা, সত্য, নিষ্ঠা, সততা, ধীরতা, সেবা, ক্ষমা ভ্রাতৃভাব, আশা, আনন্দ, শান্তি এই সকল লইয়া বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে কোন দ্বন্দ্ব নাই। ফলত এই সকলের উৎকর্ষই জীবনকে পবিত্রতম করিয়া তোলে। স্থূলতঃ বলিতে গেলে জেরোয়াষ্টর প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দেখা যায় যে এক ঈশ্বর যাহা কিছু কল্যাণের সৃষ্টি করিতেছেন, বিপরীত ধর্ম্মী অন্য দেবতা কেবলই অনিষ্ট ও অকল্যাণ প্রসব করিতেছেন। যাঁহারা সাধুজীবন যাপন করিবেন তাঁহারা মৃত্যুর অন্তে চিন্তা বাক্যে ও কার্য্যে শাশ্বত সুখ উপভোগ করিবেন। যাহারা পাপে নিরত রহিল তাহারা যন্ত্রণাময় নরকে স্থান পাইবে! পাপ পুণ্যের ভাব এই ধর্ম্মে সুন্দরভাবে চিত্রিত।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে গৌতম বলিয়াছিলেন সাধু সেবা কর, অসতের সেবা পরিহার কর, সম্মানার্হকে সমাদর কর, সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, প্রকৃত শিক্ষা লাভ কর, সদালাপী হও, পিতামাতার সেবা কর, স্ত্রী পুত্রকে পোষণ কর, জীবিকার জন্য সাধু পথ অবলম্বন কর, দানশীল হও, সাধুজীবন অতিবাহিত কর, আত্মীয়ের অভাব বিমোচন কর, পাপ হইতে বিরত হও,

মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ কর, সৎকর্ম্মসাধনে অক্লিষ্ট হও, শ্রদ্ধাবান ও বিনয়ী হও, পরিতুষ্ট থাক, কৃতজ্ঞতা অভ্যাস কর, ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ কর, সঙ্ঘের সভ্যগণের সহিত মিলিত হও, সৎপ্রসঙ্গ কর, মিতাচারী হও, সতী ও সংযমী হও, নির্ব্বাণলাভে আশান্বিত থাক, পৃথিবীর ক্ষতি লাভে অটল থাক। তাহাহইলে সমস্ত জীবন নিরাপদ থাকিতে পারিবে ও প্রকৃত শান্তিসুখ উপভোগ করিতে সক্ষম হইবে। প্রকৃত পক্ষে আত্মবিজয় ও মৈত্রী বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাণ।

মুসলমান ধর্ম্ম বলেন ঈশ্বরের বিচারে সন্তুষ্ট থাক। মহম্মদ পাঁচটি কর্ত্তব্যের আদেশ দিয়াগিয়াছেন (১) বিশ্বাস কর ঈশ্বর এক (২) পাঁচবার প্রার্থনা কর, (৩) দান কর (৪) রমজান মাসে উপবাস কর (৫) জীবনে একবার মক্কাতীর্থে গমন করিও। শেষ বিচার দিনের সম্বন্ধে বিশ্বাস হারাইও না। সকলকে শিক্ষা দাও যে জগতে আমরা ক্রীড়া কৌতুক করিতে আসি নাই, দায়িত্বপূর্ণ জীবন লইয়া আসিয়াছি। এই ধর্ম্মে আছে, মুসলমান মাত্রেই পরস্পরের ভ্রাতা। যাঁহারা ধনশালী তাঁহারা দরিদ্রের রক্ষক, এমন কি দরিদ্রেরা ধনীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিবার অধিকারী। ধনী দরিদ্রের ভিতরে কোন প্রভেদ নাই; এমন কি ধনী তাঁহার আয়ের এক চত্বারিংশ দান করিতে বাধ্য।

ঈশা প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হয়েন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। তাঁহার উপদেশ এই, ঈশ্বর যে কেবল আমাদের স্রষ্টা পাতা তাহা নহে, তিনি আমাদের পিতা। তিনি তাঁহার প্রতি সন্তানকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্য প্রয়াসী। তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত লিখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার শিক্ষা আপনার জীবনের আদর্শে শিষ্যগণের ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঈশার মত জগতে প্রচার করিলেন। ঈশা তিন বৎসর ব্যাপী প্রচারে ব্যাপৃত থাকিয়া ক্রুশে প্রাণ দিলেন। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও মনুষ্যে ভ্রাতৃভাব তাঁহার ধর্ম্মের চরম শিক্ষা। খৃষ্ট ধর্ম্মে পাপের ক্ষমা ও অনন্ত-জীবনের অপ্রবাণী সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্ম্ম, আমি যাহার অন্তর্গত, সুদূর অতীতের সঙ্গে তাহার যোগ। ভারতের প্রায় ২৭ কোটী লোক এই ধর্ম্মের অন্তর্গত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থানুসারে বিভিন্ন অবতার ধরিয়া এই হিন্দুধর্ম্মের ভিতরে নানা শাখা প্রশাখা। নিরক্ষরের জন্য ধর্ম্মের এক প্রকার বিধান, উন্নত লোকের জন্য অন্যরূপ। ঈশ্বর সর্ব্বত্রই বিরাজমান, প্রকৃতির উপাসনায়ও তাঁহার উপাসনা হয়, তিনি অণু পরমাণুতে বিদ্যমান। মনু বলিয়াছেন, ধৃতি ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ। দেহের বন্ধন হইতে আত্মাকে বিমুক্ত করিয়া ঈশ্বর যাঁহা হইতে এই আত্মার উৎপত্তি তাঁহাতেই লইয়া যাইতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মে সংযম আত্মত্যাগের ও নীতির সুন্দর বিধান রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম, বিশ্বজনীন ও সর্ব্বজনীন তাহা ইহাতে পরিকীর্ত্তিত। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতে হিন্দুদিগের মধ্যে ৭০ টি শাখা; কিন্তু ঐ শাখাগুলি আবার নানা প্রশাখায় বিভিন্ন।

পরিশেষে যে সকল প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত, তাঁহাদিগকে আমি সাদরে গ্রহণ করি এবং আশা করি পরস্পরের ধর্ম্মভাব আলোচনা শ্রবণে আনন্দ লাভ করিয়া এখান হইতে তাঁহারা প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এই সভা ভবিষ্যতে যে কল্যাণপ্রদ হইবে তৎসম্বন্ধে আশান্বিত হইতেছি। সেই ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম তাহার অনুচরগণের চরিত্রকে বিশোধিত করিয়া প্রকৃত ধার্ম্মিক করিয়া তুলিতে পারে। ঈশ্বর প্রীতি ও মনুষ্যে ভালবাসা, ইহাই একদিন জগতের ভাবী ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। এই ধর্ম্মসঙ্ঘ সেই উদ্দেশ্য সাধন করুন ইহাই প্রার্থনা।

সভাপতি এই বলিয়া আসন পরিগ্রহ করিলে বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধি নিজ নিজ ধর্ম্মমত লিখিয়া পাঠ করেন। এইরূপে তিন দিবস অতিবাহিত হয়। বক্তাগণের মধ্যে কতকগুলির নির্ব্বাচন দোষশূন্য না হইলেও এই প্রথম বৎসরে যাহা হইয়াছে তাহা আশাতীত বলিতে হইবে। উপস্থিত শ্রোতাগণের মধ্যে বহুঅংশের সহানুভূতি এই ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম। বক্তাগণের বিবৃত বিষয় শীঘ্রই পুস্তকাকারে বাহির হইবে। ভবিষ্যতে আমাদের তাহা আলোচনা করিবার ও উহার সারাংশ দিবার ইচ্ছা রহিল। প্রতিদিন সঙ্গীত করিয়া কার্য্যারম্ভ হয়। শেষ দিনের সঙ্গীত বিশেষ উদারতা ব্যঞ্জক বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ফিরে এসেছি, আমি এসেছি হে ফিরে এসেছি
কর্ম্মক্ষেত্র আর্য্যভূমে হোম সৌরভে এসেছি
যুগযুগান্ত আঁধারভেদি ভারতে পুনঃ এসেছি।
দিব্য-ধূলি জন্মভূমি ভারতে ফিরে এসেছি
আমি তোমা মা নাহ, তার মা নহি আমি নিখিল জগন্মী
ভুবনভূষণ আলোক রূপে জগত জননী এসেছি
পুণ্যপূতে সিন্ধু সলিলে অর্জ্জুন-গঙ্গা-কলকল্লোলে
সবে প্রেম-সূতে গেঁথে একই সাথে আবার দেখা দিয়েছি।

---

## নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নববর্ষের দান প্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের
বাটী হইতে পারিবারিক দান ... ৮৲
শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী ... ১০৲
" সৌদামিনী দেবী ... ২৲
" সুকেশী দেবী ... ১৲
" চারুবালা দেবী ... ১৲
" ইরাবতী দেবী ... ১৲
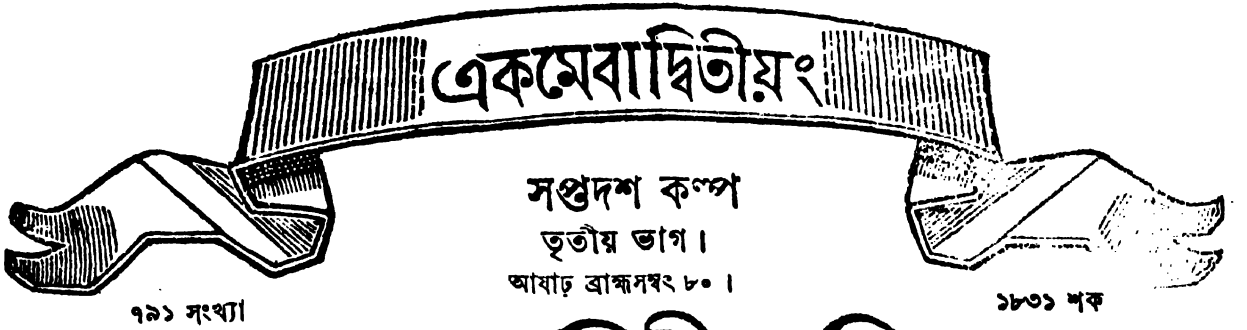
আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ... ৫৲

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

### মঙ্গল।

#### চতুর্থ উপদেশ।

ধর্ম্মনীতির প্রকৃত মূলতত্ত্ব।

সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী, দার্শনিক পদ্ধতি সমূহের শুধু ভ্রম দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, পরন্তু সেই ভ্রমসমূহের মধ্যে যে সত্য মিশ্রিত আছে তাহা তিনি দেখিতে পান, এবং সেই সত্যগুলিকে সেই সব ভ্রম হইতে বিনির্ম্মুক্ত করেন। বিভিন্ন পদ্ধতি সমূহের বিক্ষিপ্ত সত্যগুলি একত্র মিলিত হইয়া একটি সমগ্র সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে, এবং সেই সত্যকে, প্রত্যেক পদ্ধতিই একটা বিশেষ দিক দিয়া প্রদর্শন করে। আমরা যে সকল নৈতিক পদ্ধতি খণ্ডন করিলাম, তাহা পস্পরর বিরোধী হইলেও, তাহাদের মধ্যে সমগ্র ধর্ম্মনীতির মূল-উপাদানগুলি নিহিত আছে। সমগ্র নৈতিক ব্যাপারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, শুধু ঐসকল উপাদানকে একত্র করা আবশ্যক। ফলত সমস্ত দর্শনের ইতিহাস—মানসিক ব্যাপার-সমূহের বিশ্লেষণ কিংবা বিশ্লেষণের চেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কোন পদ্ধতি-বিশেষের মতে অন্ধ না হইয়া, সমগ্র মানব-আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের মনে যে সকল ধারণা ও ভাব উৎপন্ন হয় তাহাই আমরা যথাযথরূপে একত্র সংগ্রহ করিব।

কতকগুলি কার্য্য আমাদের প্রীতি-কর এবং কতকগুলি কার্য্য অপ্রীতি-কর; কতকগুলি উপকারী, ও কতকগুলি হানিজনক;—এক কথায়, সেই সকল কার্য্যের সহিত আমাদের স্বার্থের যোগ। যে সকল কার্য্য আমাদের হিতজনক সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরা আনন্দিত হই, এবং যাহাতে আমাদের হানি হয়—সেই-রূপ কার্য্য আমরা পরিবর্জ্জন করি। যে সকল কার্য্যে আমাদের স্বার্থ সাধিত হয় আমরা নিয়ত সেই সকল কার্য্যেরই অনু-সরণ করি।

এই ব্যাপারটি সর্ব্ববাদিসম্মত;—আরও একটি ব্যাপার আছে যাহা উহারই মত অবিসম্বাদিত।

এমন কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহার সহিত আমার নিজের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং তাহাতে আমাদের কি স্বার্থ আছে

তাহা আমরা বিচার কলিতে সমর্থ নহি, অথচ আমরা সেই সকল কার্য্যকে ভাল কিংবা মন্দ বলিয়া থাকি।

মনে কর, তোমার সমক্ষে একজন সশস্ত্র বলবান্ ব্যক্তি, একজন দুর্ব্বল নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রতি মারপীট করিল, এবং তাহার গাঁটের কড়ি হরণ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল। এই কার্য্যে তোমার নিজের গায়ে একটি আঁচড়ও লাগিল না, অথচ তোমার মন ঘৃণা ও রোষে পূর্ণ হইল; সেই হত্যাকারীকে ধৃত করিয়া পুলিসে সোপর্দ করিবার জন্য, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে। যাহাতে সে কোন না কোন রূপে দণ্ডিত হয় তাহার জন্য তোমার আন্তরিক ইচ্ছা হইল—এবং তুমি মনে করিলে—এইরূপ দণ্ডবিধান করা ন্যায়-সঙ্গত কার্য্য; যতক্ষণ না তাহার উপযুক্ত দণ্ড হইল ততক্ষণ তোমার রোষ প্রশমিত হইল না। আবার আমি বলি, এস্থলে তোমার নিজের কোন প্রত্যাশাও ছিল না, ভয়ও ছিল না। তুমি যদি কোন দুর্গম দুর্গের মধ্যে থাকিয়া, তাহার উচ্চ চূড়া হইতে এই হত্যাকাণ্ড দেখিতে, তাহা-হইলেও তোমার মনে এইরূপ ভাবই উৎপন্ন হইত।

একটা হত্যাকাণ্ড দেখিয়া তোমার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহারই একটা মোটামুটি ছবি উপরে প্রদর্শিত হইল। এই ছবির মধ্যে যে সকল বিভিন্ন রেখার সমাবেশ আছে, তৎসম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ ও একটু বিচার করিয়া দেখিলেই একটা দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়া কোন্ ভাবটি তোমার মনে প্রথম উদয় হইল?—অবশ্য, ঘৃণামিশ্রিত রোষের ভাব—একটা স্বাভাবিক আতঙ্ক তোমার মনে সঞ্চারিত হইল। অতএব দেখা যাইতেছে, এমন একটা ধিক্কারের ভাব স্বতই আমাদের মনে জন্মিতে পারে—যাহার সহিত স্বার্থের কোন সংস্রব নাই; মনের এইরূপ একটা শক্তি আছে—মনের এরূপ কতকগুলি ভাব আছে, যা-হার লক্ষ্য আমি নিজে নহি! আমাদের মনে এমন একটা বিদ্বেষের ভাব, এমন একটা বৈমুখ্যের ভাব, এমন একটা আতঙ্কের ভাব আছে, যাহা আমাদের নিজের অনিষ্টাশঙ্কা হইতে উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত এমন সকল কার্য্য হইতে উৎপন্ন হয় যাহা আমাদের হইতে বহুদূরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং যাহার আঘাত আমাকে একটুও স্পর্শ করিতে পারে না;—সেই সকল কার্য্যকে যে আমরা ঘৃণা করি, তাহার একমাত্র হেতু, আমরা সেই সমস্ত কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি।

হাঁ আমরা সেই সকল কার্য্যকে মন্দ বলিয়া বিবেচনা করি। সেই সব কার্য্য আমাদের মনে যে সকল ভাব উৎ-পাদন করে, সেই সকল ভাবের মধ্যে একটা বিচারক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে। যে সময়ে কোন কার্য্য দেখিয়া তোমার মনে ঘৃণা ও রোষের উদয় হয়, তখন যদি কেহ বলে, তোমার এই নিঃস্বার্থ রোষ তোমার একটা বিশেষ দৈহিক গঠনের ফল, এবং ঐ কার্য্য আসলে ভালও নহে মন্দও নহে—তখন এই ব্যাখ্যার প্রতি তুমি নিশ্চয়ই বিমুখ হও, তুমি তাহাতে সায় দিতে পার না; তুমি বলিয়া ওঠো, ঐ কার্য্যটি স্বতই মন্দ; তুমি তখন শুধু তোমার মনের ভাবমাত্র প্রকাশ কর না, তোমার বিচারে যাহা মনে হয় তাহাই তুমি ব্যক্ত করিয়া থাক। তাহার পর দিন তোমার মনের উত্তেজনা উপশমিত হই-

লেও ঐ কার্য্য তোমার বিচারে মন্দ বলিয়াই উপলব্ধি হয়। ঐ কাজটা যে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই মন্দ, তাহা ছয় মাস কাল পরেও তোমার মনে হয়; তাহার কারণ,—তোমার বিবেচনায়, কাজটা স্বতই মন্দ। শুধু তাহা নহে, তোমার বিবেচনায় ঐরূপ কাজ না করাই উচিত।

কাজটা আসলে মন্দ এবং উহা না করাই উচিত—এই যে যুগল বিচারক্রিয়া—ইহাই তোমার ঘৃণা ও রোষের মূলে অবস্থিত। যদি কাজটা আসলে খারাপ না হয়, এবং যদি ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি ঐ কাজটা না করিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে, তুমি ঐ কার্য্যের দরুণ যে ধিক্কার ও রোষ অনুভব কর তাহা তোমার শুধু একটা দৈহিক চেষ্টামাত্র—এইরূপ মনে করা যাইতে পারে;—উহা এমন একটা ব্যাপার যাহাতে কোন নৈতিক ভাবের সংস্রব নাই; একটা প্রাকৃতিক ভীষণ কাণ্ড ঘটিলে তোমার মনে যেরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ইহা কতকটা সেইরূপ ধরণের ভাব। কিন্তু ন্যায্যভাবে তুমি ঐ কার্য্যকারীর কার্য্যকে ভালমন্দ-নিরপেক্ষ বলিয়া মনে করিতে পার না। ঐ কার্য্যকারীর প্রতি যে ব্যক্তি ঘৃণা ও রোষ অনুভব করে, তাহার মনে এই যুগল বিশ্বাস দুটিও থাকে যে,—ঐ কার্য্য আসলে খারাপ, এবং ঐ কার্য্য করা উচিত নহে।

কার্য্যটা আসলে খারাপ এবং উহা করা উচিত নহে—এই কথাটি বলিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝায় যে, ঐ কার্য্যকারী ব্যক্তি জানে যে, সে খারাপ কাজ করিতেছে,—সে ধর্ম্ম-নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছে; তাহা না হইলে, তাহার এই কাজটা পশুবৎ অন্ধশক্তির কাজ হইত, নীতিশক্তি ও বুদ্ধিশক্তির কাজ হইত না; তাহা হইলে, মাথায় পাথর পড়িলে, যেমন পাথরের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হয় না, সেই কার্য্যকারীর প্রতিও সেইরূপ আমাদের ঘৃণা ও ক্রোধ উৎপন্ন হইত না।

তাছাড়া, যে ব্যক্তি এই ঘৃণা ও ক্রোধের পাত্র তাহার প্রকৃতিগত একটি বিশেষ লক্ষণ আছে; অর্থাৎ সে স্বাধীন পুরুষ; সে যে কাজ করিয়াছে সে করিতেও পারিত, না করিতেও পারিত। ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে,—কোন কার্য্যের জন্য দায়ী হইতে হইলে, সেই কার্য্যকর্ত্তার স্বাধীনতা থাকা চাই।

তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী ধৃত হয় এবং ধৃত হইয়া বিচারার্থ রাজপুরুষদিগের নিকট সমর্পিত হয়, উপযুক্ত রূপে দণ্ডিত হয়; এবং সে দণ্ডিত হইলেই তুমি সন্তুষ্ট হও। এ কি তোমার কল্পনার ও হৃদয়ের একটা খামখেয়ালী চেষ্টা মাত্র?—না, তাহা নহে। তুমি শান্তই থাক, কিংবা ঘৃণা ও রোষে উত্তেজিতই হও, সেই হত্যাকাণ্ডের সময়েই হউক কিংবা বহুকাল পরেই হউক, প্রতিশোধ লইবার কোন ব্যক্তিগত ভাব তোমার মনে থাকিতে পারে না, কেন না তোমার উহাতে লেশমাত্র স্বার্থ নাই,—তথাপি তুমি চাও যে সেই হত্যাকারী দণ্ডিত হয়। দণ্ডিত না হইয়া প্রত্যুত যদি সেই অপরাধী ব্যক্তি তাহার সেই পাপকার্য্যের দরুণ কোন প্রকার সৌভাগ্য লাভ করে, তুমি তখন আবার এই কথা নিশ্চয় বল যে, সৌভাগ্য লাভ করা দূরে থাক্, তাহার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তার কষ্ট পাওয়া উচিত; তুমি তাহার সৌভাগ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর, তুমি তখন কোন এক উচ্চতর ন্যায়বিচারের দোহাই দেও। এই যে তোমার বিচার-

ক্রিয়া, তত্ত্বজ্ঞানীরা ইহাকে পাপ-পুণ্য-ঘটিত বিচার বলিয়া থাকেন। ইহাতে এইরূপ বুঝায় যে, ধর্ম্মের পুরস্কার সুখ ও অধর্ম্মের দণ্ড দুঃখ—এইরূপ একটি দুর্লঙ্ঘ্য উচ্চতর নিয়ম আছে বলিয়া মানুষ বিশ্বাস করে। এই নিয়মের ধারণাটি মানুষের মন হইতে উঠাইয়া লইলে, পাপপুণ্য বিচারের কোন ভিত্তি থাকে না; এই বিচারক্রিয়া অপসারিত করিলে, সৌভাগ্যবান অপরাধীর প্রতি ঘৃণা ও রোষের ভাব দুর্ব্বোধ্য—এমন কি অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন কাহাকে কোন দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখিলে, সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহাকে দণ্ডিত করা যে আবশ্যক—এ কথা তোমার মনেও আসে না।

অতএব, নৈতিক ব্যাপারের সমুদায় অংশ গুলি এইরূপভাবে অবস্থিত:—তৎসংক্রান্ত সমস্ত তথ্যগুলিই সুনিশ্চিত; উহার একটি তথ্যকে যদি টলাইয়া দেও,—সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটাই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িবে। অতি সামান্য পর্য্যবেক্ষণেই এই সকল তথ্য সপ্রমাণ হয় এবং উহাদের বন্ধনসূত্র সহজেই আবিষ্কৃত হইতে পারে—তজ্জন্য সূক্ষ্মতম যুক্তির প্রয়োজন হয় না। হয়, হৃদয়ের ভাবগুলিকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে হয়, নয় স্বীকার করিতে হয়,—ভাবগুলির মধ্যে একটা বিচার-ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন আছে; আবার ঐ বিচার-ক্রিয়ার মধ্যেই ভালমন্দের পার্থক্য জ্ঞান নিহিত আছে; এই পার্থক্য জ্ঞান হইতেই একটা অবশ্যকর্ত্তব্যতার ভাব আসিয়া পড়ে, এবং এই অবশ্যকর্ত্তব্যতা এরূপ কার্য্যকর্ত্তার প্রতিই প্রযুক্ত হয় যে বুদ্ধিমান ও স্বাধীন; পরিশেষে পাপপুণ্যের মধ্যে যে পার্থক্য আছে—যাহা ভালমন্দের পার্থক্যেরই অনুরূপ—সেই পার্থক্যের মধ্যে এই মূলতত্ত্বটিকেও স্বীকার করিতে হয় যে, ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সামঞ্জস্য আছে। (ক্রমশঃ)

---

## নূতন গ্রহের সন্ধান।

গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণে বড় বড় দূরবীক্ষণযন্ত্রের সহিত ফোটোগ্রাফের ছবি উঠাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, গত ষাট বৎসরের মধ্যে অনেক যুগলনক্ষত্র নিহারিকাপুঞ্জ এবং নূতন তারকার আবিষ্কার হইয়াছে। তা' ছাড়া সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং ধূমকেতুর গতিবিধি সম্বন্ধেও অনেক নব নব তথ্য ঐ উপায়ে সংগ্রহ করা গিয়াছে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র পৃথিবীটি যে সৌরজগতের অধিবাসী, এই সুদীর্ঘকালে তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য নূতন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় নাই। মঙ্গল (Mars) এবং পৃথিবীর কক্ষার মধ্যে যে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র গ্রহ (Asteroids) পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদেরি দুই চারিটির আবিষ্কারের কথা আমরা মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাইয়াছি বটে, কিন্তু এগুলিকে কখনই বৃহৎ আবিষ্কার বলা যায় না। সম্প্রতি পিকারিং (Pickering) ও পেরিন্ (Perrine) সাহেব ফোটোগ্রাফির সাহায্যে আকাশের চিত্র অঙ্কন করিয়া শনি ও বৃহস্পতিগ্রহের যে কয়েকটি নূতন উপগ্রহের সন্ধান পাইয়াছেন, কেবল তাহাকেই আধুনিক যুগের একমাত্র উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার বলা যাইতে পারে।

আকাশের যে অংশটি অধিকার করিয়া সূর্য্যের পরিবার বাস করিতেছে, তাহা অনন্ত মহাকাশের তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও মানবের জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকট তাহা অতি বৃহৎ। এই ক্ষুদ্র সৌরজগতের গূঢ় রহস্যগুলিকে মানুষ যে কোন কালে নিঃশেষে

আবিষ্কার করিতে পারিবে তাহার আশা করা যায় না। বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া নানা দেশের জ্যোতিষিগণ নানা প্রকারে সৌরজগতের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আজও ইহার বড় বড় জ্যোতিষ্কগুলিকেও নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেকার জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বুধ শুক্র পৃথিবী মঙ্গল বৃহস্পতি এবং শনি এই ছয়টি মাত্র গ্রহের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন। এগুলি ছাড়া আরো যে বৃহৎ গ্রহ সৌরজগতে থাকিতে পারে, একথা সেই সময়ে তাঁহাদের মনেই আসে নাই। হার্শেল এবং লেভেরিয়ার সাহেব কর্তৃক ইউরানস্ (Uranus) ও নেপ্‌চুন্ (Neptune) গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের পর প্রাচীন জ্যোতিবের্ত্তাদিগের জ্যোতিষিক জ্ঞান যে কত সংকীর্ণ ছিল, তাহা সকলে প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন।

গত ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপ্‌চুন্ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত সৌরজগতে আর কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শত শত বৃহৎ দূরবীনের অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অন্তরালে কোন বৃহৎ গ্রহ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না ভাবিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণও একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। ইউরানস্ গ্রহকে তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে ঈষৎ বিচলিত হইতে দেখিয়া, ইংরাজ জ্যোতিষী আডামস্ (Adams) ও ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভেরিয়ার কেবল গণিতের সাহায্যে যেমন নেপ্‌চুনের আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এখন আবার ঠিক্ সেইপ্রকার গণনায় আর কয়েকটি বৃহৎ গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই নবগ্রহগুলির আবিষ্কার বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমাদের পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির মধ্যে নেপ্‌চুনই সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী। জ্যোতির্বিদ্‌গণ ইহার কক্ষার বাহিরে সৌরপরিবারভুক্ত কোন জ্যোতিষ্কেরই সন্ধান পান নাই। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল অধ্যাপক টড্ (Prof. Todd) ইউরেনাস্ গ্রহের গতিবিধি লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নেপ্‌চুনের আকর্ষণে ইহার ভ্রমণপথের যে বিচলন হয়, তাহা হিসাবের মধ্যে আনিয়াও গণনালব্ধ পথের সহিত উহার প্রত্যক্ষদৃষ্টপথের মোটেই একতা দেখা যায় নাই। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নেপ্‌চুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয় একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া টড্ সাহেবের মনে হইয়াছিল। আমেরিকার ওয়াসিংটন্ মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা তিনি কিছু দিন ধরিয়া নবগ্রহটির অন্বেষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রহের কোন চিহ্নই দেখা যায় নাই, এবং গণনায় ভুল আছে ভাবিয়া এই অনুসন্ধানে অপর কোন জ্যোতিষী যোগদান করেন নাই। কাজেই টড্ সাহেবের গণনা বৃত্তান্তটি আধুনিক জ্যোতিষিক ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

সম্প্রতি অধ্যাপক ফর্বিস্ (G. Forbes) সাহেব টড্ সাহেবের সেই পুরাতন হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ অভ্রান্ত দেখিতে পাইয়াছেন, এবং নূতন গ্রহের খোঁজে নেপ্‌চুনের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বৈজ্ঞানিকদিগকে আহ্বান করিতেছেন। কেবল সেই প্রাচীন গণনার উপর নির্ভর করিয়া ফর্বিস্ সাহেব আমন্ত্রণবাণী প্রচার করেন নাই। গাণিতিক প্রমাণ ব্যতীত নূতন গ্রহের অস্তিত্বের ইনি আরো অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ফর্বিস্ সাহেবের প্রমাণগুলি বুঝিতে হইলে ধূমকেতু সম্বন্ধে দুই একটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক। সৌরজগতের নানা জ্যোতিষ্কের মধ্যে ধূমকেতুগুলিই তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল গতিবিধির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। কখন কোন্ গ্রহ উপগ্রহের আকর্ষণে তাহাদের ভ্রমণপথ কতটা পরিবর্ত্তিত হইল, তাহার হিসাব বড়ই কঠিন। তথাপি সূর্য্য এবং বৃহস্পতি ইত্যাদি বৃহৎ গ্রহগণের আকর্ষণে যে সকল ধূমকেতু চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদের গতিবিধির মধ্যে একটা মোটামুটি শৃঙ্খলা দেখা যায়। ইহারা পৃথিবী ইত্যাদি গ্রহের ন্যায়ই এক এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যপ্রদক্ষিণ করে। কিন্তু ভ্রমণপথে হঠাৎ কোন বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সকল নিয়মই ভঙ্গ হইয়া যায়। তখন পূর্ব্বের ভ্রমণপথ ত্যাগ করিয়া ঐ সকল প্রবল গ্রহের নিকটবর্ত্তী এক এক নূতন পথে ইহারা চলিতে আরম্ভ করে। প্রবল গ্রহের নিকট দুর্ব্বল ধূমকেতুগুলির এইপ্রকার আনুগত্য স্বীকার জ্যোতিষিক ইতিহাসের দুর্লভ ঘটনা নয়।

জ্যোতির্বিদ্গণ বলেন, মহাকাশের নানা অংশে যে সকল উল্কাপিণ্ডময় ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক দলে দলে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাহারাই সূর্য্যের আকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়িলে ধূমকেতুর আকার পরিগ্রহ করে। এই অবস্থায় তাহারা আর গন্তব্য স্থানের দিকে চলিতে পারে না। সূর্য্য তাহাদিগকে মহাপুচ্ছবিশিষ্ট ধূমকেতুতে রূপান্তরিত করিয়া এক এক অনুবৃত্তাকার (Parabolic) পথে নিজের চারিদিকে ঘুরাইতে আরম্ভ করে।

এই প্রকারে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ধূমকেতুগুলি যখন সৌরজগৎ ত্যাগ করিবার জন্য পিছাইতে আরম্ভ করে, তখনই ইহাদের প্রকৃত সঙ্কটকাল উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে বৃহৎ গ্রহের সহিত সাক্ষাৎ হইলে যদি তাহার আকর্ষণে ইহাদের গতি হ্রাস হইয়া পড়ে, তবে কেহই নিস্তার পায় না। চিরদিনের জন্য সৌরজগতে বন্দী হইয়া ধূমকেতুগুলিকে সেই আকর্ষক গ্রহের আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। গতি বৃদ্ধি পাইলে ইহারা হাইপারবোলা (Hyperbola) আকারের পথ অবলম্বন করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। বহুদিন হইল লেক্সেলের ধূমকেতুটিতে (Lexell's Comet of 1770) গতিবৃদ্ধির কার্য্য প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছিল। এই জ্যোতিষ্কটি সৌরজগতে বন্দী হইয়া বৃত্তাভাস পথে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছিল। তা'র পর হঠাৎ একদিন বৃহস্পতির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহার গতি এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সেই দিন হইতে লেক্সেলের ধূমকেতুর আর সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। কেবল গতিবৃদ্ধির জন্য হাইপারবোলা পথ অবলম্বন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া জ্যোতির্বিদ্গণ অনুমান করিতেছেন।

ধূমকেতু সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি যে কাল্পনিক নয়, তাহার শত শত প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি শনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রহের ক্ষেত্র পর্য্যবেক্ষণ করিলে বৃহৎ ধূমকেতুগুলির কক্ষাকে ঐসকল স্থানে আসিয়া-শেষ হইতে দেখা যায়। এন্কি (Encke) ব্রর্সেন্ (Brorsen) প্রভৃতি ধূমকেতুগুলি বৃহস্পতির নিকট দিয়াই পরিভ্রমণ করে। হ্যালি* (Halley), অল্বার

* এই বৃহৎ ধূমকেতুটি এই বৎসর শীতের শেষে দেখা দিবে। ইহার প্রদক্ষিণকাল ৭৬ বৎসরের কিছু অধিক। গত ১৮৩৫ সালে ইহার শেষ উদয় দেখা গিয়াছিল।

(Alber) এবং পনের (Pon) ধূমকেতুগুলি নেপ্‌চুনগ্রহের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে না। সুবিখ্যাত টেম্‌পেলের ধূমকেতু (Tempel's Comet) সহিত আরো দুইটি ধূমকেতু মিলিয়া সেই প্রকার ইউরেনাসের সঙ্গ ত্যাগ করিতে চাহে না। প্রধান গ্রহগুলির সহিত ধূমকেতুদিগের এইপ্রকার ঘনিষ্ঠতা দেখিলে, গ্রহেরাই যে ধূমকেতুগুলিকে নিজেদের রাজ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে তাহা সহজেই বুঝা যায়।

গত ১৮৪৩, ১৮৮০, এবং ১৮৮২সালে যে তিনটি ধূমকেতুর উদয় হইয়াছিল, তাহাদের গতিবিধি গণনা করিতে গিয়া অধ্যাপক ফর্বিস্ সাহেব গণনার ফলে এক অত্যাশ্চর্য্য একতা দেখিয়াছিলেন। ভ্রমণ-পথ গণনা করা হইলে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কক্ষাকে নেপ্‌চ্যুন্ গ্রহের বাহিরে একটি স্থানে মিলিত হইতে দেখা গিয়াছিল, এবং অনুসন্ধানে আরো সাতটি ক্ষুদ্র ধূমকেতুর পথ ঐ প্রদেশে শেষ হইয়াছে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কোন বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকর্ষণ না থাকিলে একই প্রদেশে বহু ধূমকেতুর কক্ষার এই প্রকার মিলন একবারে অসম্ভব। টড্ সাহেবের গাণিতিক প্রমাণের সহিত এই প্রমাণটি যোগ করিয়া ফর্বিস্ সাহেব নেপ্‌চুনের কক্ষার বাহিরে নিশ্চয়ই একটি বৃহৎ গ্রহ আছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছেন।

আবিষ্কর্ত্তা তাঁহার গণনালব্ধ গ্রহটির অস্তিত্ব সমাচার প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; ইহার সূর্য্যপ্রদক্ষিণকাল এবং দূরত্বাদিও গণনা করিয়াছেন। এই হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের পৃথিবী সূর্য্য হইতে যতদূর অবস্থিত, তাহারিপ্রায় ১০৫ গুণ দূরে থাকিয়া নূতন গ্রহটি হাজার বৎসরে এক একবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রায় নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। নূতন গ্রহটি যে কতদূরে থাকিয়া সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে এখন পাঠক অনুমান করুন।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলিতেছেন, সূর্য্য হইতে এত দূরবর্ত্তী বলিয়াই এপর্য্যন্ত গ্রহটি দূরবীনে ধরা দেয় নাই। পর্য্যবেক্ষকগণ সম্ভবতঃ ইহাকে একটি ক্ষীণ নক্ষত্র ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

মঙ্গল বৃহস্পতি প্রভৃতি পরিজ্ঞাত গ্রহগুলির কক্ষা পৃথিবীর কক্ষার সহিত প্রায় এক সমতলে অবস্থিত। কেবল বুধ শুক্র এবং শনির কক্ষাকে ধরাকক্ষার তল হইতে কিঞ্চিৎ অধিক বাঁকিয়া থাকিতে দেখা যায়। কাজেই মেষ বৃষাদি নক্ষত্র-পুঞ্জযুক্ত রাশিচক্রের মধ্যেই সৌরজগতের জ্যোতিষ্কগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়া থাকে। এই কারণে গ্রহ উপগ্রহের সন্ধানের জন্য জ্যোতিষীরা এপর্য্যন্ত রাশিচক্রের মধ্যেই তাঁহাদের দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নূতন গ্রহের ভ্রমণপথ ধরাকক্ষের তলের সহিত প্রায় ৫২ অংশ কোণ্ উৎপন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছে। সুতরাং রাশিচক্রের বহির্ভূত প্রদেশেই ইহাকে অধিকাংশকাল কাটাইতে হয়। নূতন গ্রহটির এই বিশেষত্বটিই ইহাকে শত শত দূরবীনের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে বলিয়াও অনেকে অনুমান করিতেছেন।

ফর্বিস্ সাহেব সংগৃহীত তথ্যগুলি প্রচারিত হইলে, আমেরিকা হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জগৎবিখ্যাত পণ্ডিত পিকারিং (Prof. Pickering) সাহেব ফোটোগ্রাফ চিত্রে নেপ্‌চুন্ হইতেও দূরবর্ত্তী একটি গ্রহের অস্তিত্ব দেখিয়াছিলেন। এই আবিষ্কার

সমাচার প্রচার হইলে, ফর্বিসের গ্রহই পিকারিঙের চিত্রে ধরা দিয়াছে বলিয়া জ্যোতির্বিদ্‌গণ মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি পিকারিং সাহেব তাঁহার গ্রহের অবস্থানাদি সম্বন্ধে যে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে উহা যে ফর্বিসের গ্রহ নয় তাহা বেশ বুঝা যায়। আবিষ্কর্ত্তার গণনা অনুসারে এই দ্বিতীয় নূতন গ্রহটি এখন ( বৈশাখ মাসে ) মিথুনরাশিতে একটি ক্ষীণ নক্ষত্রের আকারে অবস্থান করিতেছে।

যাহা হউক, আকাশের যে প্রদেশ গ্রহবর্জ্জিত বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, সেই স্থানেই একই সময়ে দুইটি বৃহৎ গ্রহের অস্তিত্বের আভাস পাইয়া, জ্যোতির্বিদ্‌গণ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছেন। ষাট বৎসর পূর্ব্বে আডামস্ এবং লেভেরিয়ার নেপ্‌চুন্ গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ প্রচার করিলে, সমগ্র বৈজ্ঞানিকজগতে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, দুইটি নূতন গ্রহের আবিষ্কার সম্ভাবনায় আজ ঠিক্ সেই প্রকার আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। জগতের প্রধান প্রধান মানমন্দিরের জ্যোতিষিগণ গ্রহ দুইটিকে দেখিবার জন্য নানা আয়োজন করিতেছেন। ১৮৪৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বরের ন্যায় ১৯০৯ সালের কোন একদিন হয় তো জ্যোতিষিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন বলিয়া গণ্য হইতে থাকিবে।

অতিদূরবর্ত্তী গ্রহগুলির সন্ধান করা যেমন দুঃসাধ্য, সূর্য্যের অতি নিকটস্থ গ্রহের অন্বেষণ তেমনি কষ্টকর। আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে এখন বুধ গ্রহটিই ( Mercury ) সূর্য্যের নিকটতম বলিয়া প্রসিদ্ধ। নিকট হইলেও এটি সূর্য্য হইতে প্রায় তিন কোটি ষাট্ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। বহুদিন হইল নেপ্‌চ্যুন্ গ্রহের আবিষ্কারক লেভেরিয়ার সাহেব বুধগ্রহের গতিবিধি লইয়া কিছুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া তাহার সুস্পষ্ট বিচলন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। নিকটে অপর আর একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্ক না থাকিলে কোন গ্রহেরই বিচলন হয়। কাজেই সূর্য্যের আরো নিকটবর্ত্তী প্রদেশে থাকিয়া কোন একটি অপরিচিত গ্রহ বুধকে টানিতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। কিন্তু লেভেরিয়ার সাহেব বহু পর্য্যবেক্ষণেও সেই অপরিচিতটিকে চাক্ষুষ দেখিতে পান নাই।

এই ঘটনার কিছুদিন পর ১৮৫৯ সালে ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট ( Dr. Lescarbault ) নামক জনৈক অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক সূর্য্যবিম্বের উপর দিয়া একটি ক্ষুদ্র গ্রহকে যাইতে দেখিয়াছিলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হইলে লেভেরিয়ার সাহেব আর স্থির থাকিতে পারেন নাই। ডাক্তার লেস্‌কারবল্টের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, এবং সূর্য্যবিম্বে দৃষ্ট গ্রহসম্বন্ধে সকল ব্যাপার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানিয়া লইয়া গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই গ্রহের আকর্ষণেই যে বুধ তাহার নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে, গণনার ফল দেখিয়া তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। লেভেরিয়ার সাহেব ইহার কক্ষাদি নিরূপণ করিয়া ইহাকে ভল্‌কান্ ( Vulcan ) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

ডাক্তার লেস্‌কারবল্ট ব্যতীত অপর কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ অদ্যাপি ভল্‌কান্ গ্রহকে দেখিতে পান নাই। বুধ এবং সূর্য্যের মধ্যস্থিত আকাশে কোন জ্যোতিষ্ক আছে কি না, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করিবার জন্য অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ অনেক পর্য্য-

বেক্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি কেহই কৃতকার্য্য হন নাই।

সূর্য্যের প্রখর আলোক তাহার নিকটস্থ জ্যোতিষ্কগুলিকে বড়ই অস্পষ্ট করিয়া রাখে। কেবল এই কারণে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের পর্য্যবেক্ষণ বড়ই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় উজ্জ্বল সূর্য্যবিম্ব যখন কৃষ্ণবর্ণ চন্দ্রের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন আর এই অসুবিধাটি থাকে না। লেভেরিয়ারের সময় হইতে এপর্য্যন্ত অনেক পূর্ণগ্রাস সূর্য্যগ্রহণ হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক গ্রহণেই ভলকান্ গ্রহের সন্ধান করা হইয়াছে, কিন্তু কোন জ্যোতিষীই তাহাকে আর দেখিতে পান নাই। ১৮৭৪ সালের সূর্য্যগ্রহণে অধ্যাপক ওয়াটসন্ এবং সুইফ্‌ট সাহেব সূর্য্যের অতি নিকটে দুইটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দেখিয়া, তাহাদেরি একটিকে ভলকান্ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে সেই দুটিকেই কর্কটরাশির দুইটি নক্ষত্র বলিয়া স্থির হইয়াছিল।

বৃহৎ আবিষ্কার মাত্রই অতর্কিতভাবে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। কোন্ দিন কোন্ উপলক্ষে বিধাতার অনন্ত সৃষ্টির কোন্ কণাটুকুর পরিচয় পাওয়া যাইবে, তাহা পূর্ব্বে হিসাব করিয়া বলা যায় না। সুতরাং লেভেরিয়ারের ভল্‌কান্‌গ্রহটি যে, কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে হঠাৎ দেখা দিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিবে না, একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারেন না।

---

## মহর্ষির জন্মতিথি।

(৩রা জৈষ্ঠ)

আজ মহর্ষির শুভ জন্মদিন উপলক্ষে যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহারই পুনরুক্তি করিতেছি "যে মহাপুরুষের মৃত্যু নাই। তাঁহারা যখন দেহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন আমাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা যে জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই সে কার্য্য শেষ হয় না; যাহা কিছু অসম্পূর্ণ রাখিয়া যান, মৃত্যুর পরে তাহা সম্পূর্ণ হয়। শুভক্ষণে তাঁহাদের জন্ম তাঁহাদের জীবন মনুষ্যের হিতসাধনে অতিবাহিত হয়, মরণও জীবের কল্যাণজনন। মরণে তাঁহাদের সম্পূর্ণ তিরোভাব হয় না; তাঁহাদের জীবনের অমূল্য দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের অকথিত বাণী, তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি পরবর্ত্তী যাত্রীদিগের পথের সম্বল হয়।"

অমৃত নিকেতনের যাত্রী যে আমরা, আমাদের লক্ষ্য যে সুদূর, পথে বিঘ্ন বিপত্তি রাশি রাশি। আমরা এই জীবন সংগ্রামে পিপাসায় প্রাণান্ত, শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ি। তাই ভগবানের দূত আসিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করেন, মৃত প্রাণকে সজীব করেন, নিরুৎসাহকে উৎসাহ দান করেন, বিপন্নকে উদ্ধার করেন। তাঁহার পরশে যে দুর্ব্বল সে সবল হয়, যে ভীরু সে সাহস পায়, হতাশ বিমর্ষ চিত্তেও আশার সঞ্চার হয়। এই সকল মহাত্মারা মৃত্যুঞ্জয়, মৃত্যুর পরেও অলক্ষিত ভাবে তাঁহারা কার্য্য করিতে থাকেন।

এই কয়েক বৎসর হইল আমাদের পিতৃদেব যে আমাদের ছাড়িয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তিনি কি সত্য সত্যই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? না তাহা নহে। সত্য বটে, আমরা তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাই না, তাঁহার মধুর বাণী শুনিতে পাই না কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি কি আমাদের সঙ্গে নাই? আছেন, তাঁহার শরীর নাই কিন্তু তাঁহার আধ্যা-

ত্মিক জীবন তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল শিক্ষা দিয়াছেন—যে সকল পবিত্র ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রতিনিধি। তোমরা যদি তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতে চাও, তাহ'লে তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখ—জীবনে পরিণত কর। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তে তোমাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ কর—তাঁহার উপদেশ মত ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে ব্রতী হও। এই তাঁহার স্মৃতিরক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন।

তাঁহা হইতে আমরা কি শিক্ষা পাইয়াছি একটুকু প্রণিধান করিয়া দেখ। দেখিবে যে বিষয়মার্গ হইতে আধাত্মিক রাজ্যে আমাদের আত্মাকে উন্নীত করা, ইহাই তাঁহার সমস্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

আমরা যখন চারিদিকে চাহিয়া দেখি তখন কি দেখি? এই যে ধর্ম্ম কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়াতে পরিণত; গেরুয়া বসন, ভস্মলেপন, উপবাস, গঙ্গাস্নান, তীর্থযাত্রা, এই সকল বাহ্য অনুষ্ঠানকে লোকে ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। আর দেখি যে অনন্ত-স্বরূপ পরমেশ্বরের মূর্ত্তি গড়িয়া লোকেরা পরিমিত ভাবে তাঁহার পূজা করিতেছে। মহর্ষির উপদেশের মাহাত্ম্য এই যে তিনি ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমরা তাঁহার প্রসাদাৎ জানিয়াছি যে ধর্ম্ম কেবল বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড নহে। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু, এমন খাঁটি জিনিস যে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করা যায়, আত্মবিসর্জ্জন করা যায়। তিনি জীবনে দেখাইলেন যে

"ন ধনেন ন প্রজয়া ন কর্ম্মণা ত্যাগেনৈকেনামৃতত্ব মানশুঃ"।

না ধনের দ্বারা, না পুত্রের দ্বারা, না কর্ম্মের দ্বারা কিন্তু এক ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্বকে ভোগ করা যায়। ধর্ম্মের পরীক্ষা ত্যাগে। এক সময়ে যখন আমাদের সাংসারিক অবস্থা ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া ঘোর সঙ্কটাকীর্ণ হইয়াছিল, পাওনাদারেরা আসিয়া সর্ব্বস্ব গ্রাস করিতে উদ্যত, তখন তিনি সকলি ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন, বলিলেন যে গায়ে এক খণ্ড পরিধান বস্ত্র থাকিতে, হাতে একটি কাণা কড়ি থাকিতে কোর্টে গিয়া 'আমার কিছুই নাই,' একথা বলিতে পারিব না। তখন তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া পরমধন লাভ করিলেন।

ঋণ পরিশোধে সর্ব্বসম্পত্তি বিসর্জন রূপ বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের পর তিনি যে অপার শান্তি ও আনন্দ অনুভব করিলেন তাহা তাঁহার আত্মজীবনীতে এইরূপে বর্ণিত আছে—

"আমি যা চাই তাই হইল—বিষয় সম্পত্তি সকলি হাত হইতে চলিয়া গেল। যেমন আমার মনে বিষয়ের অভিলাষ নাই, তেমনি বিষয় ও নাই, বেস মিলে গেল।

"সেই অভিলাষে বিদ্যুতের প্রার্থনা ছাড়া আর কোন প্রার্থনা না থাকুক—যদি বিদ্যুৎ পড়িয়া ধনধান্য জ্বলিয়া যায় তবে সে বড় আশ্চর্য্য নহে।"

আমি বলি যে "হে ঈশ্বর আমি তোমা ছাড়া আর কিছুই চাই না।" তিনি প্রসন্ন হইয়া এ প্রার্থনা গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ করিয়া আমার নিকটে প্রকাশ হইলেন এবং আর সব কাড়িয়া লইলেন।

"ছুন্দড়ী কি ঠুড্ডিয়া ময়েস্সর নহী কে চিবাকে প্যাণি পিয়ূঁ"।

যাহা প্রার্থনাতে ছিল তাহা পূর্ণ হইয়া এখন কার্য্যে পরিণত হইল। সে শ্মশানের সেই এক দিন, অদ্যকার এই আর একদিন। আমি আরএক সোপানে উঠিলাম। চাক-

য়ের ভীড় কমাইয়া দিলাম, গাড়ী ঘোড়া সব নিলামে দিলাম, খাওয়া পরা খুব পরিমিত করিলাম, ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলাম। কল্য কি খাইব কি পরিব, তাহার আর ভাবনা নাই। কাল এ বাড়ীতে থাকিব, কি এ বাড়ী ছাড়িতে হইবে, তাহার ভাবনা নাই। একেবারে নিষ্কাম হইলাম। নিষ্কাম পুরুষের যে সুখ ও শান্তি, তাহা উপনিষদে পড়িয়াছিলাম এখন তাহা জীবনে ভোগ করিলাম। চন্দ্র যেমন রাহু হইতে মুক্ত হয়, আমার আত্মা তেমনি বিষয় হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোককে অনুভব করিল। "হে ঈশ্বর অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তোমাকে না পাইয়া প্রাণ আমার ওষ্ঠাগত হইয়াছিল —এখন তোমাকে পাইয়া আমি সব পাইয়াছি।"

( জীবনী ৮৮ )

তাঁহার নিকট হইতে আমরা আর কি পাইয়াছি ? না,

ব্রহ্ম পূজা।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে যে পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা ভাঙ্গা সহজ কিন্তু নূতন করিয়া গড়িয়া তোলাই কঠিন। উপদেবতার আসনে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের স্থাপনা এবং জাগ্রত জীবন্ত দেবতারূপে তাঁহার আরাধনা এ বড় কঠিন সমস্যা। এই সমস্যা তিনি যথাসাধ্য পূরণ করিলেন। যখন তিনি দেখিতেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরের ভিতরে লোকেরা ধূপ ধুনা নৈবেদ্য দিয়া কৃত্রিম দেব দেবীর উপাসনা করিতেছে তখন তিনি আন্তরিক ব্যথা পাইতেন, মনে করিতেন কবে এই জগন্মন্দিরে আমার অনন্তদেবকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিব—এই স্পৃহা তখন তাঁহার মনে অহোরাত্র জ্বলিতেছিল। পরে যখন আকাশে সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষকে দেখিতে পাইলেন এবং সেই অমৃত পুরুষ যখন তাঁহাকে অন্তরে দর্শন দিলেন—যখন জগন্মন্দিরের দেবতা তাঁহার হৃদয়মন্দিরের দেবতা হইলেন, তখন তিনি আশাতীত ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। প্রেমরবির অভ্যুদয়ে তাঁহার বিষাদ অন্ধকার চলিয়া গেল—তাঁহার চিরনিদ্রা ভঙ্গ হইল। জীবন স্রোত বেগে চলিল—তিনি প্রাণে বল পাইলেন।

যখন পৌত্তলিক পূজায় তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিল এবং তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব অন্বেষণে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন—সেই সময়ে দৈব ঘটনায় কিরূপে উপনিষদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহা তোমরা তাঁহার জীবনীতে পড়িয়া থাকিবে। ঘটনাটি এই;—তিনি বলিতেছেন

"আমার এই ভ্রম হইল যে আমাদের সমুদয় শাস্ত্র পৌত্তলিকতার শাস্ত্র। অতএব তাহা হইতে নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের তত্ত্ব পাওয়া অসম্ভব। আমার মনের যখন এই প্রকার নিরাশ ভাব তখন হঠাৎ একদিন সংস্কৃত পুস্তকের একটা পাতা আমার সম্মুখে দিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিলাম। ঔৎসুক্যবশতঃ তাহা ধরিলাম কিন্তু তাহাতে যাহা লেখা আছে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য আমার কাছে বসিয়াছিলেন, সেই পাতা তাঁহার হাতে দিয়া তাঁহাকে বলিলাম, এই পাতার শ্লোকগুলার অর্থ করিয়া রাখ, কুটী হইতে আইলে আমাকে সব বুঝাইয়া দিবে, এই বলিয়া আমার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখি ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অবশেষে ব্রহ্মসভার পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ তাহার অর্থ করিয়া দিলেন। তিনি পাতা পড়িয়া বলিলেন এ

যে ঈশোপনিষদ—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—

পরমেশ্বর দ্বারা এই সমুদয় জগৎ আচ্ছাদিত রহিয়াছে—এই মহাবাক্যে যেন স্বর্গ হইতে অমৃত আসিয়া তাঁহাকে অভিসিক্ত করিল। সেই দৈববাণী তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুবিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি যেমন ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, উপনিষদের এই বচনে তাহার সম্পূর্ণ সায় পাইয়া পুলকিত হইলেন। তিনি যাহা চান তাহাই দৈবানুগ্রহে তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িল।

আমাদের সাধারণ লোকের এক সংস্কার এই যে, সংসারে থাকিলে ধর্ম্মসাধন হয় না—ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা আবশ্যক। ঋষিরা বনে গিয়াই ব্রহ্মের ধ্যান ধারণা আরাধনা করিতেন। উপনিষদ কেবল অরণ্যে বসিয়াই পড়িতে হইবে এই রূপ বিধান, এই জন্য উপনিষদের প্রথম কল্প আরণ্যক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের এ কালের অবস্থা অন্যতর। গৃহাশ্রমে আমাদের বাস, গৃহই আমাদের তপোবন।

"গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয় নিগ্রহস্তপঃ।"

গৃহেতেও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ রূপ তপস্যা করা যায়। উপনিষদে একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা কেবল অরণ্যে অরণ্যে হইত,মহর্ষির বিধানে সেই উপাসনা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি বলিয়া দিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম। গৃহে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইবে। পিতামাতাকে সেবা করিতে হইবে, স্ত্রী পুত্রকে পালন করিতে হইবে, স্বজন বন্ধুবর্গকে রক্ষা করিতে হইবে। ন্যায়োপার্জ্জিত বিত্ত দ্বারা লোকহিত ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইবে। সন্ন্যাস অবলম্বন না করিয়া পরিবারের মধ্যে অমূর্ত্ত ঈশ্বরের উপাসনার প্রতিষ্ঠা করা, ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের নব বিধান।

ঈশ্বরের উপাসনা কি? মহর্ষির হৃদয়প্রসূত ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ হইতে আমরা এই মহামন্ত্র শিক্ষা করিয়াছি যে,

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার আদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধন করাই তাঁহার উপাসনা। ব্রহ্মপ্রীতি একদিকে, কর্ত্তব্য আর একদিকে—এই উভয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মে স্থান পাইয়াছে। ধর্ম্মকে যদি দেহরূপে কল্পনা করা যায়, তবে তাহার অস্থি হচ্ছে কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং তাহার রক্ত মাংস হচ্ছে প্রীতি। এই উভয়ের মিলন জীবনে। আমরা যাঁহার প্রসাদে মূর্ত্তিপূজার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মপূজা পাইয়াছি এবং সেই পূজার প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়াছি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার স্মৃতি কি হৃদয়ে পোষণ করিব না?

মহর্ষি যখন জানিলেন যে তাঁহার উপাস্য দেবতা যিনি, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার অনন্ত-স্বরূপ, তখন তিনি উপদেবতাদের পূজা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকেই ধরিয়া রহিলেন, তাঁহার অন্তরের বিশ্বাসকে অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাহার ফল যে গৃহবিচ্ছেদ বৈষয়িক ক্ষতি প্রসূত হইল, তাহা কিছুই গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, "জ্ঞাতি বন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন—ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।"

তিনি ব্রহ্মলাভের জন্য কত সাধনা,

কি কঠোর তপস্যায় জীবন যাপন করিয়া ছিলেন কিন্তু তাঁহার অভিলষিত বস্তু আপনি পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি নিজে যে প্রেমামৃত পানে মত্ত ছিলেন আর সকলকে সেই অমৃতরস আস্বাদন করাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল—তিনি হিমালয়ের আশ্রম হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার স্বোপার্জিত সত্য লোক-সমাজে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে তিনি তাঁহার আত্ম-সাধনার ফল আমাদের সকলের মধ্যে বিতরণ করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত অমৃত-ফল ভক্ষণ করিয়া আমরা নব জীবন লাভ করিয়াছি। তাঁহারই উপদেশে আমরা জানিলাম যে পার্থিব অন্নপানেই আমাদের পোষণ হয় না, আমাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য অধ্যাত্মিক অন্ন পানের প্রয়োজন। তিনিই দেখাইয়া দিলেন যে ভূমাতেই আমাদের সুখ—সেই অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই আমাদের উপাস্য দেবতা। অনন্তের সঙ্গে যে যোগ তাহা এখানেই আরম্ভ হয়, সে যোগের আর অন্ত নাই। সেই অধ্যাত্মযোগ নিবদ্ধ করিতে পারিলে এই মৃত্যুময় সংসারে আমরা অমৃত লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। পরকালে বিশ্বাস যুক্তি-তর্কের উপর নির্ভর করে না। বিত্তমোহে মুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকীর নিকট পরকাল-তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। সেই সাধক তাহা প্রত্যক্ষবৎ গ্রহণ করিতে পারেন যিনি পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সাধন করিতে থাকেন। অনন্তের সহবাসে অনন্ত জীবনে বিশ্বাস ভক্ত-হৃদয়ে অটলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হে মুমুক্ষু ভক্তগণ, যদি তোমাদের মনে পরকালের প্রকাশ সংশয়-তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তোমরা মহর্ষির আশ্বাসবাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হও। তাঁহার উপদেশ এই যে মানবাত্মা অনন্ত উন্নতির অধিকারী। এখানে যে সাধক ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া, সহিষ্ণু হইয়া, তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্মকার্য্য সকল সাধন করিতে থাকে, "সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সংসারের পার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, অন্তরতম অমৃত ব্রহ্মের তিমিরাতীত জ্ঞানোজ্বল প্রেমসিক্ত ক্রোড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেখানে নূতন প্রাণ পাইয়া, পবিত্র হইয়া তাঁহার কৃপাতে সে জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে, সেই অনন্ত জ্ঞান, প্রেম আনন্দের সহিত ছায়া ও আতপের ন্যায় নিত্যযুক্ত থাকে। সে দিনের আর অবসান হয় না। "সকৃৎ বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।"

পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
নিত্য নব সত্য তব শুভ্র আলোকময়
কবে হবে বিভাসিত মম চিত্ত আকাশে।
রয়েছি বসি দীর্ঘ নিশি চাহিয়া উদয় দিশি,
উর্দ্ধমুখে করপুটে, নবসুখ, নবপ্রাণ,
নব দিবা আশে।
কি দেখিব, কি জানিব, না জানি সে কি
আনন্দ,
নূতন আলোক আপন মন মাঝে,
সে আলোকে মহাসুখে আপন আলয় মুখে
চলে যাব গান গাহি কে রহিবে আর দূর
পরবাসে।"

---

## নাম-মাহাত্ম্য।

আজ নববর্ষের প্রথম দিন—আজ আমাদের মহোৎসব। এতদিন অপেক্ষা করিয়া আজ আবার সেই দিন আসিয়াছে, যে দিনে আমাদের মাকে সকলে মিলিয়া বরণ করিয়া নিজ নিজ হৃদয় মন্দিরে তুলিয়া লইব। মাত! তোমাকে নববর্ষের প্রীতি উপহার দিবার জন্য আজ আমরা সকলে এখানে সমবেত হই-

য়াছি। আজ আমাদের সেই দিন আসিয়াছে, যাহার জন্য চাতক পক্ষীর ন্যায় এই সারাটী বৎসর অপেক্ষা করিতেছিলাম কবে তোমার নামে আনন্দ কোলাহল করিয়া সকলে মিলিব এবং তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ হইবে। আজ আমাদের সেই দিন আসিয়াছে যে দিনে সকলে মিলিয়া উচ্চৈস্বরে "মা, মা" বলিয়া ডাকিতে পাইব এবং সন্তানদিগের ক্রন্দনে তুমি প্রত্যেকের অন্তরে প্রবেশ না করিয়া থাকিতে পারিবে না। এই শুভদিনে আমরা কত না আশা করিয়া তোমার কাছে আসিয়াছি, যে কত সমাদরে, কত ভক্তি-ভাবে নিজ নিজ হৃদয়ে বসাইব, তোমার কত নাম দিব, কত নামে তোমাকে ডাকিব; তোমার নামের মাহাত্ম্য কি, জগতে তাহা দেখাইব।

আমাদের আত্মা সেই পবিত্র স্বরূপের নামে আজ পবিত্র হউক, পরমাত্মার মহিমায় এমন ভাবে আচ্ছাদিত হউক যাহাতে কোনরূপে পাপের কণামাত্রও প্রবেশ করিতে না পারে। হে ভাই বন্ধুগণ! আমরা তাঁহাকে আজ নামের দ্বারা অর্চ্চনা করিব বলিয়া আসিয়াছি। দেবতার চরণে যেমন ফুল রাখিয়া লোকে পূজা করে তেমনি নামের দ্বারা হৃদয়ে তাঁহার পূজা করি আইস। তাঁহার পবিত্র নামে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর। আমাদের হৃদয়ে ভক্তি ভাবের উদ্রেক হউক, তাহা হইলে সেখানে তাঁহার আবির্ভাব হইবে। আমরা তখন নামের পুষ্প দিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিব। ভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রীতি উচ্ছ্বাসে আমরা কত নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিব। সেই হৃদয়ের মণিকে কত কষ্টে খুজিয়া পাইয়াছি, আর তাঁহাকে কিছুতেই যেন না হারাই। আমাদের হারাধন, এমন ধন আমরা পাইয়াছি, এত দুর্ল্লভ, যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মুদ্রা খরচ করিলেও তাহা পাওয়া যায় না। কেবল তাঁহার অনুগ্রহেই আমরা তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়াছি। তিনি আমাদের মধ্যস্থলে হৃদয়াসনে আসীন। তাঁহার আকর্ষণ আমাদের ছাড়াইবার যো নাই। ইহাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ ও মহাপ্রসাদ। আমাদের আত্মার দ্বারা সকলে পরমাত্মাকে ঘিরিয়া বসি আইস। এখন অতি পবিত্র ভাবে এই হৃদয়-মণিকে হৃদয়কোষে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সর্ব্বদা নিষ্কলঙ্ক ভাবে এমন পাপ শূন্য হইয়া চলিতে হইবে যাহাতে পাপে তাপে জড়িত হইয়া মোহে অন্ধকারে হৃদয়ের মণিকে হারাইয়া না ফেলি। একবার যে ধন পাইয়াছি, হরাইলে যদি বা না মিলে —হয়ত বা যুগ যুগান্তরের কঠোর তপস্যায়, কঠোর সাধ্য সাধনায় তাহা না পাইতে পারি।

আমাদের হৃদয়পটে তাঁহার জাজ্বল্যমান ছবি যেন চিরদিন অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারি। তাঁহার ছবি যেন সর্ব্বদা আত্মায় ধারণ করিয়া চলি। তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের জীবন বৃথা হইবে তাঁহার অভাবে যে আমরা নিরাশ্রয় হইব। তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য করিতে যেন আমরা যত্নবান হই, যাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সন্তান হইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারি। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিলে এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনের উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তিনি আমাদের নেতা হইয়া যেদিকে লইয়া যাইবেন আমরা যেন সেইদিকে যাইতে প্রবৃত্ত হই। এই পৃথিবীতে পথভ্রমে কুপথগামী হইয়া আমাদের যেন বিচরণ করিতে না হয়। তিনি আমাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়া যেন বিনাশ না করেন। চিরকাল তিনি তাঁহার চরণে আশ্রয় দান করিয়া প্রতিপালন করিতেছেন, ভবিষ্যতে তাঁহারই পরিপালনে পুষ্ট হইয়া, তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া যেন তাঁহারই পথের ভিখারী হইয়া থাকি। এস আমরা নামের মালা তাঁহাকে পরাইয়া দিই। তিনি সর্ব্বত্র বিদ্যমান ও বিরাজমান থাকাতে আমাদের সকল স্থান, সকল লোক পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই সৌন্দর্য্যে সকলই সুন্দর মনে হয়। ধর্ম্মের অভাব ও আমাদের আলস্য ঔদাস্য বশতঃ তিনি আপন সুন্দর মূর্ত্তি না দেখাইয়া লুকায়িত রাখেন। তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে প্রত্যেক পদে পদে নিজেদের দুরবস্থা দূর করিতে সমর্থ হই তাহারই জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যিনি আমাদের সর্ব্বসুখদাতা, আমরা তাঁহার নাম করিতে ভুলিয়া যাই বলিয়া আমরা এত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছি।

আত্মশক্তি ও আত্মবল পাইবার জন্য পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের যোগ চাই। তিনি আমাদের কার্য্যে প্রসন্ন হইলে আমাদের আত্মপ্রসাদ মিলিবে। অনুক্ষণ তাঁহার সঙ্গে মেলামেশা ও বন্ধুত্ব চাই। ভগবানের সঙ্গে মেলামেশাতে এবং তাঁহার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন হইলে মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরের মেলামেশার ভাব ভ্রাতৃভাব আপনা হইতেই আসিবে। ভগবানের সঙ্গে নিয়ত কথোপকথন হইলে, তাঁহার সঙ্গে মিলন হইলে, মনুষ্যের মধ্যে মিলন সহজেই আসিবে। প্রভুকে যখন শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে শিখিব তখন আর কাহারও উপর ঘৃণার ভাব আসিবে না। তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাঁহার দাস। তিনি আমাদের রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা। তিনি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, আমরা তাঁহার দীন হীন সন্তান। তিনি অগতির গতি।

তিনি এই অনাথদিগকে কোলে লইয়া চোখের জল মুছাইয়া দিবেন।

সৎসঙ্গে অসতের যোগ হইলে অসৎ সৎ হইয়া যায়। পরমাত্মার যোগে আত্মার দুরবস্থা কি প্রকারে থাকিবে? ইহাতেই বুঝা যায় আত্মার উন্নতি ব্যতীত অবনতি নাই। আমরা ক্রমে এই মনুষ্য সমাজের ঋণমুক্ত হইয়া তাঁহার সমাজ ভুক্ত হইব। তাঁহার সেবক হইয়া চিরদিন তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিব। পরমাত্মা মনুষ্যহৃদয়ে অবস্থিত থাকিলে আত্মার বিনাশ নাই। পরমাত্মার আকর্ষণ ফলে আত্মার সুগতি হইবেই হইবে। সতের সঙ্গে অসৎ কালে সতে পরিণত হইবে। যদি আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, যদি তাঁহার দিকে আমাদের মন ছুটিতে থাকে, আগ্রহ সহকারে সকল কর্ম্মে তাঁহাকে প্রসন্ন করি, তবে আমাদের মঙ্গল হইবেই হইবে। পরমাত্মা ও আত্মা ছায়াতপের ন্যায় একযোগে স্থিতি করিতেছে—যেমন দুটি পক্ষী পরস্পর মুখোমুখী হইয়া রহিয়াছে। একজন নিঃস্বার্থ ভাবে দান করিতেছেন, অপরে কেবল ফল ভোগ করিতেছে। এই পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি আত্মপ্রসাদ পাইয়াছেন, তাঁহার আর দুঃখ কিসের? ধর্ম্ম ভাবে মন উন্নত হইলে, আত্মপ্রসাদ পাইলে সকল দুঃখ দূর হইয়া জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে। ভগবানকে ভাল বাসিতে পারিলে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাব দূর হইয়া যাইবে। তখন পৃথিবীর সকল লোককে আপন ভাবে দেখিতে পারিবে, মনুষ্য জীব জন্তু সকলের উপর ভালবাসা আসিবে। পিতা মাতার উপর ভক্তি ও কর্ত্তব্য, পতিভক্তি, পতিসেবা, ভ্রাতৃবাৎসল্য, সন্তানপালন, এ সকল কোথা হইতে আসে? এক ভগবদ্ভক্তির স্রোতে সকল কর্ত্তব্য, সকল সৎকার্য্য, সকল ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়। ভগবানের প্রেমে ও ভক্তিতে হৃদয়কে প্লাবিত কর, যাহাতে উহার তরঙ্গ সকলের হৃদয়কে ডুবাইয়া দেয়। অন্তরে একবার ভগবানকে স্থিরনেত্রে নিরীক্ষণ কর, দেখিবে, সেইখানেই স্বর্গধাম, সেই পরম প্রভুকে সদাসর্ব্বদা সেইখানেই দেখিতে পাইবে। সর্ব্বত্র বিরাজমান পরমেশ্বরের সঙ্গে সেইখানেই মিলন হয়, সেইখানেই তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হয়, তাঁহার আদেশ উপদেশ সেইখান হইতেই পাই। চক্ষু মুদিলে হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখি, তাই হৃদয়ই আমাদের স্বর্গধাম। সেই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের মহারাজাধিরাজ প্রভুকে অন্তর ভিন্ন আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাই না। বহির্জগতে এতদিন ধরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি কিন্তু তাঁহাকে কোথাও ধরিতে পারি নাই। বহির্জগতে সকলি অনিত্য ও অনিশ্চিত। মোহে আচ্ছন্ন হইলে বহির্জগত আপাততঃ সুন্দর দেখায় বটে কিন্তু পরিণামে তাহার মলিনতা পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। একবার জ্ঞানালোকে হৃদয়ক্ষেত্র উজ্জ্বল কর, দেখিবে সকল জঞ্জাল, সকল অপবিত্রতা দূর হইয়া যাইবে, নিশাচর সম রিপুগণ সেখান হইতে দূরে পলায়ন করিবে, ভগবানের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হইবে। সেই সৌন্দর্য্য দেখিলে চিরকাল সেইখানে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা যায়। মনে হয় জন্ম জন্ম এই চরণে দাস হইয়া পড়িয়া থাকি। ভাগ্যবলে সেই সুন্দর মূর্ত্তির বিকাশ দেখিলে আর নড়িবার যেন ক্ষমতা থাকে না।

কিন্তু অন্তর্জগতে প্রবেশের পথ সে অতি দুর্গম পথ। নিশাচর রিপুগণ মোহান্ধকারে তাহার চতুর্দ্দিকে নিত্য বিচরণ করিতেছে। সেই বলবান রিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী না হইতে পারিলে প্রভুর দর্শন পাওয়া অসম্ভব। এই রিপুগণকে পরাজিত করিয়া নিজবশে আনা চাই। যাঁহারা বহির্জগতে তাঁহাকে না ভুলিয়া নিষ্কাম ও পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে রিপুদিগের উপর জয়লাভ সহজে হয়। প্রভু তাঁহাদের সহায় হন, প্রভুর নিকট হইতে তাঁহাদের আহ্বান আইসে। যাঁহারা বাহিরের অনিত্য সুখ সৌভাগ্য তুচ্ছ করিয়া নিরঞ্জন নিখিল কারণের দর্শন পাইবার জন্য রিপুগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের উপরে ভগবানের কৃপা আসে। তাঁহাদিগকে তিনিই শক্তি দেন ও বল দেন। তাঁহারা সংগ্রামে পরাজিত না হইয়া প্রভুর কাছে আনীত হন। অন্তর্যামী ভগবানকে পাইতে হইলে অনেক সাধ্য সাধনা ব্যতীত অন্তরের মধ্যে তাঁহাকে পাওয়া কঠিন। প্রভুর দর্শন অতি দুর্লভ। সংসারের দুঃখ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কচিৎ কেহ ভাগ্যবলে সেই সুখসাগরে আসিয়া পড়ে। একবার কোন প্রকারে সেখানে আসিয়া সেই সুন্দর মূর্ত্তির বিকাশ দেখিলে অনন্তকাল সেইখানেই স্থিতি করিতে ইচ্ছা হয়। সেই সুন্দর পুরুষ তিনি আমাদের স্বামী। কি করিয়া তাঁহার প্রেমে নিমগ্ন হইব? তিনি পিতার পিতা, মাতার মাতা, কি করিয়া তাঁহার চরণ ধরিব? সেই দেবদেবের পূজা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে প্রসন্ন করিব?—কিরূপে তাঁহার প্রসাদ লাভে চিরকৃতার্থ হইব?

হে প্রভু! তোমার আশীর্ব্বাদ, তোমার সহায়তা সকল কার্য্যে চাই। অটল বিশ্বাসে, অটল প্রেম ও ভক্তিভরে তোমাকে পূজা করিতে শিখিলে আমরা প্রত্যেক কার্য্যে তোমার সহানুভূতি পাইব। সহাস্য বদনে আমাদের দিকে একবার ফিরিয়া চাও, তাহা

হইলেই আমরা পরম কৃতার্থ হইব। কোন্ মুখ হইয়া ধ্যান করিলে, তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাইব, সেই মুখ করিয়া আমাদিগকে বসাইয়া দাও। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, যে দিকে ফিরি সেই দিকেই যেন তোমাকে দেখি। যেমন শত সহস্র বারিধারায় অঙ্গ বিধৌত হইলে প্রতি লোমকূপ পরিষ্কার হইয়া খুলিয়া যায় এবং শরীরে নির্ম্মল রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ শত সহস্র নাম জপ করিয়া অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলে হৃদয়ে বিমল অমৃত রসের সঞ্চার হয়। তোমাকে নামের দ্বারা পূজা করিয়া তোমার প্রেমে আমাদের প্রেম ঢালিয়া দিব, তোমাকে প্রীতি উপহার দিয়া জীবন সার্থক করিব। তোমাকে যখন গুরু বলিয়া ভাবি তখন ভক্তিভরে মস্তক নত করিবার ইচ্ছা হয়। যখন পিতা মাতা বলিয়া ভাবি তখন শিশুর মত স্নেহ পাইতে কত না ইচ্ছা করে, দৌড়িয়া গিয়া তোমার ক্রোড়ে স্থান লইতে ইচ্ছা যায়। পাপভারাক্রান্ত এই মনকে তোমার নামের দ্বারা ধৌত করিয়া পুণ্যময় জীবন লাভ করিতে ইচ্ছা যায়। তোমারই ক্রোড়ে গিয়া শান্তি লইতে ইচ্ছা হয়। বন্ধুভাবে যখন তোমাকে দেখি তখন অন্তরের বন্ধু এমন আর কে আছে—কাহাকেও ত খুঁজিয়া পাই না। নামের কি মহত্ত্ব? নামের দ্বারাই তোমাকে অর্চ্চনা করিতে পারা যায়। দয়াময় নামটী উচ্চারণ করিবা মাত্র মনে কত আনন্দ ভালবাসা প্রকাশ পায়; নামেতে তুমি সুন্দর হও, তোমার জ্যোতি প্রকাশ পায়। ভালবাসার উচ্ছ্বাস হইলে কত নামে তোমাকে ডাকিতে ইচ্ছা করে—কিন্তু কিছুতেই যে তৃপ্তি নাই। তোমার নামই আমাদের মুক্তির সোপান। ফুল চন্দনের বদলে নামের দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিব। মা! তোমার নামের কত মাহাত্ম্য! তোমার নাম উচ্চারণ মাত্র মনে হয় যেন সকল অপবিত্রতা দূর হইয়া গিয়াছে। নামের কল্যাণে আত্মা পরমাত্মার মিলন সংঘটিত হয়। নামের বলে অবিশ্বাস সন্দেহ কিছু মাত্র থাকে না, সকল অমঙ্গল দূর হইয়া যায়। হে বিশ্বকর্ম্মা! তোমার সৃষ্টি-কৌশল অনন্ত: সৃষ্টি রচনায় তোমার মঙ্গল ভাব নিহিত। হে মহদ্ভয়! তোমার মহিমা সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক, তোমার নামে তোমার যশোগানে পৃথিবী ধ্বনিত হউক।

## নানা কথা।

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তর শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের পরলোকগতা জননীর আদ্য-শ্রাদ্ধোপলক্ষে আদি ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী, নববিধান হইতে বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র এবং সাধারণ সমাজ হইতে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ আহূত হইয়াছিলেন। প্রারম্ভে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সুমধুর কণ্ঠে একটি সঙ্কীর্ত্তন করিলে সকলেই ব্রহ্মভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েন। পরে তত্ত্বভূষণ মহাশয় অতি গভীররূপ আত্ম-সমাধানের সহিত ব্রহ্মোপাসনা শেষ করিলেন। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ সুন্দরীবাবু তাঁহার পরলোকগতা জননীর সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। পরে শাস্ত্রী মহাশয় শ্রাদ্ধকালের পাঠ্য কঠোপনিষদের তিন অধ্যায় পাঠ করিলে শ্রাদ্ধ কার্য্য শেষ হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রাদ্ধকর্ত্তা আমাদের সমাজে ১০৲ টাকা সাহায্য দান করিয়াছেন।

## ১৮৩০ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য প্রাপ্তিস্বীকার।

| | | | |
|---|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত | প্যারীমোহন রায় | কলিকাতা | ২৲ |
| ,, | গোবর্দ্ধন শীল | চন্দননগর | ৫৲ |
| ,, | হৃদয়নাথ আচার্য্য | কাউরেড | ৩৶০ |
| ,, | আশুতোষ চক্রবর্ত্তী | কলিকাতা | ৪৲ |
| ,, | রমণীমোহন রায় | কাকিনা | ১০৵০ |
| ,, | লালবিহারী বড়াল | হুগলী | ৬৷৵০ |
| ,, | তুলসীদাস দত্ত | কালীঘাট | ৩৷৵০ |
| ,, | শ্যামলাল সরকার | কলিকাতা | ৩৲ |
| ,, | হরকুমার সরকার | ঘোড়ামারা | ৩৷৵০ |
| ,, | গোকুলচন্দ্র ধর | ত্রিবেণী | ৩৶০ |
| ,, | ষষ্ঠীচন্দ্র নন্দী | কলিকাতা | ৩৶০ |
| ,, | অন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | উত্তরপাড়া | ১৶০ |
| ,, | অবিনাশচন্দ্র দত্ত | কলিকাতা | ২৶০ |
| ,, | এন্, সি, সেন | আলিপুর | ৩৶০ |
| ,, | দিগম্বর দত্ত | ক্ষীরপাই | ৫৲ |
| ,, | নৃত্যগোপাল বসু | কলিকাতা | ৯৸৵০ |
| ,, | পঞ্চানন মিশ্র | মেদিনীপুর | ১৲ |
| ,, | হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় | কুচবিহার | ১৷৷০ |
| ,, | মহেন্দ্রনাথ সেন | ডিব্রুগড় | ৫৲ |
| ,, | দুর্গারাম বসু | তমলুক | ১২৲ |
| ,, | গৌরলাল রায় | কাকিনা | ৬৷৵০ |
| ,, | কীর্ত্তিরাম বড়ুয়া | শিলং | ৫৲ |

নব বর্ষের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী | ২৲ |
| ,, সুহাসিনী দেবী | ১৲ |

## বিজ্ঞাপন।

আগামী ৯ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি সাড়ে সাতটার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তপঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।
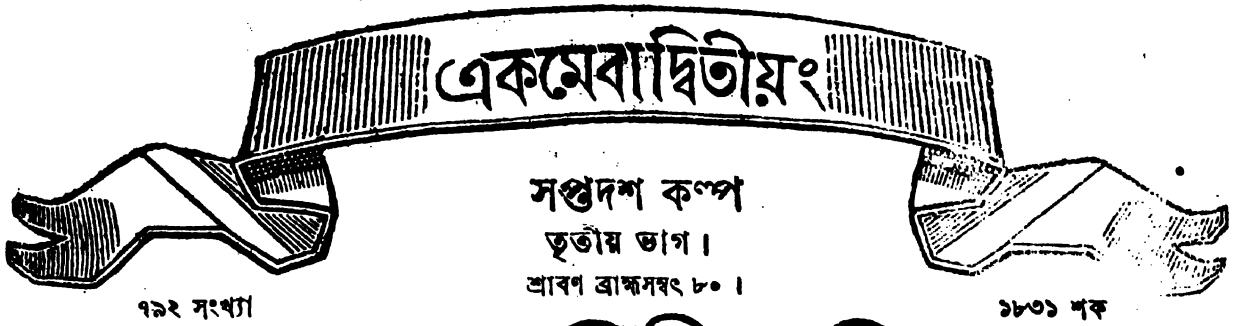
শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

৭৯২ সংখ্যা    শ্রাবণ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।    ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা


"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## নব-বর্ষের উপদেশ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ১লা বৈশাখ বুধবার বেদী হইতে প্রদত্ত উপদেশ।

ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্য যে অদ্য নব বৎসরের প্রথম সায়ংকালেই আমরা আমাদের সাপ্তাহিক উপাসনার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাতঃকালে আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া সম্বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবনে পবিত্রতা লাভ করিবার জন্য যাচ্ঞা করিয়াছি। আবার এই সায়ংকালে তাঁহার পবিত্র উপাসনার অবসর প্রাপ্ত হইলাম। এখন আমরা তাঁহার নিকটে কি ভিক্ষা করিব? ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মোপাসনার ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাত্মজ্ঞান উপার্জ্জনের ধর্ম্ম। এই ত্রিবিধ উপায় উপার্জ্জনের জন্য আমরা আজ ঈশ্বরের নিকটে শক্তি ভিক্ষা করিব। তিনি দাতা, তিনি ধাতা, তিনি বিধাতা। আমাদের সাধনের মূলে যদি তাঁহাকে লক্ষ্য না করিতে পারি, তবে আত্মা কোথা হইতে সাধন-বল লাভ করিবে। তাঁহাতে চিত্ত সমাধান করিতে পারিলেই তিনি আমাদের লক্ষীভূত হইয়া স্বীয় বলে আমাদিগকে বলীয়ান করিবেন। সেই বলই আমাদের ধর্ম্মসাধনের সহায়। মহর্ষিদেব বলিয়াছেন, "আমারদের আপনার আপনার যত্ন সহকারে ধর্ম্মপথে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা অবস্থার দাস না হইয়া যাই, প্রবৃত্তির স্রোতেই তৃণের ন্যায় নীয়মান না হই—কালের গতিতেই গমন না করি—আপনার প্রতি আপনি প্রভু থাকিয়া ঈশ্বরের পথে পদার্পণ করি, দিনে নিশীথে আপনার পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার মঙ্গল-মূর্ত্তি দেখিতে পাই; এই জন্য আমাদের নিয়তই যত্ন ও চেষ্টা করা আবশ্যক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রসন্নতা ভিন্ন আমাদের ক্ষুদ্র চেষ্টায় কি হইবে?" এই জন্যই ব্রহ্মোপাসনার মূলে চিত্ত সমাধানের প্রয়োজন হইয়াছে। কেবলি উপাসনার সময়ে নহে কিন্তু অহরহ, দিনে নিশীথে কর্ম্মে ও বিশ্রামে তাঁহাতে চিত্ত সমাধান চাই। গঙ্গাদি নদী পৃথিবীর ভূমি সকলকে উর্ব্বরা করিয়া এবং পিপাসিত কাতর জনকে সুশীতল বারি দানে স্নিগ্ধ করিয়া

সাগর সঙ্গমে চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু নির্ঝর নিকরের সহিত যদি মূলে তাহাদের যোগ না থাকিত তবে সে প্রবাহ, সে শক্তি, এবং সেই পুণ্য-কর্ম্ম সাধনের সফলতা কি প্রকারে তাহারা প্রাপ্ত হইত? সেই রূপ আমরা এই ঈশ্বরের বিচিত্র সুন্দর সৃষ্ট সংসারে কর্ম্মকর্ত্তা রূপে তাঁহারই দ্বারা আদিষ্ট হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এই সংসারে আমাদের বহু এবং বিবিধ কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। স্ত্রীগণকে লক্ষ্মী স্বরূপিনী ও সহধর্ম্মিণী করিয়া সংসারের শোভা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা, পুত্রগণ ও কন্যাগণকে জ্ঞান শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবনকে উন্নতির পথে উপনীত করা, বন্ধু ও প্রতিবাসীগণের প্রতি প্রীতি দানে তাঁহাদের প্রীতি আকর্ষণ পূর্ব্বক জনপদের শান্তি রক্ষা করা এবং অন্যবিধ বহু কর্ত্তব্য আমাদের এখানে সাধন করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা আত্মার আত্মা সেই পরমাত্মা হইতে তাঁহার সর্ব্বগুণময় ভাব আকর্ষণ না করিতে পারি তবে কি প্রকারে আমরা আমাদের কর্ত্তব্য পালনে সফলতা লাভ করিতে পারি? তিনি আমাদের সকল শক্তির মূল, তাঁহাকে লাভ করা চাই। কিন্তু তাঁহার প্রসন্নতা ভিন্ন তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য নিষ্কাম প্রীতির সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা চাই। যখন ঈশ্বরের জন্য আমাদের একটি গভীর অভাব বোধ হয়—আর কিছুতেই আত্মা তৃপ্ত হয় না; যখন সকল সম্পত্তির মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অভাবে শোক-সাগরে নিমগ্ন হই, তখন তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করি, তুমি হৃদয়ে আসীন হও—আসীন হইয়া আমাদের তাপিত হৃদয়কে শীতল কর। সংসার যখন আমাদের হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না, সংসারের সম্পত্তি বিপত্তি বলহীন হয়—যখন তাঁহাকে না পাইয়া শরীরে আরাম থাকে না, মনের প্রসন্নতা থাকে না; তখন সে ঘন বিষাদ-অন্ধকারের পরপারে তাঁহার মুখজ্যোতি লাভ করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করি, তাঁহার নিকটে ক্রন্দন করি, তাঁহাকে আহ্বান করি। এই প্রকারে যখন আমরা ব্যাকুল হই; তখন তিনি আমাদের আন্তরিক প্রার্থনানুরূপ ফল প্রদান করেন—আপনাকে দিয়া আমাদের হৃদয় পূর্ণ করেন। প্রার্থনাই আমাদের বল, যেমন বালকের বল মাতার নিকটে ক্রন্দন। যদি আমরা কিছুই না পারি, তথাপি আমাদের আশা, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের অভাব সেই বাঞ্ছা-কল্পতরুর পদতলে আনিয়া অর্পণ করিতে পারি। আমরা যাহা বলি, তিনি তাহা শ্রবণ করেন, তিনি অমৃত প্রেরণ করেন, আমাদের আত্মা সেই অমৃত পান করিয়া দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ হইয়া অনন্ত মঙ্গলের পথে চলিবার উপযুক্ত হইতে থাকে। বৈদিক যজ্ঞ কালে যখন সপ্ত হোতা যেমন বলিতেন, সেই এই নব বৎসরের সায়ংকালে এই ব্রহ্মমন্দিরে বসিয়া আমরাও সমস্বরে বলি,

"তস্মিন্তসহস্রশাখে নিভগাহং ত্বয়ি মৃজে স্বাহা।"

হে সহস্রশাখ ভগবান্ আমরা আজ সকলে একত্র হইয়া সকল পরিবারের সহিত এবং সকলের শরীর মন আত্মার সহিত তোমাতে নিমজ্জিত হই।

"হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। আমরা বিষয় বিভবের নিমিত্তে তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? সমস্ত দিবস, সমস্ত রজনী তোমার করুণা তো আমাদের শরীর

ও মন পোষণ করিতেছে। সম্পত্তি বিপত্তি সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কার তোমার হস্ত হইতেই প্রেরিত হইয়া নিয়ত আমাদের মঙ্গল ও উন্নতি সাধন করিতেছে। যে অবধি জীবন ধারণ করিয়াছি, সেই অবধিই তোমার করুণা তুমি মুক্ত হস্তে বিতরণ করিতেছ। অতএব তোমার নিকটে কি প্রার্থনা করিব? তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা, তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক, জগতের মঙ্গল হউক। আমাদের কিসে কল্যাণ, কিসে বিপর্য্যয় হয় আমরা তাহার কিছুই জানি না, তাহা তুমিই জান। কিন্তু তোমার প্রসাদে এই সত্যটি জানিয়াছি যে তোমাকে লাভ করিতে পারিলে আমাদের সকল মঙ্গল ও সকল সম্পত্তি লাভ হয়। যদি সমুদয় বিষয় বিভব, মান সম্ভ্রম, প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া তোমাকেই পাওয়া যায়, তবে তাহাই মঙ্গল; তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি সমুদয় পৃথিবীর রাজাও হই, তবে তাহা হইতে আর অমঙ্গল কিছুই নাই। তুমি হৃদয়ে আইলে আমাদের সকল মঙ্গল লাভ হয়। অতএব তোমার নিকটে আমরা এই বর চাই—"আবিরাবীর্ম্মএধি" তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

## মঙ্গল।

### চতুর্থ উপদেশ।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।)

এ পর্য্যন্ত আমরা কি করিয়াছি? কোন ভৌতিকতত্ত্ববেত্তা কিংবা কোন রাসায়নিক পণ্ডিত যেরূপ কোন সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বিশ্লিষ্ট করিয়া আবার তাহার মূল উপাদানে ফিরাইয়া আনেন, আমরা কতকটা সেইরূপ করিয়াছি। এই মাত্র প্রভেদ, আমরা যে ব্যাপারের বিশ্লেষণ করিয়াছি তাহা আমাদের বাহিরে নহে—তাহা আমাদের অন্তরে অবস্থিত। তাছাড়া, বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটা উভয়ক্ষেত্রে একই প্রকার। উহার মধ্যে কোন ঘর-গড়া মত কিংবা মানিয়া-লওয়া সিদ্ধান্ত নাই; উহাতে কেবল প্রত্যক্ষ পরীক্ষার কথাই আছে।

এই পরীক্ষাকে আরও দৃঢ়নিশ্চয় করিবার জন্য, আর একটু রকম-ফের করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যের কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ যখন আমরা দর্শন করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা পরীক্ষা না করিয়া,—আমরা নিজে যখন কোন ভাল কিংবা মন্দ কাজ করি তখন আমাদের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহাই আমাদের অন্তরাত্মাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাক্। এইরূপ স্থলে নৈতিক ব্যাপারের বিচিত্র উপাদানগুলি আরও স্পষ্টরূপে আমাদের চোখে পড়িবে এবং উহাদের পারম্পর্য্যও আমাদের নিকট সমধিক প্রকাশ পাইবে।

মনে কর, আমার কোন বন্ধু মৃত্যুকালে কিছু টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া আমাকে বলিয়া গেলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ টাকা অমুক ব্যক্তিকে যেন দেওয়া হয়; টাকাটা যাঁহার নামে দিয়া গেলেন, তিনিও জানেন না যে ঐ টাকা তাঁহার প্রাপ্য। তাহার পর যিনি আমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন তাঁহার মৃত্যু হইল; তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত কথাটিও চলিয়া গেল। যাঁহার জন্য এই টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে, তিনি

তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না; এখন আমি যদি এই টাকা আত্মসাৎ করি, কেহই আমাকে সন্দেহ করিতে পারে না। এই অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য? দুষ্কর্ম্ম করিবার এমন সুযোগ মনে কল্পনা করাও কঠিন। শুধু যদি আমার স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিতে আমি একটুও ইতস্তত করিব না। যদি ইতস্তত করি, তাহা হইলে স্বার্থবাদিদিগের মতে আমি একজন বাতুল, আমার নিজের প্রকৃতির নিকট আমি বিদ্রোহী। আমি ইহার জন্য দণ্ডিত হইব না নিশ্চয় জানিয়াও তবু যে আমার মনে একটু ইতস্তত হইতেছে ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, স্বার্থবুদ্ধি হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে নিহিত আছে।

কিন্তু স্বভাবত আমার মনে কোন দ্বিধা হয় না; আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে টাকা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে তাহা আমার নহে, তাহা অন্যের। স্বার্থকে অপসারিত করিলে, ঐ গচ্ছিত টাকা আত্মসাৎ করিবার কথা আমার মনেও আসিবে না; কেবল স্বার্থ বুদ্ধিই আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে, স্বার্থবুদ্ধিই আমাকে পাপের পথে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে, আমি তাহাকে ঠেকাইতে পারিতেছি না। উহা হইতেই, স্বার্থবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া যায়; এই সংগ্রামটা কি কষ্টপ্রদ; এই সংগ্রামে আমাদের কত সঙ্কল্পের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে—কত প্রতিজ্ঞা করিয়া আবার তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সংগ্রাম হইতেই বেশ বুঝা যায়, স্বার্থ হইতে ভিন্ন আর একটি প্রবৃত্তি আমাদের অন্তরে অধিষ্ঠিত আছে, এবং সেই প্রবৃত্তিটি স্বার্থেরই ন্যায় বলবতী।

অবশেষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরাভূত হইল, স্বার্থই জয়ী হইল। আমি সেই গচ্ছিত টাকা ভাঙ্গিয়া আমার অভাব, আমার পরিবারবর্গের অভাব পূর্ণ করিলাম। আমি ধনশালী ও বাহ্যতঃ সুখী হইলাম। কিন্তু আমি মনে মনে অনুতাপের তীব্র যাতনা অনুভব করিতে লাগিলাম। অনুতাপ বলিয়া যে একটা জিনিস আছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার কথা অনেকবার বলা হইয়াছে। ইহার প্রতিরূপ শব্দ সকল ভাষাতেই আছে। এমন লোক নাই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুতাপ অনুভব করে নাই। যতক্ষণ না অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হয় ততক্ষণ হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে। আমার সুখ সৌভাগ্যের মধ্যেও আমার দুষ্কৃতির স্মৃতি আমাকে অনুসরণ করে; লোকের স্তুতিবাদ, এই দুর্নিবার সাক্ষীর মুখ বন্ধ করিতে পারে না। যদি এই অনুতাপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অপরাধীর আর কোন উপায় থাকে না—সে একেবারে অধঃপাতে যায়, তাহার আধ্যাত্মিক জীবন বিনষ্ট হয়। যতক্ষণ হৃদয়ে অনুতাপের অনুভূতি থাকে, ততক্ষণ জানা যায়, হৃদয়ের স্বর্গীয় অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হয় নাই।

অনুতাপ একটা বিশেষ প্রকারের কষ্ট। অমুক অমুক বিষয় আমার ইন্দ্রিয়ের উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, কিংবা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলা বাধা প্রাপ্ত হইয়াছে, কিংবা আমার স্বার্থহানি হইয়াছে, কিংবা আমার হৃদয় আশা ও আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছে—এই সকল কারণে আমি অনুতাপের কষ্ট ভোগ করি না; এই কষ্ট বাহির হইতে আইসে না, তথাপি ইহার মত দারুণ কষ্ট আর নাই। আমি শুধু এই জন্যই কষ্ট পাই যে, আমি জানিয়া বুঝিয়া

একটা খারাপ কাজ করিয়াছি, সে কাজ আমি না করিলেও করিতে পারিতাম, এবং তাহার দণ্ড স্বরূপ আমি কষ্ট ভোগ করিতেছি, এবং ইহাও জানি আমি এই দণ্ডের উপযুক্ত পাত্র। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, এই অনুতাপের মধ্যে ভালমন্দের জ্ঞান, একটা অবশ্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্মের নিয়ম, স্বাধীনতা ও পাপপুণ্যের ধারণা নিহিত আছে। কার্য্যকালে এই সকল ভাবের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিতেছিল, অনুতাপকালে সেই সকল ভাব আবার আবির্ভূত হয়। সেই গচ্ছিত টাকা হরণ করিবার জন্য স্বার্থ আসিয়া আমাকে কত পরামর্শ দিল; কিন্তু কে যেন আমাকে বলিয়া দিল, গচ্ছিত ধন অপহরণ করা একটা অন্যায় কাজ; আমি যে এই কাজকে অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করি তাহা শুধু আজিকে নহে, চিরকালই এইরূপ মনে করি; শুধু যে এই অবস্থায় কিংবা ঐ অবস্থায় অন্যায় বলিয়া মনে করি তাহা নহে, সকল অবস্থাতেই অন্যায় বলিয়া মনে করি। যাহাকে এই গচ্ছিত ধন ফিরাইয়া দিতে হইবে, তাহার ঐ ধনে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে—আমাকে এ কথা বলা বৃথা। আমার বিবেচনায় গচ্ছিতধন ফিরাইয়া দেওয়া আমার পক্ষে একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য ও ঐকান্তিক কর্ত্তব্য। আমি ইচ্ছা করিলে উহা ফিরাইয়া দিতে পারি কিংবা নাও পারি—এই জ্ঞানটি থাকাতেই,—আমি উহা ফিরাইয়া না দিলে, আপনাকে দণ্ডার্হ বলিয়া বিবেচনা করি, আমার নিজের উপর একটা ধিক্কার উপস্থিত হয়, আমার হৃদয়ে অনুতাপের যন্ত্রণা হয়। এই অনুতাপের মধ্যেই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারটা আবদ্ধ, এবং এই অনুতাপের দ্বারাই সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের সম্যক ব্যাখ্যা হইতে পারে।

পরীক্ষা পদ্ধতির নিয়মানুসারে, ইহার উল্টা প্রকরণটা কি, তাহাও একবার দেখা যাক্; আবার উল্টা দিকটা মনে করা যাক্;—স্বার্থের প্ররোচনা সত্ত্বেও, দুঃখ দৈন্যের সমস্ত কষ্ট সত্ত্বেও,—সত্য রক্ষার জন্য, ঐ গচ্ছিত ধন আমি যথাপাত্রে প্রত্যর্পণ করিলাম; তখন অনুতাপের পরিবর্ত্তে আর এক প্রকার ভাব আমার অন্তঃকরণে আবির্ভূত হইল। আমি জানি আমি ভাল কাজ করিয়াছি; আমি জানি, আমি কোন কৃত্রিম মিথ্যা নিয়মের অনুসরণ করি নাই, কাল্পনিক নিয়মের অনুসরণ করি নাই, পরন্তু এমন একটা নিয়মের অনুসরণ করিয়াছি যাহা সত্য, যাহা সার্ব্বভৌম, যাহা সমস্ত বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন স্বাধীন জীব মাত্রই অনুসরণ করিতে বাধ্য। আমি জানি, আমি আমার স্বাধীনতার সুব্যবহার করিয়াছি। এই স্বাধীনতার কার্য্য হইতে, আমার মনে একটা অপূর্ব্ব ভাব, একটা জয়োল্লাসের ভাব আবির্ভূত হয়। অনুতাপের পরিবর্ত্তে আমি একটা অনুপম আনন্দ অনুভব করি, এই আনন্দ আমার কিছুতেই অপনীত হইবার নহে; আমার যদি আর কিছুই না থাকে, এই আনন্দ আমাকে সান্ত্বনা দিবে, আমাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবে। এই সুখের ভাবটি অনুতাপের মতই মর্ম্মস্পর্শী ও সুগভীর। সমস্ত উচ্চবৃত্তির সহিত বিদ্রোহ করিবার ফলে মানব হৃদয়ে যেমন অনুতাপ প্রসূত হয়, সেইরূপ সমস্ত উচ্চবৃত্তির চরিতার্থতায় এইরূপ আত্মপ্রসাদ উৎপন্ন হয়।

নৈতিক ভাব—সমস্ত নৈতিক বিচারক্রিয়া ও সমস্ত নৈতিক জীবনের প্রতিধ্বনি মাত্র। উহা প্রথমেই চখে পড়ে বলিয়া,

খুব তলাইয়া না দেখিলে,উহাই সমগ্র নীতির ভিত্তি বলিয়া সহসা মনে হইতে পারে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, বিচারক্রিয়া ব্যতীত এই নৈতিক ভাব উৎপন্ন হয় না। ভাবটি নীতির মূলতত্ত্ব নহে, পরন্তু উহা মানসিক বিচারের পরিণাম; বিচারক্রিয়া নীতি নহে, পরন্তু বিচারক্রিয়া নৈতিক ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা—এইরূপ বুঝায়।

মানব-নীতিতন্ত্রের সমস্ত উপাদানগুলিই এখন আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; এখন এই প্রত্যেক উপাদানকে আমরা পৃথক্‌রূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

যে জটিল ব্যাপারটি আমরা এতক্ষণ আলোচনা করিলাম, তাহার মধ্যে নৈতিক ভাবটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষগোচর; কিন্তু এই নৈতিক ভাবের মূলে বিচারক্রিয়া অবস্থিত।

বিচার করিয়াই আমরা ভাল মন্দ নির্দ্ধারণ করি এবং বিচারক্রিয়াই সমস্ত ভালমন্দের মূলতত্ত্ব; কিন্তু সত্য ও সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তের ন্যায়, মঙ্গল সম্বন্ধীয় বিচার-সিদ্ধান্তও মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক গঠনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচার ক্রিয়ার মত, এই বিচার ক্রিয়াটিও সহজ, আদিম, মৌলিক, ও অবিশ্লেষ্য।

উহাদেরই মত, এই বিচারসিদ্ধান্তও আমাদের ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে। কতকগুলি ক্রিয়া বিদ্যমানে, ঐ সম্বন্ধে আমরা একটা বিচারসিদ্ধান্ত না করিয়া থাকিতে পারি না; সেই সিদ্ধান্ত করিবার সময়ে ইহাও জানি, সেই বিচার-সিদ্ধান্তটাই ভাল মন্দের স্বরূপ নহে, পরন্তু ঐ বিচার-সিদ্ধান্ত কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তাহাই বলিয়া দেয় মাত্র। এই বিচার সিদ্ধান্তের দ্বারাই নৈতিক ভেদাভেদের বাস্তবতা প্রকাশিত হয়; কিন্তু সৌন্দর্য্যতত্ত্ব যেমন দর্শকের নেত্র হইতে স্বতন্ত্র, যেমন সার্ব্বভৌম ও অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি সত্যের প্রকাশক জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ মঙ্গলের বিচার-সিদ্ধান্তও মঙ্গল হইতে স্বতন্ত্র।

(ক্রমশঃ)

---

## মার্কস্ অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

জগতের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ তাহার পূজাতেই আপনাকে নিয়োগ করিবে। সেটি কোন্ পদার্থ?—তিনি সেই পরম পুরুষ যাঁহার দ্বারা সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত ও পরিশাসিত হইতেছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকে যেমন তুমি পূজা করিয়া থাক, সেইরূপ তোমার অন্তরের মধ্যে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহাকেও তোমার পূজা করা কর্ত্তব্য, তাহা পরমদেবতারই কাছাকাছি। সেটি যে তোমার অন্তরের প্রভু, তোমার কার্য্য ও ভাগ্যের কর্ত্তা—তাহা তাহার কার্য্যগুণেই প্রকাশ পায়।

জগতের অনিত্যতা সম্বন্ধে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে,—কত শীঘ্র প্রকৃতির দৃশ্যসমূহ পরিবর্ত্তিত হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবে। ভৌতিক জগৎ নিত্য নিয়ত আবর্ত্তিত হইতেছে। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তনের কার্য্য চলিতেছে —কার্য্যকারণের মধ্য দিয়াই সেই পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তাহার কোন স্থায়িত্ব নাই। তাহার পর, আমাদের খুব নিকটেই, অতীত ও ভবিষ্যৎরূপ দুইটা রসাতল মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে—তাহার অভ্যন্তরে সমস্ত পদার্থ অন্তর্হিত হইতেছে। অতএব সে কি মূঢ় যে এই সমস্ত ক্ষণিক পদার্থের জন্য গর্ব্বিত হয়, উদ্বিগ্ন হয়, দুঃখিত হয়—হায়! যেন এই সমস্ত পদার্থ চিরকাল থাকিবে।

মনে রাখিবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়

তুমি একটি পরমাণু অপেক্ষাও ক্ষুদ্র; তোমার ভাগ্যে যে কালাংশ পড়িয়াছে তাহারও কি অপরিমেয় স্বল্পতা, এবং অদৃষ্ট-রাজ্যের মধ্যেও তুমি কি নগণ্য!

তোমার দৈহিক অনুভূতিসমূহ প্রীতিজনকই হউক, বা অপ্রীতিজনকই হউক, তোমার অন্তরে যে কর্ত্তৃপুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন—সেই সকল অনুভূতির সহিত যেন তাঁহার বিশেষ কোন সংস্রব না থাকে। দেহের বিশেষ বিশেষ অংশের অনুভূতি সেই সেই অংশের মধ্যেই বদ্ধ থাকুক; তোমার মন যেন তাহাদের হইতে তফাতে থাকে,—তাহাদের সহিত যেন মিশ্রিত না হয়। এ কথা সত্য, সমবেদনার নিয়ম-প্রভাবে আমরা দেহের প্রত্যেক অংশের বেদনা ন্যূনাধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া থাকি; কেন না প্রকৃতির নিয়মকে একেবারে অতিক্রম করা যায় না। তবে, দৈহিক অনুভূতি একেবারে নিবারণ করিতে না পারিলেও, উহাকে অতিমাত্র প্রাধান্য দেওয়া কিংবা উহাকে আমাদের ভাল মন্দের প্রধান হেতু বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে।

দেবতাদিগের সহিত আমাদের একত্র বাস করা উচিত। তিনিই দেবতাদিগের সহিত বাস করেন যিনি বিধাতার বিধানে নিত্য তুষ্ট এবং যিনি সেই অন্তর্দেবতার আজ্ঞা পালন করেন যে দেবতা বিধাতারই প্রতিনিধি ও ঈশ্বরের আত্মজ। এই দেবতা আর কেহই নহেন—ইনি সেই অন্তরাত্মা—সেই বিবেকবুদ্ধি যাহা সকলেরই আছে।

মনে করিয়া দেখিবে, দেবতাদিগের প্রতি, পিতামাতার প্রতি, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি, স্ত্রীপুত্রের প্রতি, শিক্ষকের প্রতি, বন্ধুর প্রতি, ভৃত্যের প্রতি তুমি বরাবর কিরূপ ব্যবহার করিয়াছ। লোকে তোমার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারে কি না,—"ও ব্যক্তি কার্য্যে কিংবা বাক্যে কাহারও কোন অনিষ্ট করে নাই।" আরও মনে করিয়া দেখিবে, কি পরিমাণ কাজ তুমি করিয়াছ, এবং তাহা সমাধা করিবার জন্য তোমার যথেষ্ট বল ও দৃঢ়তা ছিল কি না; তোমার কার্য্য যদি শেষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার জীবনের ইতিহাসও শেষ হইয়াছে জানিবে। আরও মনে করিয়া দেখিবে, কত সুন্দর দৃশ্য তুমি দেখিয়াছ, কত সুখ দুঃখ তুমি অবজ্ঞা করিয়াছ, কত যশকীর্ত্তি তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, এবং অপকারী ব্যক্তির কত উপকার করিয়াছ।

তুমি শীঘ্রই ভস্ম ও কঙ্কালে পরিণত হইবে। পৃথিবীতে হয় ত তোমার নাম থাকিয়া যাইবে কিংবা যাইবে না। কিন্তু নাম জিনিস্‌টা কি? ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। তার পর, এ সংসারে যে সকল জিনিসের খুব আদর সে সমস্তই শূন্যগর্ভ, অসার, গলিত, ও অকিঞ্চিৎকর। ইহা কুকুরের হাড়-কাড়াকাড়ির মত; ইহা ছেলেদের খেলনা কাড়াকাড়ির মত—তাহারা পাইলে উৎফুল্ল হয়, আবার না পাইলে অশ্রুজলে ভাসে। তবে, এই পৃথিবীতে, কোন্ জিনিস্ তোমার অবলম্বন হইতে পারে? যদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল ভাসমান ও পরিবর্ত্তনশীল হয়, যদি ইন্দ্রিয়গণ কুয়াসাচ্ছন্ন ও ভ্রম-প্রবণ হয়, যদি অন্তঃকরণ রক্তমাংসেরই রূপান্তরমাত্র হয়, এবং ক্ষুদ্র মানুষের নিন্দাপ্রশংসা যদি নিতান্তই তুচ্ছ জিনিস হয়—আমাদের অবস্থা যদি বাস্তবিকই এইরূপ হয়, তবে যতক্ষণ না তোমার প্রাণবায়ু দেহ হইতে অপসারিত হইতেছে ততক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে একটু অপেক্ষা করিয়া থাক না কেন;—কিন্তু ততক্ষণ আমি কি করিব? ইহার

সহজ উত্তর এই—দেবতাদের পূজা কর, দেবতাদের মহিমা কীর্ত্তন কর; মানুষের উপকার কর; এবং সকলের শেষে এই কথাটি মনে রাখিও, তোমার রক্তমাংস ও নিঃশ্বাসের বাহিরে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা তোমার নহে, তোমার আয়ত্তাধীন নহে।

তুমি যদি কোন কাজ ভাল করিয়া আরম্ভ কর, এবং যদি তোমার চিন্তা ও কার্য্যকে সুপ্রণালীক্রমে নিয়োগ কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবে। ঈশ্বর, মনুষ্য ও জ্ঞানবান জীবমাত্রেরই অন্তরে দুইটি তত্ত্ব বিদ্যমান;—একটি,—বাহ্য বিষয়ের বাধা না মানা; আর একটি—সাধুভাব ও সাধু কার্য্য আর কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখে না, উহারা আপনারাই পরম সন্তোষের হেতু—এই কথাটি উপলব্ধি কর।

---

## মনুর উপদেশ।

### আত্মার গুণত্রয়

সত্ত্বংরজস্তমশ্চৈব ত্রীন্ বিদ্যাদাত্মনোগুণান্
যৈর্ব্যাপ্যেমান্ স্থিতো ভাবান্মহান্ সর্ব্বানশেষতঃ॥

সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনটি আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে। এই স্থাবর জঙ্গমরূপ সমস্ত পদার্থে এই তিনগুণ নিঃশেষে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যেনাতিরিচ্যতে
সতদা তদ্গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণাম্॥

এই সকল গুণের মধ্যে যে গুণ দেহের মধ্যে সাকল্যে অধিক থাকে, সেইগুণ সেই দেহের দেহিকে তদ্গুণপ্রায় করিয়া থাকে।

সত্ত্বং জ্ঞানং তমোঽজ্ঞানং রাগদ্বেষৌ রজোস্মৃতম্
এতদ্ব্যাপ্তিমদেতেষাং সর্ব্বভূতাশ্রিতং বপুঃ॥

সত্ত্বগুণে জ্ঞান, তমোগুণে অজ্ঞান রজোগুণে রাগদ্বেষ লক্ষিত হয়। সর্ব্বভূতাশ্রিত দেহ ব্যাপিয়া এই সকল গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

তত্রযৎ প্রীতিসংযুক্তং কিঞ্চিদাত্মানি লক্ষয়েৎ
প্রশান্তমিব শুদ্ধাভং সত্ত্বং তদুপধারয়েৎ॥

আত্মাতে প্রীতিযুক্ত, শুদ্ধাভ, ও প্রশান্তবৎ কিঞ্চিৎ যাহা লক্ষিত হয় তাহাকে সত্ত্ব বলিয়া অবধারিত করিবে।

যৎ তু দুঃখসমাযুক্তমপ্রীতিকরমাত্মনঃ
তদ্রজোঽপ্রতিঘং বিদ্যাৎ সততং হারী দেহিনাম্॥

যাহা দুঃখসমাযুক্ত ও আত্মার অপ্রীতিকর এবং যাহা দেহিদিগের চিত্তহারী সেই অপ্রতিঘ অর্থাৎ দুর্নিবার গুণকে রজ বলিয়া জানিবে।

যৎ তু স্যান্মোহসংযুক্তমব্যক্তং বিষয়াত্মকম্
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং তমস্তদুপধারয়েৎ॥

যাহা মোহসংযুক্ত, অব্যক্ত, বিষয়াত্মক, অতর্কনীয় ও দুর্জ্ঞেয় তাহাকেই তম বলিয়া অবধারিত করিবে।

বেদাভ্যাসস্তপো জ্ঞানং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ
ধর্ম্মক্রিয়া আত্মচিন্তা চ সাত্ত্বিকং গুণ লক্ষণম্॥

বেদাভ্যাস, তপস্যা, জ্ঞান, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম, ধর্ম্মানুষ্ঠান ও আত্মচিন্তা—এই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য।

আরম্ভরুচিতা ধৈর্য্যমসৎকার্য্য পরিগ্রহঃ
বিষয়োপসেবা রাজসং গুণলক্ষণম্॥

কার্য্যারম্ভে আসক্তি, অধৈর্য্য, অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, বিষয়সেবা-ইহাই রজোগুণের লক্ষণ।

যৎকর্ম্ম কৃত্বা কুর্ব্বংশ্চ ভবিষ্যংশ্চৈব লজ্জতি
তদ্জ্ঞেয়ং বিদুষা সর্ব্বং তামসং গুণ লক্ষণম্।

যে কর্ম্ম করিয়া ও যে কর্ম্ম করিবার সময়, এবং যে কর্ম্ম করিতে গেলে লজ্জা উপস্থিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে তমোগুণ-লক্ষণ বলিয়া জানেন।

যেনাস্মিন্ কর্ম্মনা লোকে খ্যাতি মিচ্ছতি পুষ্কলাম্
ন চ শোচত্যসম্পত্তৌ তদ্বিজ্ঞেয়ন্তু রাজসম্॥

ইহলোকে মহতী খ্যাতি প্রত্যাশায় যে কর্ম্ম করা হয় এবং যে কর্ম্মের অসমাপ্তিতে দুঃখানুভব হয় না, তাহাকে রজো বলিয়া জানিবে।

যৎসর্ব্বৈনেচ্ছতি জ্ঞাতুং যন্ন লজ্জতি চাচরন্‌
যেন তুষ্যতি চাত্মস্য তৎসত্ত্বগুণ লক্ষণম্‌॥

যাহা সকলে জানিতে ইচ্ছা করে, যাহা করিয়া লজ্জিত হইতে হয় না, এবং যাহাতে আত্মতুষ্টি হয়, তাহা সত্ত্বগুণের কার্য্য জানিবে।

তমসো লক্ষণং কামো রজস্ত্বর্থ উচ্যতে
সত্ত্বস্য লক্ষণং ধর্ম্মঃ শ্রৈষ্ঠ্য মেষাং যথোত্তরম্‌॥

তমোগুণের লক্ষণ কাম, রজোগুণের লক্ষণ অর্থ, সত্ত্বগুণের লক্ষণ ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ট—অর্থাৎ কাম হইতে অর্থ ও অর্থ হইতে ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ।

---

## PRAYERS.

### XI.

O Supreme Spirit, sorely troubled by the sorrows, the passions and the turmoil of the world I look up to Thy lofty abode on high. Thou art kind to those that are humbled by affliction, and merciful to the poor in spirit. Vouchsafe Thy mercy unto me. Thy blessings descend even on those that see Thee not, nor want to know Thee. The veriest debauchee, who devotes himself entirely to the pursuit of pleasure and money-making, in utter forgetfulness of the world to come,—even he is at times awakened to a sense of his higher destiny in the presence of death,—death which Thou sendest as Thy messenger to bring him to his right senses. He regains momentary consciousness like a man in delirium and is then able perchance to catch a glimpse of Thee in the midst of the encircling darkness. There is none in all this world who has not need of Thee, who seeks not for Thy blessing. Savage people steeped in ignorance and superstition, as also civilized nations enjoying the light of knowledge, all—all have need of Thy help and protection. Who is there that does not bow down before Thee ? Thou art the Lord of creation and monarch of all sentient beings: সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা। Thou art the Ruler of all ; Thou keepest all under the domination of Thy law—Thou maintainest all Thy creatures as their Monarch, their Governor, their Father and Mother, their Friend and Comrade. All pray to Thee with folded hands,—some pray for material gifts ; others, burning with Divine fervour, pray to Thee for Thine own Self, as the crowning gift above everything else. Some pray to Thee for the enjoyment of paradise, others for the boon of salvation. Men are inspired to pray to Thee now by fear, now by hope. In some way or other all are impelled to come before Thy Throne. O Lord my God, how manifold are the forms in which Thy mercy is manifested. How wonderful is Thy loving kindness ! My tongue refuses to give utterance to all that I feel. That mercy which I feel in my own insignificant life, the self-same mercy extends over the countless beings of Thy illimitable kingdom, and ministers to their diverse wants and aspirations. Thy mercy shows itself in the day and in the night, in the heart of the mother, and the inmost life of the Saint. O Lord, I call upon Thee with all my mind and all my heart—do Thou grant me all that may help me to worship Thee. Employ my hands in Thy work, speed my feet on Thy errands, engage my tongue in singing Thy glory, immerse my mind in Thy contemplation, and unite my soul with Thee ; let my soul find rest by resting in Thee, may it be filled with the

light of Divine Wisdom. How wonderful it is that Thou, Merciful Lord, shouldst instanty grant my prayer. I behold Thee at this very moment in my soul. I see that Thou art without form or shape ; that Thou art holy, true, and beautiful. It is by Thy ordinance that the Sun and the Moon exist, held up in space. By Thy ordinance the day and the night, the fortnight and the month, the seasons of the year come and go. By Thy ordinance the rivers flow down from snowy mountains, and speed on their courses towards the East and the West. Should a man spend his whole life in the performance of penances, and sacrificial and expiatory rites and ceremonies prescribed in the Shastras, yet know Thee not, fruitless will be his works. He who departs from the scene of this life without knowing Thee, is a pitiable creature, the lowest of the low ; but he who quits this world after knowing Thee, is the true Brâhman. Blessed art Thou, O Lord of the Universe, blessed art Thou !

XII.

O Lord our God, Thou art so near us, yet why do we deem Thee to be far away ? We take no pains to approach unto Thee, and therefore think in our foolishness that Thou regardest us not. Blind to our own supine indifference, we thoughtlessly cast reproach on Thy gracious Providence. Thou showest Thyself to us without fail whenever we long for Thee,—we seek Thee not, and therefore cannot find Thee. O God most high, may we seek Thee with all our heart, all our soul, and all our strength. —May we offer to Thee all our love. Be Thou, O Lord, graciously pleased to ordain that we may consecrate all our lives to Thy service.

XIII.

O Lord my God, illumine this our benighted Motherland. Cast Thy Look of grace on these Thy Children, who are so weak and helpless. Who else but Thou canst help this down-trodden land, which is begirt by endless troubles and calamities, and from which lamentations rise up to heaven day and night. Do Thou save our country from the depth of degradation into which it hath sunk. Send righteousness unto it, O Lord, for in righteousness is our salvation. On every soul do Thou pour down Thy waters of mercy, and reveal Thyself as our Father and our Mother, that we may worship Thee with our whole heart. Oh ! when will that day dawn upon this land, when all her sons will unite in indissoluble brotherhood, and worship Thee with one accord. Our little efforts can accomplish nothing ;—O Thou that crownest all work with success, grant us Thy grace.

Santih. Santih.

---

প্রাপ্ত।

## ব্রহ্মপূজা।

### ভূমিকা।

ব্রহ্মপূজার একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। তাহা অগ্রে বলা আবশ্যক। অতি পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে ব্রহ্মপূজা চলিয়া আসিতেছে। আর্য্য ঋষিগণ যাগ, যজ্ঞ এবং ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা ছাড়িয়া, কেবল জ্ঞানদ্বারা একমাত্র অদ্বিতীয় জ্ঞানময় পরব্রহ্মের উপাসনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যাগ, যজ্ঞ এবং ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের পূজা বৈদিককালে প্রচলিত ছিল। উপনিষদের সময়ে আর এক নূতন ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বিশুদ্ধ চিত্তে জ্ঞানযোগে, জ্ঞান-স্বরূপ ব্রহ্মের পবিত্র পূজা আরম্ভ হয়। নিভৃত স্থানে—অরণ্য মধ্যে—পর্ব্বতশিখরে উন্নতমনা ঋষিরা এই প্রকার পূজা অর্চ্চনা করিতেন। সুতরাং তাহা অল্পসংখ্যক সাধকের মধ্যে এবং অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ ছিল। জনসাধারণ সে অমৃতের আস্বাদন পায় নাই। আদিমবাসী অসভ্য জাতির কথা দূরে থাকুক,

আর্য্যবংশীয় অপর সকলেও পূর্ব্ববৎ অবস্থাতেই রহিয়া গেল এবং বিশুদ্ধ ব্রহ্মপূজা হইতে বঞ্চিত রহিল। উক্ত উন্নতমনা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহারাই জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাই সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। তাঁহারাই সমাজের শাসনকর্ত্তা এবং বিধি-ব্যবস্থা-কর্ত্তা হইলেন। অপর সকলে শূদ্র বলিয়া পরিচিত হইল এবং ক্রমে বেদ বেদান্ত এবং অপরাপর ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠে অনধিকারী হইল। ক্রমে ব্রাহ্মণ শূদ্রে এতাধিক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে। ফলতঃ বিশুদ্ধ ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-পূজা, জন সমাজ হইতে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। সেই কারণে ঐ সকল অজ্ঞ লোকের জন্য পরে পুরাণে তেত্রিশকোটী দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই প্রকারে ভারতের এবম্প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।

পুরাণে কথিত আছে গঙ্গার বাসস্থান হিমালয় পর্ব্বতে ছিল। সগরবংশ উদ্ধারের জন্য, ভগীরথ সেই গঙ্গাকে সমতল দেশে আনয়ন করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বহু যুগ পরে সেইরূপ ভারতের উদ্ধার মানসে, ঐ ব্রহ্ম-জ্ঞান এবং ব্রহ্ম-পূজা হিমাচল শিখর হইতে সাধারণ জনসমাজে আনিয়াছেন। সেই অবধি আমাদের দেশে এক নব যুগের আবির্ভাব হইয়াছে। যে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-পূজা অরণ্যে ও পর্ব্বতশিখরে অল্প-সংখ্যক ঋষিদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তাঁহার প্রসাদে এই ক্ষণে জাতিনির্ব্বিশেষে সকল নরনারী তাহার অধি-কারী হইয়াছে। স্বর্গীয় রামমোহন এই প্রকারে ভারতে এক মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। তিনিই প্রথমে বেদের কতকাংশ মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কন করিয়া সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করেন এবং এই রাজধানীতে ব্রহ্ম-সভা স্থাপিত করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রহ্ম-পূজা আরম্ভ করেন। তাহা দেখিয়া লোকে ক্ষিপ্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহার প্রাণসংহার পর্য্যন্ত করিতেও উদ্যত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের কৃপায় সেই ক্ষণজন্মা পুরুষের হৃদয়ে ব্রহ্মাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সেই অগ্নির পরাক্রম দেশের লোককে স্তম্ভিত করে। কেবল স্তম্ভিত করি-য়াছিল তাহা নহে। জনাকীর্ণ পল্লির কোনও একটি গৃহে অগ্নি সংলগ্ন হইলে, তাহা হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বায়ু-বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া যেমন গৃহান্তরকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া এক বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত করে, রাজা রামমোহনের হৃদয়স্থিত ব্রহ্মাগ্নি কালক্রমে দেশব্যাপ্ত হইয়া সেই প্রকার কাণ্ড উপস্থিত করিল। শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের আত্মাতে সেই অগ্নি প্রথমে বিশেষভাবে স্পর্শ করে। সেই অগ্নি তাঁহার জীবনে কি প্রলয় আনয়ন করিয়াছিল, তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি যে রাজা তাঁহার পিতার নিকট সর্ব্বদা আসিতেন এবং নিজ ভবনে প্রত্যাগমন কালে কিশোর দেবেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সেই বয়সে তিনি রাজার সহিত এক গাড়িতে যাইবার সময় অবাক্ হইয়া রাজার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন এবং একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। রাজার জীবনান্তে তাঁহার অসম্পন্ন কার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ করেন। বৈদিক কালে ঋষিরা যাগ যজ্ঞে একটি অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রাখিতেন। পৌরাণিক সময়ে দুর্গোৎসবের কয়েক দিন একটি "জাগপ্রদীপ" দিবারাত্র জ্বালিয়া রাখার নিয়ম প্রবর্ত্তিত আছে। মহর্ষি বুঝিলেন হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি একবার জ্বালিলে হইবে না। সেই অগ্নিকে চিরজীবন জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। সেই অভিপ্রায়ে তিনি ব্রহ্ম পূজার একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি করিলেন। নিয়মিতরূপে প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনা না করিলে, ব্রহ্মাগ্নি চিরজীবন জাগ্রত থাকিবে না। অন্ততঃ প্রাতে একবার এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার প্রার্থনা করিতে হইবে, দীক্ষার সময় দীক্ষার্থীকে এরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ করিবার নিয়ম স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে তিনি একটি উপাসকমণ্ডলী গঠিত করেন।

কাল সহকারে মহর্ষির হৃদয়স্থিত ব্রহ্মাগ্নি অন্যান্য আত্মায় সংলগ্ন হইয়া এক অপূর্ব্ব ও অভিনব ব্যাপার সংঘটিত করিল। উক্ত উপাসকমণ্ডলীর মধ্য হইতে আর একজন দীপ্তশীরা বহির্গত হইলেন। তাঁহাকে পাইয়া মহর্ষি বলিয়া উঠিলেন এতদিনের পর তিনি একজন বিশ্বাসী ও ব্রহ্মানুরাগী ব্রহ্ম-সন্তান পাইয়াছেন। তাঁহাকে তিনি "ব্রহ্মানন্দ" নামে অভিহিত করিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য মহাশয় ব্রহ্মানন্দকে আচার্য্য পদে বরণ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে বসা-ইলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে উভয়ের মধ্যে শোচ-নীয় বিচ্ছেদ ঘটিল। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কৈশোর হইতে উপাসনাশীল ছিলেন। ব্রহ্ম-পূজায় তাঁহার ধর্ম্মজীবন আরম্ভ এবং সেই পূজা হইতেই তাঁহার জীবনের ক্রমবিকাশ হইল। উপাসনা পদ্ধতিতে উদ্বোধনের পর আরাধনা আছে। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দ-রূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। ইহা আরাধনার মূল মন্ত্র। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মনে হইল এই মন্ত্রে "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" যোগ করিয়া দিলে, আরা-ধনা পূর্ণাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয়। শ্রীমৎ প্রধানা-চার্য্যের নিকট মনের এই ভাব প্রকাশ করিলে তিনি

সম্মতি প্রকাশ করেন এবং উহা উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রবর্ত্তিত হয়। এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই "ব্রহ্ম-পূজা" লিখিত হইল।

## উদ্বোধন।

কেবল জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময় ব্রহ্মের পূজা অতীব দুরূহ। চঞ্চল-চিত্ত ও মোহ-মুগ্ধ মনুষ্যের পক্ষে অশরীরী চৈতন্য-স্বরূপে আত্মসমাধান করা বড় সহজ নহে। সাকার দেবতার পূজা ইহা অপেক্ষা অনেক সহজ। সাকারবাদী আপনার ইষ্ট-দেবতাকে সম্মুখে রাখিয়া, পুষ্প চন্দন ও নৈবেদ্য দিয়া অনায়াসে ভক্তিভরে পূজা অর্চ্চনা করিতে পারেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদীর পক্ষে সেই চৈতন্য-স্বরূপকে আপন শরীর-মন্দিরে, আত্মাসনে আসীন দেখিয়া এক-মাত্র জ্ঞান-যোগে, প্রীতি-পুষ্পকে ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। সুতরাং বিস্তর আয়োজন ও সাধনার প্রয়োজন। রামায়ণে কথিত আছে যে, রামচন্দ্র অকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া, পূর্ব্বে বোধন বসাইয়াছিলেন। মানুষ বিষয়াসক্ত, জড়-জগৎ লইয়া সর্ব্বদা বিব্রত। ব্রহ্ম-পূজা সম্বন্ধে সকল সময়েই তাহার পক্ষে অকাল। সংসারাসক্ত, বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত, মোহমুগ্ধ মানবাত্মা সতত নির্জ্জীব ও অসাড় হইয়া থাকে। সংসারাসক্তি ও বিষয়চিন্তা হইতে অন্তত ব্রহ্ম-পূজার পূর্ব্বে তাহাকে বিমুক্ত রাখিতে হইবে। তাহার মৃতপ্রায় অসাড় আত্মাতে জীবন সঞ্চার করিতে হইবে। পাপচিন্তা ও সর্ব্বপ্রকার অসার ক্ষুদ্র চিন্তা হইতে তাহাকে বিরত করিতে হইবে। পবিত্র-স্বরূপ ব্রহ্মের পূজার জন্য তাহাকে শুদ্ধ শান্ত ও সমাহিত করিয়া উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময়ের উপাসনা করিতে বসিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া, সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষকে আত্মার অন্তরাত্মা এবং প্রাণের প্রাণরূপে দেখা বড় সহজ ব্যাপার নহে। তাঁহাকে জাগ্রত জীবন্ত বিধাতারূপে দেখিয়া তাঁহার পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। এই জন্য উপাসনার সময় উদ্বোধনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। প্রকৃত পক্ষে ঐ কারণে ব্রহ্মোৎসবের পূর্ব্বে কয়েকদিবস ব্যাপী উদ্বোধনের ব্যবস্থা চাই। তাঁহার জন্য বিশেষভাবে আত্মা ও মনকে প্রস্তুত করা চাই। সাধু মহাত্মার কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা সকল অবস্থাতে ব্রহ্ম-সত্তায় অবগাহন করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকল সময়েই ব্রহ্ম পূজার জন্য প্রস্তুত।

## আরাধনা।

উদ্বোধনের পর আরাধনা কি? উপাসক কোথায় কাহার সন্নিধানে এবং কি অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহাই উপলব্ধি করা আরাধনার উদ্দেশ্য। কোন দূরস্থ অপরিচিত ও অনিশ্চিত দেবতার পূজা করিতে যাইতেছি না। যাঁহা অপেক্ষা সত্য পদার্থ আর কিছু হইতে পারে না; যিনি পূর্ণ সত্য; যাঁহার সত্তা মানবাত্মার অন্তর বাহির অধিকার করিয়া রহিয়াছে; যিনি জড় জগতে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যে জাগ্রত জীবন্ত পুরুষ-রূপে প্রতিনিয়ত কার্য্য করিতেছেন; যিনি জলে, স্থলে, শূন্যে সমান ভাবে জাগরূক; যিনি চন্দ্র সূর্য্যে গ্রহ নক্ষত্রে, মেঘ এবং বায়ুর মধ্যে তাহাদের শক্তি-রূপে বিরাজিত থাকিয়া তাহাদিগকে প্রশমিত ও পরিচালিত করিতেছেন; যিনি জনসমাজে ইতিহাসে ও জীবাত্মার অভ্যন্তরে বিধাতারূপে কার্য্য করিতেছেন; যিনি রোগে স্বাস্থ্যে, সম্পদে বিপদে জন্মে মৃত্যুতে এবং পরলোকে আশ্রয় ও বন্ধু, যিনি পাপের শাস্তা পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা, মুক্তি ও আনন্দ-দাতা, তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইয়াছি, তাহা অনুধাবন করিতে হইবে। নচেৎ কোন্ দেবতার নিকট আসিয়া বসিয়াছি, কেমন প্রাণবন্ত ব্রহ্মের উপাসনা করিতে যাইতেছি, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবে না। এই কারণে ব্রহ্মের সত্য-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য আরাধনার প্রয়োজন।

যিনি জ্ঞান-স্বরূপ—পূর্ণ জ্ঞান; যিনি মনুষ্যকে জ্ঞান দ্বারা বিভূষিত করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব করিয়াছেন; যিনি মনুষ্যকে অশেষ প্রকারে জ্ঞান বিজ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকারী করিয়াছেন; যিনি মানুষকে প্রীতি, ভক্তি দ্বারা—তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা তাঁহার পূজার অধিকার প্রদান করিয়া চরিতার্থ করিয়াছেন; যিনি সর্ব্বজ্ঞ, মনের মন, যাঁহার নিকট কিছুই গোপন রাখিবার উপায় নাই; মানুষ যত কেন কপটাচারী ও ছদ্মবেশী হউক না, যাঁহার বিশ্বপ্রসারিত চক্ষু সকলই দেখিতেছে; গহন কাননে প্রবেশ করি, আর সমুদ্র-গর্ভে ডুবি, যেখানে চাই,—যাঁহার হাত ছাড়াইবার উপায় নাই—শর-বিদ্ধ হরিণের ন্যায় যাঁহার নিকট একেবারে ধরা পড়িয়া আছি; ব্রহ্ম-পূজার সময় এই সমস্ত বুঝিতে হইবে। নতুবা পাপবোধ হইবে না, প্রাণের উৎস ছুটিবে না, প্রাণের কথা বাহির হইবে না এবং হৃদয়ের জ্বালা নিবারণের জন্য প্রাণ-স্পর্শী প্রার্থনা আসিবে না। এই জন্য প্রকৃত পূজার পূর্ব্বে সেই জ্ঞান-স্বরূপের চিন্তা ও আরাধনার আবশ্যকতা।

ব্রহ্ম অনন্ত—অসীম। তিনি দুজ্ঞেয়, অগম্য ও অপার। ক্ষুদ্র মানবাত্মা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে বা ধারণ করিতে পারে না। তিনি তাহার পক্ষে দুজ্ঞেয়। পূজার পূর্ব্বে এই ভাবটি মনে জাগরূক রাখা চাই। কোথায় সেই অনন্ত দেবাধিদেব, আর কোথায় উপাসক, একটি ক্ষুদ্র অসহায় প্রাণী। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কত। কিন্তু তাহাতে কি? ব্রহ্মের ক্রোড় যে অনন্ত প্রসারিত। সকল নরনারী যে তাহাতে বাস করিতেছে, সেই অনন্ত ক্রোড় সকলকে আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছে। যত অমরাত্মা ইহলোক হইতে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছে, যত আত্মা ইহলোকে মানবদেহে বদ্ধ রহিয়াছে, সকলই সেই ক্রোড় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে ও অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। অহো! এ কি বিশাল ক্রোড়! পাপী পুণ্যাত্মা, ধনী দরিদ্র, কেহই তাহা হইতে বঞ্চিত নহে। তথায় কাহারও স্থানাভাব নাই। যুগ যুগান্তর সেই অমোঘ ক্রোড়ে সকলে বাস করিয়া নিরাপদ রহিয়াছে ও থাকিবে। তথায় থাকিয়া উন্নতির এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে ও করিবে—তাঁহার দিকে অনন্তকাল অগ্রসর হইয়া আনন্দের পর আনন্দ ভোগ করিবে। এ চিন্তা কি আশাপ্রদ!—এ আশা কি আরাম আনিয়া দেয়! এ চিন্তায় বিষয়-বিরাগ আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। আত্মীয় বিয়োগে শোকাশ্রু আর নিপতিত হয় না। উপাসক আপনার ও অপর সকলের অমরত্ব বুঝিয়া বীতশোক হয়েন, সেই অনন্তদেবের চরণ যুগল আরও জড়াইয়া ধরেন। ভীরু যে সে অভয় প্রাপ্ত হয়। দীন হীন কাঙ্গাল সকলে সেই বন্ধুর পদাশ্রয় লাভ করে। অনাথ যে সে সনাথ হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজার সময় তাঁহার অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ মনন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

ব্রহ্ম যেমন এক দিকে অগম্য অপার, অপর দিকে আবার তিনি আনন্দময় এবং অমৃতময়। মানুষ তাঁহার প্রিয় সন্তান হইয়া সেই আনন্দ ও অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। তিনি দুজ্ঞেয় ও অপার তাহাতে কি? তিনি যে জীবাত্মার পরম মাতা, পরম পিতা ও পরম সখা। তিনি যে এই লীলাভূমি সৃষ্টি করিয়া তাহাকে আনিয়াছেন। মানুষ না থাকিলে তাঁহাকে জানিবে কে? তাঁহার লীলা দেখিবে কে ও বুঝিবে কে? এবং দেখিয়া বুঝিয়া তাঁহাকে লাভ করিবে কে? তাঁহার দত্ত আনন্দ ও অমৃত পান করিবে কে? মা বলিয়া ডাকিয়া হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়াইবে কে? প্রাণ ভরে মা মা বলিয়া তাঁহার কোলে ঝাঁপাইবে কে? তাঁহার কোলে বসিয়া মা মা বলিয়া ডাকিলে সেই স্নেহময়ী জননী অকাতরে নিজহস্তে অমৃত বিতরণ করেন। মানুষ তাহা পান করিয়া ধন্য হয়, কৃতার্থ হয়। অজ্ঞেয়বাদ দূরে পলায়ন করে। মায়ের কোলে ছেলে বসিয়া মায়ের হাতে অমৃত পান করিতেছে, তাহাকে কুতর্কে ভুলায় কাহার সাধ্য! যদি মায়ের হাতের কঠিন আঘাতও পায়, সে বুক পাতিয়া অম্লানবদনে সহ্য করে। মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া সব জ্বালা ভুলিয়া যায়। তাহার পাপ তাপ দূরে চলিয়া যায়। তখন সে বলিতে থাকে মা তুমি আনন্দরূপমমৃতং। উপাসককে সেই জন্য প্রার্থনার পূর্ব্বে সেই অমৃত স্বরূপের ভাবনা করিতে হয়। এই স্বরূপ ভাবনা ও আরাধনাতে বড়ই আনন্দ পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম "শান্তং শিবমদ্বৈতম্"। তিনি শান্তিদাতা মঙ্গলদাতা ও অদ্বিতীয়। মানুষের আর কেহ নাই, যে তাহাকে শান্তি ও কল্যাণ দিতে পারে। মানুষের আর কেহ নাই যে পাপ তাপ হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে পারে। ব্রহ্মই একমাত্র পরিত্রাতা ও মঙ্গল বিধাতা এবং সংসার পারাবারের কাণ্ডারী। তিনি ভিন্ন মানুষের গত্যন্তর নাই। তিনিই তাহার একমাত্র পরম গতি, তিনিই তাহার একমাত্র পরম সম্পদ, তিনিই তাহার একমাত্র পরম লোক ও পরম আনন্দ। এ দুঃখময় সংসার অশান্তিতে পরিপূর্ণ। এখানে পদে পদে বিপদ, শোকতাপ ও জ্বালা যন্ত্রণা। এখানে মানুষ পাপে তাপে জর্জ্জরিত। সম্মুখে প্রলোভন বিস্তর। অথচ সে অতি দুর্ব্বল। পাপই যত অকল্যাণ আনয়ন করে। সেই মঙ্গলময় বিধাতার প্রসন্ন মুখ দেখিয়াই মানুষ সকল পাপ তাপ, শোক ভয় এবং প্রলোভনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে পারে। তাঁহাকে ছাড়িয়া মানুষ আর কোথায় কাহার নিকট যাইবে? সেই অদ্বিতীয়কে প্রতি আত্মা যখন আপনাতে পূর্ণ ভাবে দেখিতে থাকে, তখন তাঁহার একত্বের ও বহুত্বের সমন্বয় বুঝিতে পারে। তিনি এক অথচ বহু এই কথার মর্ম্ম তখন হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং ব্রহ্ম-পূজার সময় তাঁহার "শান্তং শিবমদ্বৈতম্" স্বরূপের আরাধনা বিশেষ কল্যাণকর।

তিনি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।" তিনি শুদ্ধ, পবিত্র-স্বরূপ—পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি ধর্ম্মরাজ। শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। ন্যায়-দণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া তিনি এই সমগ্র জগৎ শাসন করিতেছেন। তিনি পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের দণ্ড বিধান করিতেছেন। মানুষ তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য তাঁহার চরণতলে উপবিষ্ট হইলে, তাহার পাপ তাপ ভস্মীভূত হইয়া গিয়া তাহার আত্মা ও মন পরিশুদ্ধ হয়। পাপ লইয়া মানুষ তাঁহার সম্মুখে যাইতে পারে না। সেই পবিত্র-স্বরূপের সংস্পর্শে তাহার আত্মা পাপধৌত হইয়া তাঁহার নিকট তিষ্ঠিতে পারে। সেই অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, পাপ হৃদয়ের ত্রিসীমানায় আসিতে পারে না। সেইজন্য উপাসক আরাধনা অন্তে সেই শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া ধ্যানে নিযুক্ত হয়েন।

## ধ্যান।

কাহার নিকট কি উদ্দেশে আসিয়াছি যখন উপলব্ধ হইল এবং উপাস্য দেবতার স্বরূপ হৃদগত হইল, তখন পরমাত্মাতে আত্ম-সমাধানের শুভ মুহূর্ত্ত উপস্থিত। বিষয় কোলাহল ও সংসারচিন্তা হইতে আত্মা প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে। ব্রহ্মসাগরে উপাসক অবগাহন করিয়া রহিয়াছেন। এখন প্রাণারামকে প্রাণের প্রাণ, আত্মার অন্তরাত্মাকে দেখা সহজ হইয়া পড়িল। সকল ব্যবধান অন্তর্হিত, এখন সাধকের জ্ঞানচক্ষু ও সেই চৈতন্য-স্বরূপের চক্ষু এক হইয়া গেল। এখন জীবাত্মায় পরমাত্মায় মিলন হইল। এখন

মায়ের কোলে বসিয়া জীবাত্মা যোগ-সুধা ও প্রেমামৃত পান করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের জন্য হইলেও, তাহাতেই জীবন পবিত্র হইয়া যায়। সংসার-ক্ষেত্রে কর্ম্ম করিবার জন্য মানুষ ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান হয়। ব্রহ্ম-কৃপা বর্ষিত হইয়া সাধককে নবজীবন প্রদান করে। ইহাই যোগ। এই সময়ে সাধক ব্রহ্মের নিজ মুখের বাণী শুনিতে পান। সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সাধু বচন ও মহাত্মাদের সত্য উপদেশ বাক্য, স্বয়ং ব্রহ্মের সাক্ষ্যবাক্যে সপ্রমাণিত হয়। সর্ব্বপ্রকার সংশয় ও হৃদয়-গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়। সাধকের বিশ্বাস এই প্রকারে দৃঢ়তর হয়। কাহারও সাধ্য নাই সে বিশ্বাসকে শিথিল করিতে পারে, বা উল্টাইতে পারে।

## প্রার্থনা।

এইক্ষণে প্রার্থনার উপযুক্ত কাল উপস্থিত। কোনও অনুপস্থিত অথবা দূরস্থ ব্রহ্মের উপাসনায় কিছুই ফল হয় না। সেই জন্য যখন তাঁহাকে আত্মার আসনে বসাইয়াছি—তাঁহাকে আত্মার অন্তরাত্মা-রূপে উপলব্ধি করিতেছি—যৎকালে তিনি করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীয়মান হইতেছেন, তখনই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। প্রার্থনা কি? প্রার্থনার অর্থ যাচ্ঞা—ভিক্ষা। প্রার্থনার কোন বিশেষ ভাষা নাই এবং আবশ্যকও করে না। তাহা আত্মার একটি ভাব মাত্র। ধ্যানে ব্রহ্মকে ধরিয়া আপন আত্মাকে তাঁহার সম্মুখে স্থাপিত করা হইয়াছে। এখন জীবাত্মা নিজের অভাব সকল নিজে বুঝিয়া, পরমাত্মার সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়াছে। আর কিছুই করিতে হইবে না। তিনি সকলই দেখিতেছেন ও বুঝিতেছেন, সুতরাং অবশিষ্ট তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন। আত্মার দুর্ব্বলতা, পাপ তাপ, মোহ মায়া তাঁহার চরণতলে রাখিয়া দিলে প্রতিবিধান তিনিই করিবেন।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কোথায়? অনেকে বলেন অন্তর্যামী ভগবান সকলই দেখিতেছেন ও জানিতেছেন, তবে আবার যাচ্ঞা ও ভিক্ষা কেন? জড় দেহের পক্ষে পান আহার যেরূপ অত্যাবশ্যক, ব্রহ্ম-কৃপা ও ব্রহ্ম-বল আত্মা সম্বন্ধে সেই প্রকার। পান আহার ব্যতীত শরীরে বলাধান হইয়া প্রাণরক্ষা হয় না। ব্রহ্ম-কৃপা ও ব্রহ্ম-বল ভিন্ন আত্মা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না। মানবাত্মা সসীম, সুতরাং দুর্ব্বল। পৃথিবী বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভনে পরিপূর্ণ। স্বয়ং ব্রহ্মই তাহার সহায়, সখা ও বল। সাধারণ মানুষ সংসার-সাগরে হাবুডুবু খায় এবং অনেকে আধ্যাত্মিক প্রাণ হারায়। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম-বলে বলীয়ান, ব্রহ্মকে যাঁহারা সহায় করিতে পারিয়াছেন এবং আপনার যথাসর্ব্বস্ব তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা অন্য প্রকার। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা না থাকিলে খাইবে কে? অন্ন পানকে জীর্ণ করিয়া দেহে বলবিধান করিবে কে? আত্মার পক্ষেও ঠিক সেইরূপ। অগ্রে আপনার অভাব বুঝা আবশ্যক—পাপ বোধ হওয়া প্রয়োজন। ইহাই আত্মার ক্ষুৎপিপাসা। তাহার পর আর কিছুই করিতে হইবে না। শিশুর ক্ষুধা পাইলে, আহারের জন্য ক্রন্দন করিতে থাকে। মাতা অমনই আহার পান দেন। শিশুকে ক্রন্দন করিতে কেহ শিখাইয়া দেয় না। ক্ষুধা পাইলে সে কাঁদিবেই কাঁদিবে। পাপ বোধ হইলে ও আপনার আধ্যাত্মিক অভাব বুঝিতে পারিলে, ব্যাকুল প্রাণে কাতর প্রার্থনা মানবাত্মায় আপনা হইতে আইসে। প্রার্থনা করিতে কাহাকে বলিয়া দিতে হয় না। ভগবান মানুষকে জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছা দিয়াছেন। সে আপন অভাব বুঝিয়া তাঁহার নিকট ক্রন্দন করিবে। ক্রন্দন শুনিয়া পরমজননী আহার পান না দিয়া থাকিতে পারেন না। ব্যাকুলতা না দেখিলে তিনি মুক্ত-হস্ত হয়েন না, ইহাই আধ্যাত্মিক রাজ্যের নিয়ম।

প্রার্থনার বিষয় কি? মানুষ ভগবানের নিকট কি ভিক্ষা করিবে? বিষয়-সুখের জন্য, ধনের জন্য, যশের জন্য অথবা স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা যুক্তিসঙ্গত নহে। প্রথমতঃ জড় ও আত্মা সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং এ দুই রাজ্যের বিধি ব্যবস্থাও স্বতন্ত্র। জড়-রাজ্যের নিয়ম প্রতিপালন করিলে, জড়-অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। আধ্যাত্মিক নিয়ম পালন করিলে আধ্যাত্মিক কামনা পরিতৃপ্ত হইবে। শরীর রক্ষার নিয়ম অবলম্বন কর, স্বাস্থ্য পাইবে। ধনোপার্জ্জনের পন্থা অনুসরণ করিলে ধন লাভ হয়। অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া অথবা বিষপান করিয়া ভগবানকে ডাকিলে প্রাণ রক্ষা হইবে না। শরীরের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ জন্য উপযুক্ত পান আহার আবশ্যক। তাহাকে সুস্থ ও বলিষ্ঠ করিবার অভিপ্রায়ে নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা চাই। প্রার্থনায় সে উদ্দেশ্য সফল হইবার নহে। আত্মার পাপ, তাপ, মোহ দুর্ব্বলতা অপনয়ন করিতে হইলে আধ্যাত্মিক নিয়মানুসারে প্রার্থনা চাই। আত্মার উন্নতি কল্পে সংযম সাধনা ও প্রার্থনাই ব্যায়াম। দ্বিতীয়তঃ, মানবাত্মার চরম লক্ষ্য ব্রহ্ম-লাভ এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ ও শান্তি-সুখ উপভোগ। বিষয়-কামনায় তৃপ্তি ও বিষয়-সুখ লাভের জন্য প্রার্থনা করিলে সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। বিষয়-সুখ লক্ষ্য হইলে ব্রহ্মকে তৎসমুদায় লাভের উপায়-স্বরূপ করা হয়। আধ্যাত্মিক চক্রের কেন্দ্র অথবা নাভি, ব্রহ্ম। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও সংসার অর-স্বরূপ। এই সমস্তই ঐ কেন্দ্র বা নাভিতে অর্পিত থাকিবে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে জীবাত্মা শর স্বরূপ হইয়া ব্রহ্ম-লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিবে। অতএব ব্রহ্মের নিকট প্রার্থনা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর বিষয়-সুখের জন্য হইতেই পারে না। কেবল পারমার্থিক সুখ শান্তির উদ্দেশেই তাহা প্রধাবিত হওয়া উচিত। "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে"। আধ্যাত্মিক জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ব্রহ্ম। অন্য দেবতা অথবা পুত্তলিকা সে স্থান অধিকার করিবে না। জ্ঞানাভিমানী ব্রহ্মবাদী কাষ্ঠ লোষ্ট্র নির্ম্মিত পুত্তলিকার পূজা পরিহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু মানবাত্মার আরও অনেক ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পুত্তলিকা আছে, যাহাদিগকে পরিত্যাগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। প্রস্তর বা ধাতু নির্ম্মিত দেবতার পূজা ত্যাগ করা অতি সহজ, কিন্তু আধ্যাত্মিক পুত্তলিকা সকল অতিশয় দুষ্পরিহার্য্য।

প্রার্থনার ফল। প্রার্থনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে

চলিবে না। প্রার্থনার ফল লাভের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে। যাচ্ঞা করিলাম, কিন্তু উত্তর পাইলাম কি? যতক্ষণ উত্তর না পাইব ততক্ষণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিব না। প্রাণস্পর্শী ভিক্ষা করিলে—হৃদয় খুলিয়া ডাকের মত ডাকিতে পারিলে, উত্তর নিশ্চয় আসিবে। উত্তর যাহা আসিবে, সেই ব্রহ্ম-আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবার অবিরাম চেষ্টা চলিতে থাকিবে। তবে প্রার্থনার ফল লাভ হইবে—তবে ব্রহ্ম পূজা সার্থক হইবে।

শেষ।

বিবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র পাঠ নিতান্ত উপকারী। সাধু সজ্জনেরা আজীবন সাধন-ভজনের দ্বারা যে সকল সত্য ও জ্ঞান-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাতে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা পাঠ এবং আপন জীবনে প্রতিফলিত করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। উপাসনা অন্তে শাস্ত্র হইতে পাঠ ও শান্তিবচন দ্বারা পূজা সমাপ্ত করিতে হয়। ব্রহ্মের আশীর্ব্বাদ এবং কৃপা ভিন্ন পূজা ফলবান হয় না। ব্রহ্মকৃপাই অসহায় মানুষের একমাত্র সম্বল। ব্রহ্ম-কৃপাই ভব-সমুদ্র পার হইবার এক মাত্র তরণী। সেই জন্য ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও কৃপা ভিক্ষা করিয়া পূজা সমাপ্ত করিবার নিয়ম হইয়াছে।

---

## নানা কথা।

তিব্বত।—তিব্বতের আভ্যন্তরীণ সংবাদ অপরিজ্ঞাত থাকিলেও ঐ স্থান অসংখ্য উচ্চঅঙ্গের যোগী ও তপস্বীর নিবাসস্থল বলিয়া সাধারণের অন্তরে বহুকাল ব্যাপী একটি ধারণা চলিয়া আসিতেছে। বিগত অভিযানে অনেক গূঢ় রহস্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবিকই তিব্বতে মঠের সংখ্যা নিতান্ত অধিক। এক একটি মঠ অসংখ্য সন্ন্যাসীকে আশ্রয় দান করে। Gyantse গিয়াংসির দুর্ভেদ্য প্রাচীরাবৃত মঠে ৬০০ সন্ন্যাসীর থাকিবার স্থান আছে। দ্বারদেশে সন্ন্যাস জীবনের বিধিগুলি লিখিত। যাহারা শিক্ষার্থী হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের নাম "তপ"। বিভিন্ন শ্রেণীর বৌদ্ধগণের বিভিন্ন শিক্ষালয়, বিভিন্ন ভজনমন্দির একই প্রাঙ্গনের ভিতরে অবস্থিত। অদূরে "জীবন-চক্র" অঙ্কিত। যমরাজ নরকের ভিতরে বসিয়া তৌলদণ্ড হস্তে মনুষ্যের আত্মার সহিত তাহার কার্য্যাকার্য্য ওজন করিতেছেন। স্বর্গের চিত্রে 'কল্পবৃক্ষ' রহিয়াছে; পুণ্যবান যখন যাহা চাহিতেছেন, তখনই তাহা পূর্ণ হইতেছে। সভাগৃহে দিবারাত্র ধরিয়া ঘৃত-প্রদীপ জ্বলিতেছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তি ও দেব-দানবের মূর্ত্তি দেওয়ালে অঙ্কিত। বুদ্ধ-পদ-চিহ্নে অষ্টমঙ্গল রহিয়াছে। উহা বিভিন্ন আটটি দ্রব্যের সমষ্টি। ১। বিজয়-চক্র—রাজ্যের বিজয়চক্র যাহার উপর সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না। ২। সৌভাগ্য-চক্র—যাহা তিব্বতীয়গণ বুদ্ধের নাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, প্রকৃত পক্ষে যাহা অসংখ্য জন্মের ও কষ্টভোগের পরিচায়ক। ৩। পদ্ম—যাহা স্বর্গীয় জীবনের পরিচায়ক। ৪। অমৃত-কলস—যাহা অমরজীবনের পরিচায়ক। ৫। সুবর্ণমৎস্যদ্বয়—যাহা সৌভাগ্য সূচক। ৬। ছত্র—যাহা রাজচিহ্ন। ৭। শঙ্খ—যাহা বিজয়-ভেরী। ৮। পতাকা বা বৈজয়ন্তী যাহা বিজয় সূচক। (বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত অষ্ট-মঙ্গল যাহা দুর্গোৎসব পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, তাহা অন্যবিধ, যথা "মৃগরাজো বৃষো-নাগঃ কলসোব্যজনস্তথা, বৈজয়ন্তী তথা ভেরী দীপ ইত্যষ্ট মঙ্গলং। বৌদ্ধ অষ্টমঙ্গল ও পুরাণোক্ত অষ্টমঙ্গলের কোন কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে মাত্র)। ভজন-মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভারতীয় সংস্কৃত-গ্রন্থ হইতে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের অনুবাদিত শতসংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ ও আড়াই শত খণ্ড টীকা রহিয়াছে। প্রতি খণ্ড পুঁথি আকারে আড়াই ফুট লম্বা, ৮ ইঞ্চ চৌড়া; ওজনে ৫ হইতে পোনের সের। সমস্তই কাষ্ঠ-ফলকে বাঁধা রহিয়াছে। অধিকাংশই হস্তলিখিত। "প্রজ্ঞা পারমিত" গ্রন্থ সুবর্ণাক্ষরে লিখিত। অধিকাংশ পুস্তক প্রায়ই উদ্‌ঘাটিত বা পঠিত হয় না। যে কয়েক খানি পঠিত হয়, তাহা রোগ-প্রশমন ও সৌভাগ্য-লাভের মন্ত্রে পরিপূরিত। বসন্তকালে ঐ পুস্তক-গুলি সসম্মানে মস্তকে ধারণ করিয়া লামাগণ শস্যক্ষেত্রের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে, কখন বা রোগীর শয্যা ও তাহার আবাস-নিকেতনের চারিদিকে মহা সমারোহে ঘুরিয়া আইসে। পীড়িত লোকের রোগ আরোগ্য কামনায় কখন কখন বহুসংখ্যক লামার সমাবেশ হয়। অসংখ্য প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে। মন্দিরের ভিতরে বসিয়া সমস্বরে লামাগণ গান করিতে থাকেন। ধূপের বাষ্পে চারিদিক পরিপূরিত হয়। সে দৃশ্য বাস্তবিকই মনোমুগ্ধকর। একটি স্তম্ভে চাবুক ঝুলিতেছে, সেই কশাঘাতে অপরাধী নবীন লামার চৈতন্য সম্পাদিত হয়। কুত্রাপি অনেকগুলি পুস্তকের সমাবেশ রহিয়াছে। তৎসমস্তই প্রায় ইতিহাসমূলক; মঠের ও লামাগণের ও রাজার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহার উপরে এতই ধূলি নিপতিত রহিয়াছে, যে কখন উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। লামাগণের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর। কুড়ি জনের ভিতরে একজন পড়িতে পারেন কি না, সন্দেহ। লামাধর্ম্মের প্রবর্ত্তক পদ্মদেবের মূর্ত্তি রহিয়াছে। বুদ্ধদেব অপেক্ষা তাঁহার সম্মান সমধিক বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন গৃহ মূল্যবান উপকরণে সুসজ্জিত। একটি কক্ষে ভূতের মূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া যাত্রীগণ সন্ত্রাসিত হয়েন। উহার দেহ মনুষ্যের মত, কিন্তু মুখ ও মস্তক ভীষণ-জন্তুর সদৃশ। বিষ ও তাম্রকূট তাহার সেবার জন্য সম্মুখে প্রদত্ত হয়। মনে হয় ঐরূপ কল্পনা বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ব-আমলের। অদূরে গান্ধোলা মন্দির, (Gandhola) গয়ার মন্দিরের আদর্শে বিনির্ম্মিত (যেখানে শাক্যমুনি আলোক লাভ করিয়া বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন)। এখান হইতে ৩ মাইল দূরে বিংশ-কক্ষ-সমন্বিত একটি আশ্রম আছে, যেখানে বসিয়া লামাগণ মধ্যে মধ্যে সমাধিমগ্ন হয়েন। দুই মাইল দূরে ত্রিশ জন স্ত্রী-সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। অদূরে Golgotha* যেখান হইতে মৃতদেহ নিয়ে নিক্ষিপ্ত হয় ও শৃগাল

কুকুর গৃধিনী কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কাষ্ঠের অল্পতা হেতু সম্ভবতঃ মৃতদেহের পরিণাম এইরূপ ঘটে। কেবলমাত্র লামার এবং বসন্ত ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিতে মৃত লোকের দেহ ভস্মসাৎ হইয়া থাকে। Thechen নামক স্থানে দুই হাজার সাধু থাকিবার আশ্রম আছে। সম্ভবতঃ উহা ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে সংস্থাপিত।

পত্র। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দত্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মপরিবারের একটি তালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহার সংকল্প যে সাধু তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রাহ্মসমাজ এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও সহানুভূতি-কারী মহোদয়গণ সমীপেষু—

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমিদং—

কতগুলি ব্রাহ্ম-পরিবার ভারতবর্ষের মধ্যে আছে, তাহার একটা তালিকা এবং প্রত্যেক পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য আমার একটা প্রবল ইচ্ছা অনেক দিন ধরিয়া আছে। কোন কোন বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহাদেরও ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া, আমি একমাস যাবত কলিকাতাস্থ ব্রাহ্ম-বন্ধু সকলের বাটীতে যাইয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রায় তিন শত পরিবারের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা হইয়াছে। আর ও অনেক পরিবার কলিকাতায় আছেন। প্রতি দিনই সংগ্রহ করিতেছি। এক্ষণে কাগজ ছাপাইয়া মফঃসলের ব্রাহ্ম-বন্ধু সকলের নিকট পাঠাইতে হইবে, এবং ছাপার কাগজ দ্বারা ভালরূপ খাতা বাঁধাইয়া এই সকল বিবরণ রক্ষা করিতে হইবে।

এই কার্য্যের জন্য আমি তিন সমাজের ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের সহানুভূতি, অর্থ-সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি। আনুমানিক হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছি, ৫০০০ হাজার কাগজ ছাপাইয়া আড়াই হাজার কিম্বা তিন হাজার কাগজ দ্বারা একখানা বাইণ্ডিং করা খাতা করিতে হইবে। এই খাতার মধ্যে বিবরণ লেখা থাকিবে। অবশিষ্ট অৰ্দ্ধেক কাগজ মফঃস্বলে পাঠাইয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃপক্ষগণ অনুমতি করেন, তবে তিন সমাজের মিসন আফিসে তিন খানা খাতাও রাখিতে প্রস্তুত আছি। এই কার্য্যে সাহায্য করিলে বাধিত হইব। মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক কলিকাতাস্থ তিন সমাজের মিসন আফিসে ম্যানেজারের নিকট সহানুভূতি-সূচক পত্র ও অর্থ-সাহায্য পাঠাইবেন। একখানা খাতা থাকিলে ৫০০০ হাজার ছাপার ফরমের আবশ্যক। তিন খানা খাতা থাকিলে ৩০০০ হাজার হিসাবে ৯০০০ হাজার এবং মফঃসলের জন্য দুই হাজার, মোট ১১০০০ হাজার ফরম ছাপাইতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বাইণ্ডিং খরচ ও মফঃস্বলের জন্য ডাক খরচ লাগিবে।

নিবেদক
শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।
৭নং গিরীশ বিদ্যারত্নের লেন
বা
৮৬নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭৯, ফাল্গুন ও চৈত্র মাস।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ১০৫৮॥১০ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩২৮৪॥৵০ |
| সমষ্টি | ... | ৪৩৪৩ ৵১০ |
| ব্যয় | ... | ৭৭৪ ⁄১ |
| স্থিত | ... | ৩৫৬৯৵৯ |

স্থিত।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত
আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৬৯৵৯
৩৫৬৯৵৯

আয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ... | ৫৬৮৸৪ |

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
৪০০৲
কোম্পানীর কাগজের সুদ
১৬৮৸৪
৫৬৮৸৪

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৬২।০ |
| পুস্তকালয় | ... | ৩০।⁄০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৩৩৯৸৵৬ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৫৭।০ |
| সমষ্টি | ... | ১০৫৮॥১০ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ৩৩৫৸৵৭ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৬৩॥৵৬ |
| পুস্তকালয় | ... | ৪॥৵০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ২২১।৩ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ১৪৮।৵৯ |
| সমষ্টি | ... | ৭৭৪ ⁄১ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ভাদ্র ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৩ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम् सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## আকাশের বিদ্যুৎ।

বায়ুর ব্যাপকতা বুঝাইতে হইলে আমরা উপমার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলি,—মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণীসকল যেমন জলের ভিতরে ডুবিয়া থাকিয়া চলা ফেরা করে, আমরা সেই প্রকার বায়ুসাগরের মধ্যেই ডুবিয়া আছি। এই উপমাটিরই সাহায্য গ্রহণ করিয়া যদি বলা যায়,—সমগ্র সসাগরা পৃথিবী তাঁহার নগর বন এবং মরুপ্রান্তরাদি বক্ষে করিয়া সর্ব্বদা বিদ্যুৎ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে, তবে বোধ হয় কথাটা ঠিকই বলা হয়।

বায়ুর স্পর্শ আমরা নিয়তই অনুভব করি এবং প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসেও সে নিজের অস্তিত্ব আমাদিগকে সুস্পষ্ট জানাইয়া দেয়। বিদ্যুতের অস্তিত্ব এপ্রকার সুস্পষ্ট না হইলেও, মেঘ-নির্ঘোষ এবং বিদ্যুৎ-স্ফুরণে তাহার অস্তিত্ব জানিতে বাকি থাকে না।

কেবল মেঘ হইলেই বিদ্যুৎ হয় না। যখন আকাশ সম্পূর্ণ মেঘনির্মুক্ত এবং বায়ুও জলীয়বাষ্প বর্জ্জিত থাকে, সেই সময়েও আকাশে বিদ্যুতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাইবিরিয়া এবং আমেরিকার শুষ্ক প্রান্তরের বায়ুরাশি সময়ে সময়ে এপ্রকার বিদ্যুৎযুক্ত হইয়া পড়ে যে তখন পরিধেয় বস্ত্রাদি হইতেই বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গ আপনা হইতেই বাহির হইতে আরম্ভ হয়।

লর্ড কেল্‌ভিন্ আকাশের বিদ্যুৎ লইয়া অনেক পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বায়ুতে যে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ বর্ত্তমান, তাহা ঐসকল পরীক্ষায় স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছিল। আজকাল ইলেক্ট্রোমিটার (Electrometer) নামক যে একপ্রকার বিদ্যুৎমাপক-যন্ত্র পরীক্ষাগার মাত্রেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার দ্বারাও বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝা যায়। আকাশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে তাহা এই যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল স্থির করা হইতেছে এবং বিদ্যুতের পরিমাণ দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা প্রভৃতি ব্যাপারগুলিও মোটামুটিভাবে পূর্ব্বে গণনা করিয়া রাখা হইতেছে।

আকাশের বিদ্যুৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হয় জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে তিন চারিটি কারণের উল্লেখ দেখা

যায়। পৃথিবীর জল এবং স্থলভাগ হইতে নিয়তই জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে। সূর্য্যের তাপে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর দেহ হইতে প্রচুর বাষ্প বহির্গত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই ব্যাপারটিকে আকাশের বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তা'ছাড়া বায়ুর স্তরগুলি এবং পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সূর্য্যের তাপে যে অসমভাবে উত্তপ্ত হয়, তাহাকেও বিদ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বিদ্যুৎ-উৎপত্তির এই কারণগুলির কথা অতি প্রাচীনকাল হইতে বিজ্ঞানগ্রন্থে স্থান পাইয়া আসিতেছে। কিন্তু কথাগুলির সত্যতা পরীক্ষা করিবার জন্য বহুচেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। এই কারণে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত মতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। আজকাল বিদ্যুতের উৎপত্তি প্রসঙ্গে কতকগুলি নূতন কথা শুনা যাইতেছে। আশা হইতেছে সম্ভবতঃ আকাশের বিদ্যুতের গোড়ার খবরটা এ গুলির সাহায্যে শীঘ্র জানা যাইবে।

কয়েক বৎসর হইল দুইজন অষ্ট্রীয়ান্ বৈজ্ঞানিক আল্‌প্‌স সন্নিহিত প্রদেশের বায়ুতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ আছে, তাহা স্থির করিবার জন্য পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরীক্ষাক্ষেত্রটি একটি ঝরণার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল। এই স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাঁহারা অপর বৈজ্ঞানিকদিগকে ইহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেনার্ড সাহেব (Herr Lenard) এই সময়ে বিদ্যুতের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সংবাদটি কর্ণগোচর হইলে সুইজার্‌ল্যাণ্ডের পর্ব্বতময় প্রদেশে তিনি স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নিকটেই দুই তিনটি বৃহৎ জলপ্রপাত ছিল। লেনার্ড সাহেব এখানেও বিদ্যুতের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহারা কোন নূতন প্রাকৃতিক ঘটনাকে সম্মুখে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। তাহার মূলতত্ত্বটির আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাঁদের সাধনার বিরাম থাকে না। লেনার্ড সাহেব এই নূতন বৈদ্যুতিক ব্যাপারটি লক্ষ্য করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। ইহাকে অবলম্বন করিয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং শেষে দীর্ঘ সাধনার ফলে পরীক্ষাক্ষেত্রের জলপ্রপাতগুলিকেই তিনি বিদ্যুতের উৎপাদক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বৃহৎ জলপ্রপাত বা সুবিস্তীর্ণ জলাশয়ের মোটেই আবশ্যক হয় না। ক্ষুদ্র জলপ্রপাতগুলিও যথেষ্ট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে পারে।

জলপ্রপাতের নিকটবর্ত্তী স্থান যে বিদ্যুৎপূর্ণ থাকে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে দুই একজন তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এই ব্যাপারটির ব্যাখ্যানে বলিলেন, —আকাশের বায়ুতে সাধারণতঃ যে বিদ্যুৎ থাকে, তাহাই ঝরণার সন্নিহিত জলকণাপূর্ণ বায়ুতে বিপরীতজাতীয় বিদ্যুতের সঞ্চয় (Induction) আরম্ভ করে। ইহারই ফলে আমরা ঐ সকল স্থানের বায়ুতে বিদ্যুতের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাই।

লেনার্ড সাহেব বহু অনুসন্ধান করিয়াও পূর্ব্বোক্ত কথাটির সত্যতা দেখিতে পান নাই। ইনি বলিতেছেন, জল বাষ্পীভূত হইলে, বা জলবিন্দুগুলি সবেগে বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করিলে

অতি অল্প বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়। প্রপাতের ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলি পর্ব্বতের গাত্রে বা শিলাতলে পড়িয়া ছিন্ন হইতে থাকিলে যে বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, তাহারই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। লেনার্ড সাহেবের মতে, আকাশের অধিকাংশ বিদ্যুৎই জলকণার ঐ প্রকার ভাঙাগড়া হইতে উৎপন্ন।

পরীক্ষাশালায় এবং উন্মুক্ত প্রান্তরে কৃত্রিম জলপ্রপাত রচনা করিয়া নানাপ্রকার পরীক্ষা করা হইয়াছিল। প্রত্যেক পরীক্ষাতেই জলবিন্দুগুলির বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর বিদ্যুৎ দেখা দিয়াছিল।

ধূলিহীন পরিষ্কার বায়ুর ভিতরে পিচ্‌কারি দ্বারা বার বার জলধারা চালনা করিতে থাকিলে, বায়ু বিদ্যুৎ-যুক্ত হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসর হইল লর্ড কেল্‌ভিন্‌ এবং অধ্যাপক ম্যাক্‌লিন্‌ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। লেনার্ড সাহেবের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি হইতে ইহারও একটি ব্যাখ্যান পাওয়া যায়। বায়ুর ভিতর দিয়া যাইবার সময় জলধারা যখন সহস্র সহস্র জলকণায় পরিণত হইয়া পড়ে,তখনই বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বলা বাহুল্য যে, কেবল জলপ্রপাতের ধারাই বিদ্যুতের উৎপাদন করে না। নদী সমুদ্র প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ের তরঙ্গমালার সহিত কূলের সংঘর্ষণ এবং বৃষ্টির জলবিন্দুগুলির সহিত ভূমির সংঘাত প্রভৃতি নানা ব্যাপার বায়ুতে সর্ব্বদাই বিদ্যুৎ জোগাইতেছে। এমন কি সহরের রাস্তায় এবং বাগিচার গাছগুলির উপরে আমরা যখন জলসেচন করি, তখন এই সকল কার্য্য দ্বারাও আমাদের অলক্ষ্যে এক একটু বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে।

ক্ষুদ্র জলবিন্দু ক্ষুদ্রতর হইয়া ছড়িয়া পড়িলে কেন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয়, এখন আলোচনা করা যাউক। আমরা প্রথমে লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানেরই আলোচনা করিব। ইনি প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদিগের ন্যায় দুই জাতীয় বিদ্যুতের অস্তিত্ব মানিয়া লইয়াছিলেন, এবং তার পর প্রত্যেক জলবিন্দুকে ধনাত্মক (Positive) এবং ঋণাত্মক (negative) এই দুই বিদ্যুতের দুইটি পৃথক আবরণে আচ্ছাদিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। এই প্রকার জলবিন্দু যখন কঠিন মৃত্তিকা বা প্রস্তরাদিতে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার ঋণাত্মক-বিদ্যুতের বহিরাবরণটা ছিন্ন হইয়া বায়ুকে বিদ্যুৎপূর্ণ করে বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছিল।

লেনার্ড সাহেবের ব্যাখ্যানটি সহজ হইলেও প্রকৃত ব্যাপারটি যে এত সহজে সম্পন্ন হয় না, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত টমসন্‌ সাহেব (Prof. J. J. Thomson) বিষয়টির আলোচনা করিয়া ঠিক এই মন্তব্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইনি বলেন, কোন জিনিসে শক্তি প্রয়োগ করিলে, সেই শক্তি অবস্থাবিশেষে পড়িয়া তাপ এবং বিদ্যুৎপ্রভৃতিতে পরিণত হয় সত্য, কিন্তু জলবিন্দু ভাঙ্গিয়া যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তাহাকে শক্তির প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনের ফল বলা যায় না। জলধারাকে কেবল বায়ুর ভিতর দিয়া না চালাইয়া নানাজাতীয় বাষ্পের মধ্যদিয়া প্রবাহিত করায় অধ্যাপক টমসন্‌ বিদ্যুতের পরিমাণে বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই জন্য বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সহিত নিশ্চয়ই রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল। জলীয় বাষ্পপূর্ণ পাত্রের ভিতর দিয়া জলধারা প্রবাহিত করিলে

বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু জলীয় বাষ্পের স্থানে বায়ু বা অপর কোন বাষ্প রাখিলেই বিদ্যুৎ দেখা দেয়। ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্ মিশ্রিত জলের প্রবাহ চালাইয়া বিদ্যুৎ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্লোরিনের স্থানে হাইড্রোজেন্ বাষ্প প্রবেশ করাইবামাত্র বিদ্যুতের সঞ্চয় আরম্ভ হইয়াছিল। এই সকল পরীক্ষার বিবরণ পাঠ করিলে, আকাশের বিদ্যুৎ-উৎপত্তির সহিত যে রাসায়নিক ব্যাপার জড়িত আছে, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

অধ্যাপক টম্‌সন্ তাঁহার পরীক্ষাগুলি দ্বারা রাসায়নিক কার্য্যের লক্ষণ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কার্য্যগুলি কি প্রকারে চলে তিনি তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন।

যে সকল পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন বিসদৃশ, তাহাদেরই মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ বিয়োগের কার্য্য প্রবলভাবে চলে। এটি রাসায়নিক কার্য্যের একটা গোড়ার কথা। ক্লোরিন্ এবং আয়োডিন্ প্রভৃতি জিনিস গুলির রাসায়নিক প্রকৃতি প্রায় অভিন্ন। তাই ইহাদিগকে একত্র রাখিলে কেন রাসায়নিক কার্য্য দেখা যায় না। কিন্তু হাইড্রোজনের ন্যায় আর একটি পৃথক্‌ধর্ম্মী জিনিসের সহিত সেই ক্লোরিন্ ও আয়োডিন্‌কে মিশাইলে রাসায়নিক কার্য্য আরম্ভ হইয়া পড়ে।

অধ্যাপক টমসন্ পূর্ব্বোক্ত রাসায়নিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জল এবং বায়ুর রাসায়নিক প্রকৃতির মধ্যে কোন মিল নাই। এইজন্য জলবিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম কণিকাগুলি যখন বায়ুর ভিতর দিয়া নীচে নামিতে আরম্ভ করে, তখন আপনা হইতেই রাসায়নিক কার্য্য সুরু হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতেরও উৎপত্তি দেখা যায়। জলীয় বাষ্প এবং জলবিন্দুর রাসায়নিক প্রকৃতি মূলে এক। এই কারণে টমসন্ সাহেব জলীয় বাষ্পের ভিতর দিয়া জলধারার উৎক্ষেপ করিয়া বিদ্যুতের উৎপত্তি দেখিতে পান নাই; এবং পরে ক্লোরিন্ বাষ্পের ভিতর দিয়া ক্লোরিন্ মিশ্রিত জলধারা চালনা করায় বিদ্যুৎ জন্মায় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণ জলবিন্দু যখন বায়ুর ভিতর দিয়া চলিয়া আসে, তখন বিদ্যুতের উৎপত্তি হয় না। সেই জলবিন্দুই যখন কোন প্রকারে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলকণিকায় পরিণত হইয়া বায়ুর ভিতর দিয়া নামিতে থাকে কেবল তখনই বিদ্যুৎ জন্মায়। অধ্যাপক টমসন্ এই ব্যাপার সম্বন্ধেও কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। কোন কঠিন তরল বা বায়বীয় পদার্থের অণু যখন অণুর (molecules) আকারে থাকে, তখন তাহা বিদ্যুৎকে বহন করিতে পারে না। বিদ্যুৎ বহন করিয়া অপর পদার্থে দিতে হইলে পরমাণুর (Atoms) সাহায্য প্রয়োজন। এইজন্য কোন বিদ্যুৎযুক্ত বায়বীয় পদার্থের অন্তত কতক অংশ ভাঙিয়া চুরিয়া পরমাণুর আকার গ্রহণ না করিলে সেই বস্তু হইতে বিদ্যুৎ নির্গত হয় না। অধ্যাপক টমসন্ এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জলবিন্দুসকল সূক্ষ্ম জলকণিকার আকার গ্রহণ করিলে, অণুর ভাঙা-গড়া ব্যাপারটি অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে থাকে; এবং তার পর ইহার সহিত বায়ুর নাইট্রোজেন্ ও অক্সিজেনের ভাঙাগড়া যোগ দিলে, বিদ্যুতের পরিমাণ প্রচুর হইয়া দাঁড়ায়।

বিদ্যুৎস্ফুরণ এবং বজ্রপাত প্রভৃতি বৈদ্যুতিক ঘটনার সহিত আমাদের খুব

ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, তাহাদের গোড়ার খবরটি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম না। আকাশের বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিতে গেলে যে, রাসায়নিক কার্য্যের প্রয়োজন হয়, তাহাও আমরা পূর্ব্বে অনুমান করিতে পারি নাই। ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রাকৃতিক কার্য্যগুলি সর্ব্বদাই কঠোর নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া কেবল পরস্পরের সাহায্যেই যে, এই পৃথিবীকে এমন সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে, আকাশের বিদ্যুৎ-সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারগুলি হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আমাদের অসম্পূর্ণ স্থূল দৃষ্টি প্রাকৃতিক ব্যাপারগুলিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে বলিয়াই আমরা জগদীশ্বরের প্রকৃত মহিমার উপলব্ধি করিতে পারি না। সকলই যেন ছাড়া ছাড়া ভাবে আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে। অথচ আমরা যে সকল ঘটনাকে বিপরীত এবং অসম্বদ্ধ বলি, তাহাদেরও তলে সর্ব্বদাই যোগসূত্র বর্ত্তমান। জগদীশ্বর যে সোনার তারে ক্ষুদ্র বৃহৎ এবং সম্পর্কিত অসম্পর্কিত ঘটনাগুলির মধ্যে যোগ-সাধন করিয়া এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে যন্ত্রবৎ চালাইতেছেন, তাহার সন্ধান করিতে পারিলেই বিজ্ঞানালোচনা সার্থক হইবে, এবং মানব ধন্য হইবে।

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

## মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

মানব কার্য্যের ভাল-মন্দ বাস্তব-লক্ষণযুক্ত,—যদিও ঐ সকল লক্ষণ চক্ষের দ্বারাও দর্শন করা যায় না, হস্তের দ্বারাও স্পর্শ করা যায় না। কোন কার্য্যের ভৌতিক গুণের সহিত তাহার নৈতিক গুণকে একীভূত করা যায় না বলিয়া সেই নৈতিক গুণ যে কম নিশ্চিত তাহা নহে। এইজন্যই, যে সকল কার্য্য ভৌতিক হিসাবে সমান, তাহা নৈতিক হিসাবে খুবই ভিন্ন। হত্যা সকল সময়েই হত্যা; তথাপি, অনেক সময়, উহা মহাপরাধ হইলেও বৈধকার্য্যরূপে পরিগণিত হয়; তাহার দৃষ্টান্ত,—যখন হত্যার সহিত প্রতিশোধ লইবার ভাব না থাকে, স্বার্থের সংস্রব না থাকে, যখন শুধু আত্মরক্ষণের জন্যই হত্যাকার্য্য সাধিত হয়, তখন সে হত্যা বৈধ হত্যা। রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয় না, নির্দ্দোষীর রক্তপাত করিলেই মহাপরাধ হয়। নির্দ্দোষিতা ও অপরাধ, ভাল ও মন্দ,—চিরকালের জন্য নির্দ্দিষ্ট অমুক অমুক বাহ্য অবস্থার মধ্যে অবস্থিতি করে না। বাহ্য-রূপ বিভিন্ন হইলেও, বাহ্য অবস্থা কখন সমান কখনও অসমান হইলেও, উহার মধ্য হইতে নির্দ্দোষিতা ও অপরাধকে, ভাল ও মন্দকে, জ্ঞান ঠিক চিনিয়া লইতে পারে।

আমাদের মনে হয়, ভাল মন্দ যেন সব সময়েই বিশেষ বিশেষ কার্য্য লইয়াই ব্যাপৃত; কিন্তু সেই সব কার্য্যের যে বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বের দরুণ সেই সব কার্য্য আসলে ভাল কিংবা মন্দ নহে। তাই, আমরা যখন বলি, সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ডটা অতীব অন্যায় এবং লেওনিডাসের আত্মবলিদান অতীব প্রশংসনীয়, তখন আমরা একজন জ্ঞানী ব্যক্তির অন্যায় মৃত্যুদণ্ডকেই দূষণীয় মনে করি, এবং একজন বীরের আত্মোৎসর্গকেই প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করি;—সেই বীরের নাম লেওনিডাসই হউক কিংবা Assas হউক, সেই জ্ঞানীর নাম সক্রেটিসই হউক কিংবা Barllyই হউক, তাহতে কিছুই আসিয়া যায় না।

আমাদের ভাল-মন্দসংক্রান্ত বিচার-

ক্রিয়া প্রথমে বিশেষ বিশেষ কার্য্যেই প্রযুক্ত হয় এবং সেই বিচারক্রিয়া হইতেই কতকগুলি সাধারণ মূলতত্ত্ব প্রসূত হয়, —যাহা পরে সদৃশ কার্য্য সকল বিচার করিবার সময়ে বিচারের নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। যেমন অমুকটির অমুক কারণ ইহা বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিবার পরে আমরা এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, সেইরূপ আমরা বিশেষ বিশেষ কার্য্যসম্বন্ধে যে নৈতিক সিদ্ধান্ত করি, তাহাই আমাদের নৈতিক বিষয়সংক্রান্ত বিচারের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়ায়। তাই প্রথমে আমরা লেওনিডাসের মৃত্যুর প্রশংসা করি; পরে তাহা হইতেই এই সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে স্বদেশের জন্য প্রাণ দেওয়া ভাল। লেওনিডাসের সম্বন্ধে যখন এই সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়াছিলাম তখনও এই সিদ্ধান্তটি আমাদের জানা ছিল, তাহা না হইলে এই বিশেষ স্থলে উহার প্রয়োগ অবৈধ হইত, এমন কি, উহা প্রয়োগ করা সম্ভব হইত না, পরন্তু ঐ বিশেষ প্রয়োগের সহিত ঐ সাধারণ সিদ্ধান্তটি জড়িত ছিল। পরে যখন এই সাধারণ সিদ্ধান্তটি বিশেষ হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিল, সার্ব্বভৌম ও অবিমিশ্র আকারে আমাদের নিকট আবির্ভূত হইল, তখন ঐ সিদ্ধান্তকে আমরা সদৃশ স্থলে প্রয়োগ করিতে লাগিলাম।

অন্য বিজ্ঞানের ন্যায়, নীতিশাস্ত্রেরও কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মূলসূত্র আছে; সকল ভাষাতেই এই সকল মূলসূত্র ন্যায্যরূপ নৈতিক সত্যরূপে অভিহিত হইয়া থাকে।

শপথ ভঙ্গ করা উচিত নহে ইহাওএকটি সত্য। বস্তুতঃ শপথ রক্ষা করা সত্যের মধ্যেই ধর্ত্তব্য এবং এই উদ্দেশেই বিচারালয়ে শপথ করান হয়। নৈতিক সত্যগুলি, সত্যের হিসাবে গাণিতিক সত্য হইতে কম নিশ্চিত নহে। গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণাটা যদি গোড়ায় ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আমি জিজ্ঞাসা করি,—যেমন ত্রিকোণের ধারণার সহিত এই তত্ত্বটি সংযুক্ত থাকে যে, উহার তিন কোণ উহার দুই ঋজু কোণের সমান, সেইরূপ গচ্ছিত দ্রব্যের ধারণার সহিত এই ধারণাটি সংযুক্ত থাকে কি না যে, বিশ্বাসভঙ্গ না করিয়া ঐ গচ্ছিত দ্রব্য রক্ষা করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। তুমি ইচ্ছা করিলে এই গচ্ছিত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসভঙ্গ করিতে পার; কিন্তু এই বিশ্বাসের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, তুমি সত্যকে উল্টাইতে পার এরূপ মনে করিও না; কিংবা ইহাও মনে করিও না যে গচ্ছিত বস্তু কখনও নিজস্ব হইতে পারে। এই দুই ধারণা পরস্পরকে খণ্ডন করে। গচ্ছিত দ্রব্য নিজস্ব-রূপে ব্যবহার করিলে, উহা স্বামিত্বের সাদৃশ্য ধারণ করে মাত্র, কিন্তু আসলে উহাতে স্বামিত্ব বর্ত্তায় না; প্রবৃত্তির আবেগ যতই হউক না, স্বার্থের মিথ্যা জল্পনা উহার সমর্থনে যতই চেষ্টা করুক না, উহাদের মধ্যে যে স্বরূপগত ভেদ আছে তাহা কখনই উল্টাইতে পারিবে না। এই জন্যই নৈতিক সত্য এরূপ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অন্য সত্যের ন্যায়, নৈতিক সত্যও—যাহা আছে তাহাই আছে; কাহারও খেয়ালে উহা একটুও এদিক ওদিক হয় না।

অন্য সত্যের সহিত নৈতিক সত্যের বিশেষত্ব এইটুকু ঃ—নৈতিক সত্য যখনই আমাদের জ্ঞানগোচর হয়, তখনই আচরণের নিয়মরূপে উহা আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়। যদি এ কথা সত্য হয় যে, যথার্থ অধিকারীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্যই কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, তাহা

হইলে সেই দ্রব্য তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতেই হইবে। বিশ্বাসের অবশ্যম্ভাবিতার সহিত এস্থলে কার্য্যের অবশ্যম্ভাবিতা সংযোজিত হইয়াছে। কার্য্যের যে এই অবশ্যম্ভাবিতা—ইহাই কর্ত্তব্যতা। যে নৈতিক সত্যসমূহ, জ্ঞানের চক্ষে অবশ্যম্ভাবী, তাহাই ইচ্ছার নিকট কর্ত্তব্য। অর্থাৎ ইচ্ছা তাহা করিতে বাধ্য। যে নৈতিক সত্য কর্ত্তব্যের মূলীভূত, সেই নৈতিক সত্যের ন্যায় নৈতিক কর্ত্তব্যও, স্বয়ংসিদ্ধ অর্থাৎ অনন্যাপেক্ষ। যেমন অবশ্যম্ভাবী সত্যগুলি, ন্যূনাধিকরূপে অবশ্যম্ভাবী নহে, সেইরূপ নৈতিক কর্ত্তব্যও ন্যূনাধিক পরিমাণে কর্ত্তব্য নহে। বিভিন্ন কর্ত্তব্যের মধ্যে গুরু লঘুতার ধাপ আছে সত্য, কিন্তু স্বয়ং কর্ত্তব্যতার মধ্যে ওরূপ কোন ধাপ নাই। কোন স্থলেই "প্রায় কর্ত্তব্য" এরূপ কথা বলা যাইতে পারে না, কর্ত্তব্য কিংবা কর্ত্তব্য নহে—ইহার মাঝামাঝি কিছু নাই।

যদি কর্ত্তব্যতা স্বয়ংসিদ্ধ হয়—তাহা হইলে উহা অপরিবর্ত্তনীয় ও সার্ব্বভৌম। কারণ, যদি আজিকার কর্ত্তব্য কল্যকার কর্ত্তব্য হইতে না পারে, তাহা হইলে স্বয়ং কর্ত্তব্যতার মধ্যেই একটা প্রভেদ আসিয়া পড়ে,—তাহা হইলে কর্ত্তব্যকে আপেক্ষিক ও আগন্তুক বলিতে হয়।

কর্ত্তব্যের এই স্বয়ংসিদ্ধতা, অপরিবর্ত্তনীয়তা, সার্ব্বভৌমতা এত নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট যে, স্বার্থবাদীরা উহাকে তিমিরাচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও, আধুনিক তত্ত্ববিদ্যা-জগতের একজন গভীর নীতিবেত্তা, কর্ত্তব্যের উপরি-উক্ত লক্ষণগুলি বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহার বিবেচনায় ঐ গুলিই সমগ্র নীতির মূলতত্ত্ব। যে স্বার্থ কর্ত্তব্যকে ধ্বংস করে এবং যে ভাবরস কর্ত্তব্যকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, ঐ উভয় হইতেই Kant কর্ত্তব্যকে পৃথক্ করিয়া কর্ত্তব্যের প্রকৃত লক্ষণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। Helvetius এর যুগে তিনি কর্ত্তব্যের পবিত্র নিয়ম পর্য্যন্ত উত্থান করিয়া কর্ত্তব্যের উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তিনি যথেষ্ট উচ্চে ওঠেন নাই;—তিনি কর্ত্তব্যের মূল তত্ত্বে উপনীত হন নাই।

Kant-এর মতে, যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাই ভাল, তাহাই মঙ্গল। কিন্তু যুক্তির নিয়মানুসারে,—কোন কার্য্য স্বতঃ ভাল না হইলে, সেই কার্য্য সাধন করিবার অবশ্যতা কোথা হইতে আসিবে? কোন গচ্ছিত বস্তু নিজস্ব—এই কথা আমাদের জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বলিয়াই গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করা অপরাধের কার্য্য হয় নাই কি? যদি কোন কার্য্য উচিত এবং কোন কার্য্য অনুচিত হয়, তাহা হইলে এই দুই কাজের মধ্যে একটা মূলগত প্রভেদ অবশ্যই আছে। ভালোর উপর অবশ্যতা স্থাপন না করিয়া অবশ্যতার উপর ভালোকে স্থাপন করাও যা—কারণকে কার্য্যরূপে গ্রহণ করাও তা', কার্য্য হইতে কারণকে বাহির করাও তা'।

যদি কোন সজ্জনকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নিজের দুঃখদারিদ্র্য সত্ত্বেও সে গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ করিল না কেন? সে উত্তর করিবেঃ—আত্মসাৎ না করাই তাহার কর্ত্তব্য। তাহার পরেও যদি আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কিজন্য ইহা তাহার কর্ত্তব্য, সে এই প্রশ্নের উত্তরে এই কথা আমাকে বেশ বলিতে পারেঃ—কারণ ইহাই ন্যায়সঙ্গত কাজ, ভাল কাজ। ঐখানে আসিয়াই সমস্ত উত্তর থামিয়া যায়। ঐখানে সমস্ত প্রশ্নও থামিয়া যায়। এ কথা যখনই স্বীকার করা হয়,—যাহা

আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে তাহা ন্যায়বুদ্ধি হইতে প্রসূত, তখনই মন পরিতুষ্ট হয়। কারণ উহা এমন একটা মূলতত্ত্বে আসিয়া পৌঁছোয় যাহার ও-দিকে আর কিছুই অন্বেষণ করিবার নাই;—কারণ, ন্যায় আপনই আপনার মূলতত্ত্ব। ন্যায়ের সহযোগেই নৈতিক সত্যগুলির সত্যতা নিষ্পন্ন হয়। মনুষ্যের পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ—সেই সম্বন্ধের মধ্যে যে ভাল ও মন্দ প্রকাশ পায় সেই ভাল ও মন্দের মূলগত প্রভেদটি কি?—না, ন্যায়। এই ন্যায়ই ধর্ম্মনীতির সর্ব্বপ্রধান তত্ত্ব।

ন্যায়—কোন কারণের কার্য্য নহে, কেন না, উহা অপেক্ষা উচ্চতর মূলতত্ত্বে আরোহণ করা অসম্ভব। খুব ঠিক করিয়া বলিতে গেলে, কর্ত্তব্য মূলতত্ত্ব নহে, কারণ কর্ত্তব্যের উপরেও আর একটি মূলতত্ত্ব আছে, যাহা কর্ত্তব্যে প্রযুক্ত হয়, যাহার উপর কর্ত্তব্যের প্রামাণিকতা নির্ভর করে—সে কি?—না, ন্যায়।

(ক্রমশঃ)

---

## মার্কস অরিলিয়াসের আত্মচিন্তা।

শুধু তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও, আর কিছুর জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক, লোকে তোমায় ভাল বলুক, মন্দ বলুক, কিছুরই জন্য চিন্তা করিও না; এমন কি মৃত্যুকেও ভয় করিও না। জানিবে, জীবনকে ত্যাগ করাও জীবনের একটা কাজ; বর্ত্তমান কালের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেই যথেষ্ট।

সকল বস্তু তলাইয়া দেখিবে; কোন জিনিসের আসল গুণটি যেন তোমার দৃষ্টিকে এড়াইয়া না যায়।

কোন অনিষ্টাচরণের অনুকরণ না করাই প্রতিশোধ লইবার প্রকৃষ্ট পন্থা।

জগতে যাহা কিছু হইতেছে সমস্তই একজন জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের দ্বারাই হইতেছে। এই বিশ্ব-কারণের অন্য কোন সহকারী নাই; কি বাহিরে, কি অভ্যন্তরে—আর কোন মূলতত্ত্ব আসিয়া উহার স্থান অধিকার করে নাই।

হয় এই জগৎ কতকগুলা পরমাণুর সমষ্টি—যদৃচ্ছাক্রমে একবার মিশিতেছে, আবার পৃথক হইয়া পড়িতেছে; নয় এই জগৎ সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত নিয়মের অধীন। যদি পূর্ব্বোক্ত কথাই ঠিক্ হয়, তবে কি জন্য আমি এমন জগতে থাকিতে যাই যেখানে এরূপ বিশৃঙ্খলা এবং যেখানে সমস্ত পদার্থ এরূপ অন্ধভাবে একত্র মিশ্রিত হইয়াছে; তবে, যত শীঘ্র পারি পঞ্চভূতের সঙ্গে পুনর্ব্বার মিশিয়া যাওয়া ছাড়া আমার আর কিসের ভাবনা? তবে আর কিসের জন্য আমি এত কষ্ট পাই? যাই আমি করি না কেন, আমার পঞ্চভূত ত চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইবেই। কিন্তু জগতের যদি কোন বিধাতা পুরুষ থাকেন,—তবে সেই জগতের মহান্ নিয়ন্তা ও শাসয়িতাকে আমি পূজা করিব, এবং তাঁহারই আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে ও প্রফুল্লচিত্তে জীবন যাপন করিব।

কোন প্রতিকূল ঘটনা তোমার চিত্তকে বিচলিত করিবামাত্র—তুমি তোমার অন্তরের জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিবে, প্রয়োজন না হইলে সেখান হইতে একপাও বাহির হইবে না; সেখানে গেলে,সে ঘটনা তোমার নিকট আর বেসুরা বলিয়া ঠেকিবে না—আবার সামঞ্জস্য লাভ করিয়া উহা তোমার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে।

এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ কর, যদি তোমার

সৎমা ও মা উভয়ই থাকেন, তুমি তোমার সৎমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর, কিন্তু মার সঙ্গেই তোমার বেশী কথাবার্ত্তা হয়। সংসার ও তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ; সর্ব্বদা তত্ত্বজ্ঞানের নিকট থাকিয়াই তুমি বেশী আরাম ও আনন্দ লাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞানসম্মত ধর্ম্মজীবন যাপন করিলেই সংসার তোমার নিকট সহনীয় হইবে, তুমিও সংসারের নিকট সহনীয় হইবে।

যখন কোন আমিষ-ব্যঞ্জন আমাদের নিকট আনীত হয়—তখন আমরা যেন মনে করি, ইহা একটা মৎস্যের মৃত শরীর, ইহা একটা পাখীর মৃত শরীর, এবং অন্যটি শূকরের মৃত শরীর; এই যে মদ্য—ইহা কতকগুলা আঙ্গুরকে পিষিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এই যে আমার রাজপরিচ্ছদ—ইহা মেষের কতকগুলা লোম পাকাইয়া শামুকের রক্ত দিয়া রঞ্জিত। এইরূপ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়সুখের সামগ্রীর কথা যদি ভাবিয়া দেখি ত দেখিব, উহারা ঐরূপ স্থূল উপাদানেই নির্ম্মিত; এবং এই ধারণাটিকে যেন আমাদের জীবনের সমস্ত বাহ্যাড়ম্বরে আমরা প্রয়োগ করি। যখন কোন বস্তুর বাহ্য চাকচিক্যে আমরা মুগ্ধ হই তখন তাহাকে যেন আমরা পরোখ করিয়া দেখি; যে সকল বাক্য তাহাকে সপ্তমস্বর্গে উত্তোলন করে সেই বাক্যাবরণটা তাহা হইতে খসাইয়া ফেলিলেই তাহার অসারতা উপলব্ধি হইবে। এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, বাহ্যরূপ ও আকারে বড়ই বিড়ম্বিত হইতে হয়। বাহ্যরূপের ন্যায় প্রবঞ্চক আর দ্বিতীয় নাই। যখনই কোন পার্থিব পদার্থে মুগ্ধ হইবে, তখনই জানিবে তুমি প্রবঞ্চিত হইয়াছ।

যদি দেখ, কোন একটা বিষয় খুবই কঠিন, তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ করিও না যে, কেহই উহা আয়ত্ত করিতে পারে না। যদি বিষয়টা যথোপযুক্ত হয় এবং আর কোন ব্যক্তির পক্ষে সুসাধ্য হয়, তাহা হইলে বিশ্বাস করিও—উহা তোমারও সাধ্যায়ত্ত।

আমার ভুল যদি আমাকে কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি হৃষ্টচিত্তে আমার মত পরিবর্ত্তন করিব। কেন না, আমার কাজ—সত্যানুসন্ধান করা; এ পর্য্যন্ত সত্যের দ্বারা কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই। যে ব্যক্তি অজ্ঞতা ও ভ্রমকেই ধরিয়া থাকে, তাহারই অনিষ্ট হয়।

আমি আমার কর্ত্তব্য করিতেছি—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; আর কোন বিষয়ের জন্য আমি উদ্বিগ্ন হইব না।

---

## মনুর উপদেশ।

### গায়ত্রীমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা।

একাক্ষরং পরং ব্রহ্ম প্রাণায়ামাঃ পরংতপঃ।
সাবিত্র্যাস্তু পরং নাস্তি মৌনাৎ সত্যং বিশিষ্যতে॥

একাক্ষর প্রণবই পরব্রহ্ম অর্থাৎ পরব্রহ্মপ্রতিপাদক; প্রাণায়ামই পরম তপস্যা; সাবিত্রীর পর আর মন্ত্র নাই এবং মৌন হইতে সত্যই বিশিষ্ট। ("মৌন হইতে সত্যই বিশিষ্ট" একথা এ স্থলে বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই হইতে পারে—মৌন হইয়া গায়ত্রীমন্ত্রকে গুপ্ত রাখা অপেক্ষা প্রকাশ করাই ভাল—কেন না উহা সত্য।)

ক্ষরন্তি সর্ব্বা বৈদিক্যো জুহোতি যজতি ক্রিয়াঃ
অক্ষরস্ত্বক্ষরং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম চৈব প্রজাপতিঃ।

বৈদিক হোম-যাগাদি সমুদয় ক্রিয়ারই ক্ষরণ হয় অর্থাৎ ক্ষয় হয়, কিন্তু অক্ষর অর্থাৎ এই যে প্রণব-অক্ষর ওঁ, ইহা অক্ষর অর্থাৎ ক্ষয় হয় না; এবং ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়।

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃস্মৃতঃ॥

বিধিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জপযজ্ঞ অর্থাৎ গায়ত্রীমন্ত্র জপ দশগুণে বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। জপ-যজ্ঞের মধ্যে উপাংশু জপ (যে জপ-মন্ত্র উচ্চারিত হইয়া সমীপস্থ লোককর্ত্তৃকও শ্রুত হয় না) শতগুণে বিশিষ্ট, উপাংশু হইতে আবার মানস জপ (অর্থাৎ মনে মনে জপ) সহস্রগুণে বিশিষ্ট। (শূদ্রাদি শুনিবে বলিয়া নহে, মানস-জপে জপের একাগ্রতা ও গাঢ়তা বৃদ্ধি পায় বলিয়া। অনেকের ধারণা, উচ্চৈঃস্বরে সকলের সমক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ; তাহা যদি হইত, এখানে এই তিন প্রকার গায়ত্রী জপের উল্লেখ করা হইত না। তবে, মানস জপ সর্ব্বাপেক্ষা ফলপ্রদ এইমাত্র ইহাতে বলা হইয়াছে।)

যে পাকযজ্ঞাশ্চত্বারো বিধিযজ্ঞ সমন্বিতা।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

বিধিযজ্ঞসমন্বিত এই যে চারিটি মহা-যজ্ঞ (দেব, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃযজ্ঞ)—এই সমস্ত যজ্ঞের পুণ্যফল, ব্রহ্মযজ্ঞরূপ এই জপ-যজ্ঞের ষোড়শ ভাগেরও এক ভাগ হয় না।

জপেনৈব তু সংসিধ্যেদ্‌ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদ্ মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

বৈদিক কার্য্য করুন আর নাই করুন, ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণ কেবলমাত্র জপবলে সিদ্ধি-লাভ করিবেন, ইহাতে আর সংশয় নাই—ব্রাহ্মণ, মৈত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। (মৈত্র কি না, সর্ব্বভূতের মিত্র; ভাবার্থ এই,—যেহেতু অন্য বৈদিক যজ্ঞের ন্যায় জপযজ্ঞে পশুবধের বিধি নাই, অতএব, মৈত্র ব্রাহ্মণের পক্ষে জপযজ্ঞই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সময়ে মনুসংহিতা সংকলিত হয়, সেই সময়ে প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞের প্রতি একটু বৈমুখ্য আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।)

---

## মৃত্যুভয়—মৃত্যুঞ্জয়।

(আদি-ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে)

আপনারা যুধিষ্ঠির ও যক্ষের গল্প শুনিয়া থাকিবেন। যক্ষ যুধিষ্ঠিরকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিল, তার মধ্যে এই এক প্রশ্ন ছিল যে, পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমিতঃপরং।

প্রতি মুহূর্ত্তে কত কত লোক যমমন্দিরে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি অন্যেরা স্থিরত্ব ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি আছে?

আশ্চর্য্য বটে কিন্তু আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে দেখা যায়, যে যদি মৃত্যুর বিভীষিকা অনুক্ষণ আমাদের চক্ষের সামনে থাকে, তাহা হইলে আমাদের গতি কি হয়? আপনার জন্যই হোক্, পরের জন্যই হোক্, কোন কর্ম্মে কি আমাদের প্রবৃত্তি থাকে? মৃত্যুভয়ে শশব্যস্ত থাকিয়া আমরা উদাসীন বীর্য্যহীন নিশ্চেষ্ট অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। আমরা যে মৃত্যুকে দেখিয়াও দেখি না, এই অন্ধতা হইতেই আমাদের রক্ষা। মৃত্যু যেমন হইবেই নিশ্চয়, আবার তার মধ্যে একটু অনিশ্চিৎ ভাব ও আছে, কোন্ সময়ে আসে তার স্থিরতা নাই—সেই ভরসায় আমরা জীবন ধারণ করি—হাঁসিয়া খেলিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই। যদি কোন গণৎকার গণিয়া বলিতে পারে যে, তোমার অমুক দিনে মৃত্যু হইবে, আর তার কথায় আমার ধ্রুব-বিশ্বাস জন্মে, তাহা হইলে আমার দশা কি হয়? জীবনের প্রতি অনুরাগশূন্য হইয়া কি নির্ব্বীর্য্য নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি না?

তেমনি আবার মৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া থাকাতেও দোষ। যা সত্য—যা

অবশ্যম্ভাবী তার প্রতি অন্ধ থাকিলে আমাদের সেই শশকের দশা হয়, যে শিকারী আসিতেছে দেখিয়া চক্ষু বুজিয়া মনে করে এখন আর কোন ভয় নাই। যা সত্য তা আমার হৃদয়গ্রাহী হোক্ বা না হোক্, সেটা জেনে রাখা—মনে রাখা কর্ত্তব্য। আসল কথা মৃত্যুকে কখনো বা স্মরণ করা—কখনো বা ভুলিয়া থাকা—এ দুইই চাই, যেমন আমাদের শাস্ত্রে আছে

> অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
> গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ॥

বিদ্যা ও অর্থ উপার্জ্জন করিবার সময় মনে করিবে আমি অজর, অমর, আর ধর্ম্ম আচরণ করিবার সময় ভাবিবে যেন মৃত্যু আমার কেশাকর্ষণ করিতেছে।

মৃত্যু এক হিসাবে আমাদের পরম হিতকারী বন্ধু, যে যখন আমরা মোহনিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়ি, তখন সে ঘুমঘোর হইতে আমাদিগকে জাগাইয়া তোলে। আমরা অহর্নিশ বিষয়-চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছি, উচ্চ-আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ভাবিবার একটুকু অবকাশও পাই না, এ অবস্থায় মৃত্যু হইতেই আমাদের চেতনা হয়। যখন আহার বিহার বিলাসিতার মধ্যেই জীবন ক্ষেপণ করি, তখন মৃত্যু উপহাস করিয়া বলে—

> "কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে।"

যখন আমরা সম্পদে স্ফীত হইয়া ধরাকে শরা জ্ঞান করি, আপনাকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়া আর সকলকে কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করি, তখন মৃত্যু স্মরণ করাইয়া দেয়

> "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর
> অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

যখন আমরা অর্থোপার্জ্জনকে জীবনের সার জানিয়া জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই, তখন মৃত্যু বলিয়া দেয়—

> "কিন্তু দেখ মনে ভেবে কেহ সঙ্গে নাহি যাবে
> অবশ্য ত্যজিতে হবে কিছু দিনান্তর।"

এই জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়-প্রলোভন হইতে মুক্ত করিয়া বৈরাগ্যের দিকে হাত ধরিয়া লইয়া যায়, এমন বন্ধু মৃত্যুর মত আর কে আছে? সহস্র উপদেশ, অশেষ শাস্ত্রালোচনায় যাহা না হয়, এক মৃত্যু তাহা এক মুহূর্ত্তে শিখাইয়া দেয়। মৃত্যুর নিকট লোকবিচার, জাতিবিচার নাই। আমরা এখানে ধনমদে মত্ত থাকি, আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া আস্ফালন করিয়া বেড়াই। যে বলী সে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, যার উচ্চকুলে জন্ম সে নীচ জাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, কিন্তু মৃত্যুর কাছে কোন ভেদাভেদ নাই; রাজা প্রজা ধনী দরিদ্র সকলেই সমান। এক সময় আসে যখন রাজার রাজদণ্ড তার হাত হইতে ভূতলে খসিয়া পড়ে—যখন জাতি কুলের মান মর্য্যাদা ধূলির সহিত মিশিয়া যায়, যখন অন্যায় অত্যাচার ভয়ে কম্পমান্, তখন মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য থাকে না; সকলকেই সেই জরা বার্দ্ধক্য আক্রমণ করে—সেই মৃত্যু আসিয়া সকলকে গ্রাস করিয়া ফেলে।

আমরা জীবদ্দশায় বিষয়-মোহে মুগ্ধ থাকিয়া অনেকবার আপনাদের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাই—মৃত্যু তাহা অব্যর্থরূপে স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা এখানে পাপাচরণ করিয়াও অনেক সময় আত্মগ্লানি ভোগ করি না। আমোদ প্রমোদ বিষয়-কোলাহলের মধ্যে আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকি। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! এমন এক সময় আসিবে, যখন সে ভুল ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তার জীবন্ত মূর্ত্তি নয়নের সম্মুখে উদয় হইবে। আপনার বিচারাসনে আপনাকেই সাক্ষ্য দিতে হইবে। যে ব্যক্তি কোন একটা বিশেষ পাপ পোষণ করিতেছে—কোন নিরপরাধীকে অকারণে উৎপীড়ন করিয়াছে, অন্যায়পূর্ব্বক কাহারো

ধন হরণ করিয়াছে, তাহার অন্তঃকরণ সূচি-বিদ্ধ হইতে থাকিবে। তাহা ছাড়াও আমাদের সমুদয় জীবনের একটা চিত্র সে সময় মনোমধ্যে উদয় হইবে—সময়ের কত অপব্যয় করিয়াছি, আলস্য প্রমাদে জীবন ব্যর্থ ক্ষেপণ করিয়াছি, আত্মোন্নতির কত সুযোগ অবহেলা করিয়াছি—আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থে মত্ত থাকিয়া পরের জন্য—দেশের জন্য কিছুই করি নাই—কত প্রকার কুৎসিত কার্য্যে আপনার জীবনকে কলুষিত করিয়াছি—যদি কোন সময় এই সকল চিন্তায় মনোবেদনা উপস্থিত হয়, সে সেই সময় যখন মৃত্যু আসিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার বিচারাসনে আমাদিগকে লইয়া যাইবে।

এই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্মিলে মরিতে হবে—যার জন্ম তার মৃত্যু—এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—বহিঃপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যেই জীবন। এই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যত দিন চলিতে পারি তত দিন জীবিত থাকি, এই সামঞ্জস্য নষ্ট হইলেই ক্ষয় ও মৃত্যু। জীবনের লক্ষণ পুষ্টি, বৃদ্ধি, বংশবিস্তার; আর ক্ষয় অসাড়তা নিশ্চেষ্টতা মৃত্যুর লক্ষণ। এক সময় আসিবে যখন আমার এই হাত অসাড় হইয়া পড়িবে—এই পা চলৎশক্তি রহিত হইবে—বাক্য নীরব হইবে—হৃদয়ের ধুকধুকানি থামিয়া যাইবে, এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এই মৃত্যু যদি অপরিহার্য্য, তবে কেন আমরা মৃত্যুকে এত ভয় করি? তাহার অনেকগুলি কারণ আছে।

প্রথম—জিজীবিষা—বাঁচিবার ইচ্ছা। আমরা হাজার দুঃখ কষ্টে পড়ি, এই জীবনের মায়া কাটানো দুঃসাধ্য। চিররোগী যে রোগশয্যায় দিনপাত করিতেছে, অন্ধ খঞ্জ বধির পৃথিবীর সঙ্গে যার সম্বন্ধ প্রায় সমস্ত লোপাপত্তি হইয়াছে, ভিখারী যে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কষ্ট শ্রেষ্টে দিনযাপন করিতেছে—তাহাদের কেহই এই হত জীবিত বিসর্জন করিতে প্রস্তুত নহে। ঈসপের কাটুরিয়ার গল্প জানেন। সে বোঝার ভারে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া মৃত্যুকে ডাকিতে লাগিল। যখন যমরাজ সত্যই তার সম্মুখে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি চাও? তখন কাটুরিয়া বলিল 'বাবা! তোমাকে ডেকেছি যে এই বোঝাটা আমার মাথায় উঠাইয়া দিবে।' আমাদের জীবনের মায়া এমনই প্রবল যে তাহা ছাড়িবার যে কষ্ট, তার সহিত অন্য কোন কষ্টের তুলনা হয় না।

দ্বিতীয়—বিচ্ছেদ। বিষয় ত্যাগ, প্রিয়জনের সহিত বিচ্ছেদ। যে প্রণয়ীর ক্ষণকালের বিরহে তুমি অধৈর্য্য হইয়া পড়, মৃত্যুর শাসনে তাহার সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটিবে। তোমার স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব, দাস-দাসী পরিজন, তোমার চিরসঞ্চিত ধন রত্ন, অশ্ব-রথ গজ-শোভিত প্রমোদভবন,—এ সকলি ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যাহা তুমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কখনই ছাড়িতে পার না—মৃত্যু তাহা বলপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে হরণ করিয়া লইবে। কি ভয়ানক কষ্ট!

তৃতীয়—ভয়। একাকী বিদেশে যাইবার যে ভয়। দেশান্তর নির্ব্বাসন-দণ্ডে যে ভয় হয়—অজ্ঞাত অপরিচিত স্থান—কিরূপ লোকের মধ্যে বাস—কিরূপ কর্ম্মভার বহন করিতে হইবে, কিছুই জানা নাই। আমার মৃত্যুশয্যার চারিদিকে যে সকল চিরপরিচিত মুখ, তাদের কেহই সঙ্গে যাইবে না। তাদের ছাড়িয়া একাকী কোন্ অপরিচিত দেশে, কোন্ অপরিচিত লোকের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে—

ইহাতে কাহার মনে না ভয়ের সঞ্চার হয়?

এই সকল নানা কারণে আমরা মৃত্যুভয়ে ভীত হই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কি উপায়ে এই ভয় অতিক্রম করা যায়—মৃত্যুঞ্জয় কিসে হওয়া যায়?

নচিকেতা যখন যমের নিকট হইতে পরকাল সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করেন তখন স্বয়ং যম তাঁহাকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন—

অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

সেই অনাদ্যনন্ত মহতো মহীয়ান্ ধ্রুব সত্য সনাতনকে জানিয়াই মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হওয়া যায়।

আমি আপনাদিগকে আর অধিক কি বলিব? যুক্তি তর্ক দ্বারা পরকালের প্রতি বিশ্বাস জাগ্রত হয় না। আমি অনেক যুক্তি দেখাইয়া আপনাদিগকে বলিতে পারি যে আত্মা অবিনশ্বর—যখন জড়ের একটি পরমাণুও নষ্ট হয় না, তখন জ্ঞানময় প্রেমময় আত্মার বিনাশ অসম্ভব। এ দেহ ধূলিসাৎ হইবে, কিন্তু ইহার সঙ্গে আত্মার বিনাশ নাই।

ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে

কিন্তু এ কথা আপনাদের মনে প্রবেশ করিবে না। পরলোক আছে কি না কে জানে? পরলোকে কি আছে কে দেখিয়া আসিয়াছে? আমি দেখাইতে পারি এই পরলোকে বিশ্বাস মানুষের প্রকৃতিগত সার্ব্বজনীন বিশ্বাস। কিন্তু ইহাতেও আপনাদের মনে প্রতীতি জন্মিবে না।

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং
প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।

বিত্তমোহে মুগ্ধ প্রমাদী অবিবেকী মনুষ্যের নিকট পরকালতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। পরলোক আমাদের চর্ম্মচক্ষে প্রতিভাত হয় না। বিশ্বাসের চক্ষু উন্মীলন কর—দৃশ্যমান জগৎ হইতে অদৃশ্য জগৎ—পৃথিবীর ঊর্দ্ধে প্রেমোজ্জ্বল স্বচ্ছ আকাশে আধ্যাত্মিক জগৎ দেখিতে পাইবে।

এখন সমস্যা এই—এই বিশ্বাস আসে কোথা হতে? ইহার উত্তর পরমাত্মার সহিত যোগবন্ধন হইতেই এই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এখানেই এই যোগের যে সূত্রপাত হয়, ইহার শেষ এখানে নহে—ইহা নিত্যকালের যোগ; ইহা অমৃত যোগ—ইহার ভঙ্গ নাই, অন্ত নাই। ইহলোক হইতে লোকান্তরে গিয়া জ্ঞানেতে প্রীতিতে উন্নত হইয়া আমার আত্মা পরমাত্মার সহিত গাঢ়তর মিলনে সম্মিলিত হইবে, এই বিশ্বাস ভগবান তাঁহার ভক্তের হৃদয়ে প্রেরণ করিতেছেন, ইহার কখন অন্যথা হইবার নহে।

যে মানব ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত রহিয়াছে সে মৃত্যুর অতীত শক্তিকে—মৃত সঞ্জীবনী শক্তিকে দেখিতে পায় না। তাহার নিকট এই জগৎ শ্মশানতুল্য—এই রক্ত-মাংসের দেহই তাহার সর্ব্বস্ব। সে অন্তরের আত্মাকে দেখে না—পরলোক তাহার নিকট অন্ধকার। যখন সাধক ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করেন, তাঁহার প্রেম—তাঁহার মঙ্গলভাব হৃদয়ে যখন প্রতিভাত হয় তখন

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরে পলায়ন করে। সেই প্রেমই মৃত্যুঞ্জয়। সেই প্রেমবলেই বিশ্বাস জাগিয়া উঠে। তখন আপনাপনি বুঝিতে পারি, সেই প্রেমময়ের সহিত আমার যে প্রেমবন্ধন, তাহা দুদিনের তরে নয়—তাহা অনন্তকালের বন্ধন। তখনই আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি

য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি

যাঁহারা ইঁহাকে জানিয়াছেন তাঁহারাই অমৃত লাভ করেন।

হে সাধু যুবা! ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে জীবনের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া যাও, তোমার কোন ভয় নাই। যিনি জীবন দিয়াছেন তিনিই ত মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন, তবে কি ভয়? যিনি তোমার মঙ্গল উদ্দেশে তোমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তোমার কার্য্য সমাপ্ত হইলে তিনিই তোমাকে আপনার দিকে টানিয়া লইবেন। তাঁহার যা ইচ্ছা তাহাই মঙ্গল ইচ্ছা--সে ইচ্ছা পূর্ণ হউক। যাঁহার অন্তরে ঈশ্বরের করুণাময় অভয় মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে মৃত্যুতে তাঁহার কি ভয়? ঈশ্বরের আলোক অন্ধকারের দীপ হইয়া যাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হয়, তিনি সেই আলোকে মৃত্যুর রহস্য ভেদ করেন। সেই আলোকে তিনি মৃত্যুর পরপারে সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম দেখিতে পান, যেখানে দিনও নাই রাত্রিও নাই, সুকৃতও নাই দুষ্কৃতও নাই—যাহা শুভ্র পুণ্যালোকে চির দীপ্তিমান্।

সকৃদ্বিভাতো হ্যেবৈষ ব্রহ্মলোকঃ।

—এই সেই সকৃদ্বিভাসিত ব্রহ্মলোক।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

---

## প্রার্থনা।

পিতা তুমি, প্রভু তুমি, আমি যে তোমার,
করজোড়ে প্রণিপাত করি বার বার।
তোমারে বুঝিতে চাই, এ ক্ষুদ্র জীবনে,
তোমারে হেরিতে চাই, এ দীন নয়নে।
তোমার মঙ্গল স্পর্শ পুলক মাঝার,
অভিষিক্ত হয়ে থাক পরাণে আমার।
আমার আমিত্ব সব দাও ভুলাইয়া,
তোমাতেই যুক্ত হোক, মুক্ত হোক হিয়া।
ভুলে যাই স্বার্থ পাপ, দৈন্য মাঝে আর,
যেন না বাঁধিয়া রাখি কল্পনা আমার।
আমার হৃদয় মাঝে প্রেম ভক্তি দিয়া,
তোমার পূজার স্থান রাখিব রচিয়া।
পুষ্পসম যেন প্রাণ তোমার পরশে,
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## প্রার্থনা।

আমার বলিতে যেন কিছু নাই আর,
কিরূপে এ বিশ্ববীণা করিছে ঝঙ্কার।
যা কিছু পড়িছে চোকে সব তোমাময়,
তোমার, মঙ্গলরূপে পূর্ণ সমুদয়।
যা কিছু অপূর্ণ ছিল আজ তাহা নাই,
সবি পরিপূর্ণ বিভু, কিছু নাহি চাই।
ভাবনা বেদনা কত অভাব মাঝার,
ব্যথিত হয়েছে এই হৃদয় আমার।
আজ যেন সব ত্যজি তোমারে লভিয়া,
অতুল আনন্দে পূর্ণ, এই ক্ষুদ্র হিয়া।
ব্যথা ভরা প্রাণে শুধু তোমার পরশ,
দিতেছে করিয়া হৃদি সজীব সরস।
যে বিশ্ব রাগিণী শুনি জগৎ মোহিত,
সে রাগিণী মোর প্রাণে হতেছে ধ্বনিত।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## পুণ্যাহ।

এই দিন প্রজা জমীদারের মিলনের দিন। এই দিনে প্রজা নুতন বৎসরের প্রথম কিস্তির কর প্রদান করিয়া জমীদারের শাসন ও ন্যায্য অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, জমিদারও প্রজার প্রীতি ও কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন। রাজা,প্রজার ধন-সম্পদ—স্বাস্থ্য-শান্তির বৃদ্ধি মানসে নতজানু হইয়া মহেশ্বরের নিকটে হৃদয় খুলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রজাবর্গ স্ব স্ব দেয় কর হস্তে করিয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া তদ্দানে তাঁহার কোষ পূর্ণ করিতেছেন, এ দৃশ্য অতি মনোহর। উত্তর বঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুইটি জমীদারী আছে, একটি বিরাহিমপুর আর অপরটি পতিসর। গত ৩১ আষাঢ় এই দুই স্থানে পুণ্যাহ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিরাহিমপুরে স্বয়ং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। উপাসনার আচার্য্য ছিলেন পণ্ডিত যোগীন্দ্রনাথ শিরোমণি। তিনি তথায় ব্রহ্মোপাসনা করিয়া তথাকার কর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের প্রতি কল্যাণকর উপদেশ দিয়া কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অনেক ভদ্র ও বিশিষ্ট প্রজা সন্ধ্যায় কাছারী বাটীতে লুচি ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া আপ্যায়িত হয়েন।

পতিসরের কাছারীতে জমীদারের প্রতিনিধিরূপে তথাকার সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চাকী পুণ্যাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। তথায় আচার্য্য ছিলেন আমাদের প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়। এখানকার প্রজাবর্গ বড়ই নিরীহ ও রাজভক্ত। অনুষ্ঠান-ক্ষেত্র পূর্ণ করিয়া হিন্দু মুসলমান প্রজা ও কাছারীর কর্ম্মচারীবৃন্দ উপবেশন করিলে শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়া হিন্দু প্রজাদিগের জন্য মনুর শাস্ত্র হইতে রাজবিধি ও মুসলমান প্রজাদিগের জন্য কোরাণের সুরাবিশেষ হইতে ধর্ম্মানুশাসন ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহা সকলের হৃদ্য হইয়াছিল। এ দেশের প্রজাবর্গ সাধারণত দরিদ্র। বৎসরে পুণ্যাহের এই দিনে

প্রজাবর্গকে ফলাহারের নিমন্ত্রণ করা হয়। তাহারা উৎসাহের সহিত এই নিমন্ত্রণে আগমন করে—এবং সমস্ত বৎসরটা এই দিনের উৎসব আনন্দ ভোগ করিবার জন্য প্রতীক্ষা করে। ফলাহারের দ্রব্য চূড়া গুড় ও দধি মাত্র। কিন্তু ইহাতেই তাহাদের কত আনন্দ। এবৎসর প্রায় তিন হাজার প্রজা পংক্তি নিবদ্ধ হইয়া আহার করিয়াছিল। ইহারা নিজে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করে এবং সেই দধি গুড় মিশ্রিত একাংশ ভোজ্য, স্ত্রী পুত্রাদির জন্য বস্ত্রে বাঁধিয়া গৃহে লইয়া যায়। যাহারা ইহা ভোগ করে তাহারা এখানে আনন্দ লাভ করে এবং যাঁহারা দাতা তাঁহারাও পরলোকে 'উৎসবাৎ উৎসবং যান্তি, ধর্ম্মাৎ ধর্ম্মং, সুখাৎ সুখং।' এইরূপ আদান প্রদানেই সংসারে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

---

## নানা কথা।

**সমন্বয়।**—পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার উত্তরে সাতটি গ্রামে প্রায় এক সহস্র হিন্দু বাস করেন; তাহারা ( Labanas ) লবণ বলিয়া খ্যাত। মোগল-রাজত্ব সময়ে কোন কারণে তাহারা হিন্দু-সমাজ হইতে রহিত হইয়া এতাধিক কাল স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বিগত মে মাসে হিন্দু-সমাজ তাহাদিগকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছে। আর্য্য-সমাজকে ইহার জন্য অগ্রসর হইতে হয় নাই। শুদ্ধ যে তাহারা হিন্দুসমাজ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তাহা নহে, পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। Indian World. June.

**মতামত।**—মিঃ আলফ্রেড নন্দীর সহিত কনগ্রেসের বিশেষ যোগ আছে। তিনি নিজে খৃষ্টান। তিনি আর্য্যসমাজের গুরুকুল সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য Hindustan Record এ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মের উদারতা কীর্ত্তন করিতে গিয়া বলিয়াছেন আস্তিক নাস্তিক অজ্ঞেয়-বাদী বহু-ঈশ্বরবাদী, হিন্দু-সমাজের ভিতরে এ সকলেরই স্থান আছে। পরস্পরের ভিতরে বিবাদ বিসম্বাদের লেশ মাত্র নাই। দয়ানন্দ প্রবর্ত্তিত আর্য্য-সমাজের ভিতরে কোন কোন বিষয়ে তিনি অনুদারতার উল্লেখ করিয়াছেন। আর্য্য-সমাজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে ( উদারশ্রেণীর ) ব্রাহ্মেরা এক প্রকার হিন্দু-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন। হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মদিগের কোন কর্ত্তৃত্ব বা প্রভাব নাই। বিলাত প্রত্যাগত যুবকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্রাহ্মদল পুষ্ট করে। অন্য পক্ষে আর্য্য সমাজের লোকেরা জাতিভেদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মদিগের অনুরূপ কতকটা মত অন্তরে পোষণ করিলেও তাহারা প্রকাশ্যভাবে জাতিভেদ একেবারে উন্মূলিত করিতে চেষ্টা পায় না, বা শঙ্কর-বিবাহে প্রবৃত্ত হয় না। তাহারা সমাজের ভিতরে থাকিয়া হিন্দুসমাজের অনিষ্টকর প্রথা রহিত করিবার জন্য ভূরি চেষ্টা পাইতেছে। তাহার মূল্য এদেশের সমাজ-সংস্কার পক্ষে নিতান্ত সামান্য নহে। The Same paper.

**অশান্তি।**—Rev. Lucas রেঃ লিউকস নামা জনৈক হৃদয়বান পাদ্রী ভারতের বর্ত্তমান অশান্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, দেশীয় লোকের ভিতরে রাজনৈতিক উচ্চ আশা ইহার মুখ্য কারণ নহে। সমাজ, শিল্প, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের সমস্যা লইয়া লোকের ভিতরে আন্দোলন চলিতেছে। উহাই এই অশান্তির জনক। ভারত নব-কলেবরে জন্ম গ্রহণ করিবে, সেই সময় আসিয়া উপস্থিত। অন্যবিধ ঔষধ বা অস্ত্র চিকিৎসার পরিবর্ত্তে এক্ষণে সুনিপুণা ধাত্রীর প্রয়োজন। যাহাতে অণুমাত্র উত্তেজনা আসিতে পারে, এরূপ চিকিৎসা একেবারেই পরিত্যাজ্য। এই যে চাঞ্চল্যভাব, ইহা যে কেবল ভারতে সীমাবদ্ধ, তাহা নহে ? কিন্তু সমগ্র জগতে অল্লাধিক পরিমাণে এই অস্থিরতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। হৃদয়বান মিসনরিগণ আমাদের দেশের ভিতরে থাকিয়া আভ্যন্তরিক ভাব যে ভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, অপরের পক্ষে সত্যসত্যই তাহা দুর্ঘট। The Same paper.

**আমাদের দুর্দ্দশা।**—শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক প্রবাসীর শ্রাবণ সংখ্যায় "আমাদের সংসারে নিত্যকার অপচয়" প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, বিগত ত্রিশ বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে মৃত্যুসংখ্যা ক্রমাগত বাড়িতেছে। ১৮৭০ সালে প্রতি সহস্রে মৃত্যুসংখ্যা ২৮ জন ছিল, ১৮৮০ সাল ৩০ জন, ১৮৯০ সালে ৩২, ১৯০১ সালে ৩৫॥ জন। ৩৫॥ ভিতরে অর্দ্ধেক জ্বররোগে, সিকি কলেরা রোগে, অষ্টমাংশ উদরাময় প্রভৃতি রোগে, তাহার অর্দ্ধেকের বসন্তরোগে মৃত্যু ঘটিয়াছে। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যত গুলি শিশু জন্মায়, তাহার প্রতি তিনটির ভিতরে শৈশবেই একটির মৃত্যু হয়। কিন্তু বিলাতের ন্যায় লোকবহুল স্থানে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা উহার অর্দ্ধেক। ভারতে এই রোগ বৃদ্ধির সঙ্গে লোকের আর্থিক অবস্থাও হীন হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষও বাড়িতেছে। খাদ্যের দাম দুই তিন গুণ হইয়াছে। খাদ্যাভাবে, জল-বায়ুর দোষে ও সামাজিক অনেকানেক কুপ্রথাবশত আমরা শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছি। আমাদের খাদ্যের আয়তন বেশী, অথচ তাহাতে সারাংশ অতি অল্প। আমরা অতিরিক্ত তরল-পদার্থ ও লবণ খাই। তরল খাদ্যে হজমের ব্যাঘাত ঘটে। অতিরিক্ত লবণ সেবনে শরীরকে অনর্থক ভারী ও খস্‌খসে করে, রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়, শরীর ও মনে জড়তা আনে। মধ্যাহ্নকালের গুরু আহারের পরেই কাজে দৌড়াইতে হয়। তাড়াতাড়ি খাইলে হজমের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। দ্বিপ্রহরের সময়ে লঘু আহার করিয়া বৈকালে বা সন্ধ্যায় ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে আহার করিলে সুফলের বিশেষ সম্ভাবনা। মৎস্য মাংস, ডিম্ব দুগ্ধ অল্প আঁচে সিদ্ধ করা ভাল। খুব বেশী ফুটিতে দেওয়া ভাল নহে। উদ্ভিজ্জ খাদ্য চাউল ডাউল তরকারি অনেক ক্ষণ ধরিয়া ফুটাইলে সুসিদ্ধ ও আহারের উপযোগী হয়। অধিক মসলা সেবন হানিকর। কিন্তু মধ্যে মধ্যে আহারের প্রণালী বদলাইবার জন্য মসলার আবশ্যকতা আছে। প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময় আহার করা কর্ত্তব্য। আমরা চাউল সিদ্ধ করিয়া তাহার সারের অর্দ্ধাংশ ফেন ফেলিয়া দেই।

চাউলের যে খুঁদ ফেলিয়া দিই, তাহাতে সারভাগ সমধিক। সংসারের স্ত্রীলোকগণের পর্য্যাপ্ত আহারের দিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখা চাই। এই সকলের অভাবে আমরা এত শক্তি-হীন হইয়া পড়িতেছি।

A dying race। শ্রীযুক্ত ইউ, এন, মুখোপাধ্যায় কৃত উক্ত নামের একখানি পুস্তক উপহার স্বরূপ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি জনসংখ্যা বিবরণ ধরিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সংখ্যার হিসাবে হিন্দু-জাতির শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে না। ১৮৭২ সালের সেন্‌সস্ রিপোর্টে হিন্দুর সংখ্যা প্রায় ১৭১ লক্ষ এবং মুসলমানের সংখ্যা ১৬৭ লক্ষ ছিল। ১৮৮১ সালের গণনাতে হিন্দুর সংখ্যা ১৭২ লক্ষ এবং মুসলমান সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৭৯ লক্ষে দাঁড়ায়। ১৮৯১ সালের গণনাতে হিন্দুসংখ্যা ১৮০ লক্ষ এবং মুসলমান সংখ্যা ১৯৬ লক্ষ এবং ১৯০১ সালের গণনাতে হিন্দু ১৯৪ লক্ষ এবং মুসলমান ২২০ লক্ষ দাঁড়াইয়াছে। অন্যকথায় এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান, যাহারা হিন্দু অপেক্ষা ৪ লক্ষ কম ছিল, তাহারা হিন্দু অপেক্ষা ২৫ লক্ষ অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্থাৎ মুসলমান শতকরা ৩৩ জন বাড়িয়াছে এবং হিন্দু শতকরা ১৭ জন বাড়িয়াছে। এইবারে জন্মসংখ্যা গণনাতে মুসলমান যে আরও বাড়িবে তাহা এক প্রকার সুনিশ্চিত। হিন্দু ও মুসলমান একই দেশে একই জলবায়ুর মধ্যে রহিয়াছে, অথচ উভয়ের এতাদৃশ্য তারতম্য বিস্ময়কর বলিতে হইবে। ১৮৯১ সালে ওডোনেল ( C. J.O. Donnell ) সাহেব সেন্‌সস্ কমিসনর ছিলেন। তিনি বলেন এইরূপ ভাবে চলিলে বঙ্গ-দেশ হইতে সুদূর ভবিষ্যতে হিন্দু-জাতির বিলোপের আশঙ্কা আছে। এই সংখ্যা-ক্ষয়ের কারণ বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত। আমরা এই পুস্তকখানি পড়িতে সকলকে অনুরোধ করি।

ভয়েসী সাহেব।—বিগত ১৯০৯ সালের ২০এ জুন তারিখে রেভারেণ্ড ভয়েসী সাহেব (Not peace but sword) "শান্তি নহে, কিন্তু সংগ্রাম" এই নামে বিলাতের Theistic church এ একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। ভয়েসী সাহেব আমাদের বিশেষ পরিচিত। তিনি যিশুখৃষ্টের দেবত্ব ও মধ্যবর্ত্তিতার বিরোধী। এইখানে তাঁহার সঙ্গে আমাদের এক মত। বাস্তবিক যিশুখৃষ্ট যে একজন মহা সাধু-পুরুষ ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমগ্র সভ্য-সমাজের ও জাতির ধর্ম্ম, ইহাও এক প্রকার সুনিশ্চিত। কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরের আসন কতকদূর পর্য্যন্ত তাঁহাকে প্রদান করিতে আমরা সঙ্কুচিত। তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নীতিমার্গ অবলম্বনে মনুষ্যত্ব-লাভের যে সম্ভাবনা, তাহা আমরা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া বিচার দিনে তাঁহার নামে ও তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় মনুষ্যের মুক্তি ও সদ্গতি, এ কথা আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। ভয়েসী সাহেব মথিলিখিত সুসমাচারের দশম অধ্যায়ের ৩২ হইতে ৩৭ পদ অবলম্বনে বক্তৃতা দেন। বাইবেলের অনুবাদ এইরূপ, খৃষ্ট বলিতেছেন "যে কোন ব্যক্তি আমাকে লোকমাঝে স্বীকার করিবে, আমিও তাহাকে আমার সেই স্বর্গস্থ পিতার নিকট স্বীকার করিব। কিন্তু লোকের নিকটে যে কেহ আমাকে অস্বীকার করে, আমিও তাহাকে আমার সেই পিতার নিকট অস্বীকার করিব। তোমরা মনে করিও না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি (বিস্তার) স্থাপন করিতে আসিয়াছি, শান্তি নহে, তোমাদের মধ্যে খড়্গ স্থাপন করিতে আসিয়াছি। কারণ আমি পিতা পুত্রে মাতা কন্যায় শ্বশ্রূ বধূতে বিচ্ছেদ বাঁধাইতে আসিয়াছি। মনুষ্যের পরিজনই তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যে কেহ পিতা কিম্বা মাতাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে সে আমার যোগ্য নহে। আর যে পুত্রকে কিম্বা কন্যাকে আমা অপেক্ষা অধিক ভালবাসে সে আমার যোগ্য নহে।" ভয়েসী সাহেব বলেন এবং আমরাও স্বীকার করি যে যখন কোন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয়, তখন নব-দীক্ষিতের সঙ্গে তাহার পিতা-মাতা ভ্রাতা-ভগিনী আত্মীয়-স্বজনের বিবাদ অনিবার্য্য। কিন্তু ভয়েসী সাহেব বলেন "আমি পৃথিবীতে শান্তিস্থাপন করিতে আসি নাই, কিন্তু খড়্গ স্থাপন করিতে আসিয়াছি" খৃষ্টের এ কথাটি বিশেষ আপত্তিকর। তাঁহার মতে খৃষ্টের এ কথায় অন্যতর উদার ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। আমরা ভয়েসী সাহেবের অন্যান্য যুক্তি আলোচনা না করিয়া এইমাত্র বলিতে চাই, ভয়েসী সাহেব যেরূপ অক্ষরশঃ অনুবাদ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টকে দোষ দিয়াছেন, তাহা সমীচীন নহে। Expressionএ অর্থাৎ ভাব-প্রকাশে সামান্য ত্রুটি থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া যিশু এই কারণে নিন্দাবাদের যোগ্য হইতে পারেন না। তাঁহার কথার অভিপ্রায় কি ছিল, তাহাই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে।

আবিষ্কার।—ফরাসী দেশের সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ( Foocher ) ফুচার সাহেব পেশোয়ারের সন্নিকট সম্রাট কনিষ্ক নির্ম্মিত পেগোডা অর্থাৎ বৌদ্ধ-মন্দির বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্প্রতি Dr. Spooner স্পুনার সাহেব ঐ মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহার ব্যাসার্দ্ধ ২৮৫ ফুট এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিলেও বলা যাইতে পারে। চীন পরিব্রাজক হিয়ানসাংএর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উহার উল্লেখ আছে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি পিত্তলাধার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উহার ভিতরে তিনখণ্ড দগ্ধ অস্থি আছে। সম্ভবতঃ উহা গৌতমবুদ্ধের। স্তম্ভের ভিতরে আরও নিম্নে একটি অতি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের ভিতরে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মাকৃতির উপরে তিনটি মূর্ত্তি রহিয়াছে, একজন উপবিষ্ট, উহার উভয় পার্শ্বে দুইজন বৌদ্ধ দণ্ডায়মান। নিকটে রাজার মূর্ত্তি, সম্ভবতঃ ইহা রাজা কণিষ্কের। ঐ যে সুন্দর স্তম্ভ, অনুমিত হয়, উহা প্রাচীন Agisalaos এগিসালোসের শিল্পনৈপুণ্যে গঠিত। আধারটিতে অত্যুচ্চ গান্ধার-শিল্পের সুন্দর পরিচয় রহিয়াছে। যাহা কিছু মিলিয়াছে, তাহার অধিকাংশ পেশোরের মিউজিয়মে রক্ষিত হইবে। অমৃতবাজার ২৬এ জুলাই।

বিলাতে ভারতীয়-ছাত্র।—বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র সংখ্যা প্রায় ৭৩০ জন। ইহার প্রায় ৪০০ জন আইন, ১২০ জন চিকিৎসা, ১০০ জন সাহিত্য গণিত, ৯০ জন শিল্প ও ২০ জন পূর্ত্ত-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছেন।
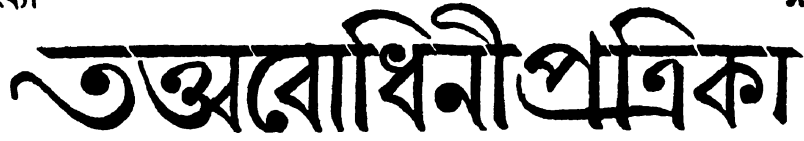
---

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## ছুটির পর।

(শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে)

ছুটির পর আমরা সকলে আবার এখানে একত্র হইলাম। কর্ম্ম হইতে মাঝে মাঝে আমরা যে এইরূপ অবসর লই সে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য নয়—কর্ম্মের সহিত যোগকে নবীন রাখিবার ইহাই উপায়।

মাঝে মাঝে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যদি এই রূপ দূরে না যাই তবে কর্ম্মের যথার্থ তাৎপর্য্য আমরা বুঝিতে পারিনা। অবিশ্রাম কর্ম্মের মাঝখানে নিবিষ্ট হইয়া থাকিলে কর্ম্মটাকেই অতিশয় একান্ত করিয়া দেখা হয়। কর্ম্ম তখন মাকড়ষার জালের মত আমাদিগকে চারিদিক হইতে এমনি আচ্ছন্ন করিয়া ধরে যে তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিবার সামর্থ্যই আমাদের থাকেনা। এই জন্য অভ্যস্ত কর্ম্মকে পুনরায় নূতন করিয়া দেখিবার সুযোগ লাভ করিব বলিয়াই এক একবার কর্ম্ম হইতে আমরা সরিয়া যাই। কেবল মাত্র ক্লান্ত শক্তিকে বিশ্রাম দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য নহে।

আমরা কেবলই কর্ম্মকেই দেখিবনা। কর্ত্তাকেও দেখিতে হইবে। কেবল আগুনের প্রখর তাপ ও এঞ্জিনের কঠোর শব্দের মধ্যে আমরা এই সংসার কারখানার মুটেমজুরের মতই সর্ব্বাঙ্গে কালিঝুল মাখিয়া দিন কাটাইয়া দিবনা; একবার দিনান্তে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া কারখানার মনিবকে যদি দেখিয়া আসিতে পারি তবে তাঁহার সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় করিয়া কলের একাধিপত্যের হাত এড়াইতে পরি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলি কলের চাকা চালাইতে চালাইতে আমরাও কলেরই সামিল হইয়া উঠি।

আজ ছুটির শেষে আমরা আবার আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এবার কি আবার নূতন দৃষ্টিতে কর্ম্মকে দেখিতেছিনা? এই কর্ম্মের মর্ম্মগত সত্যটী অভ্যাস বশত আমাদের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিল তাহাকে পুনরায় উজ্জ্বল করিয়া দেখিয়া কি আনন্দ বোধ হইতেছেনা?

এ আনন্দ কিসের জন্য? এ কি সফলতার মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া? এ কি এই মনে করিয়া যে, আমরা যাহা করিতে

চাহিয়াছিলাম তাহা করিয়া তুলিয়াছি? এ কি আমাদের আত্মকীর্ত্তির গর্ব্বানুভবের আনন্দ?

তাহা নহে। কর্ম্মকেই চরম মনে করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে মানুষ কর্ম্মকে লইয়া আত্মশক্তির গর্ব্ব উপলব্ধি করে। কিন্তু কর্ম্মের ভিতরকার সত্যকে যখন আমরা দেখি তখন কর্ম্মের চেয়ে বহুগুণে বড় জিনিষটিকে দেখি। তখন যেমন আমাদের অহঙ্কার দূর হইয়া যায়, সম্ভ্রমে মাথা নত হইয়া পড়ে তেমনি আর একদিকে আনন্দে আমাদের বক্ষ বিস্ফারিত হইয়া ওঠে। তখন আমাদের আনন্দময় প্রভুকে দেখিতে পাই, কেবল লৌহময় কলের আস্ফলনকেই দেখিনা।

এখানকার এই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি মঙ্গলচেষ্টা আছে। কিন্তু সে কি কেবল একটি মঙ্গলের কল মাত্র? কেবল নিয়ম রচনা এবং নিয়মে চালানো? কেবল ভাষা শেখানো, অঙ্ক কষানো, খাটিয়া মরা এবং খাটাইয়া মারা? কেবল মস্ত একটা ইস্কুল তৈরি করিয়া মনে করা খুব একটা ফল পাইলাম? তাহা নহে।

এই চেষ্টাকে বড় করিয়া দেখা, এই চেষ্টার ফলকেই বড় ফল বলিয়া গর্ব্ব করা সে নিতান্তই ফাঁকি। মঙ্গল অনুষ্ঠানে মঙ্গল ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই কিন্তু তাহা গৌণ ফল মাত্র। আসল কথাটি এই যে, মঙ্গল কর্ম্মের মধ্যে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠে। যদি ঠিক জায়গায় দৃষ্টি মেলিয়া দেখি তবে মঙ্গল কর্ম্মের উপরে সেই বিশ্বমঙ্গলকে দেখিতে পাই। মঙ্গল অনুষ্ঠানের চরম সার্থকতা তাহাই। মঙ্গল কর্ম্ম সেই বিশ্বকর্ম্মাকে সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার একটি সাধনা। অলস যে, সে তাঁহাকে দেখিতে পায় না—নিরুদ্যম যে, তাহার চিত্তে তাঁহার প্রকাশ আচ্ছন্ন। এই জন্যই কর্ম্ম-নহিলে কর্ম্মের মধ্যেই কর্ম্মের গৌরব থাকিতে পারে না।

যদি মনে জানি আমাদের এই কর্ম্ম সেই কল্যাণময় বিশ্বকর্ম্মাকেই লাভ করিবার একটি সাধনা তাহা হইলে কর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু বিঘ্ন অভাব প্রতিকূলতা আছে তাহা আমাদিগকে হতাশ করিতে পারে না। কারণ, বিঘ্নকে অতিক্রম করাই যে আমাদের সাধনার অঙ্গ। বিঘ্ন না থাকিলে যে আমাদের সাধনাই অসম্পূর্ণ হয়। তখন প্রতিকূলতাকে দেখিলে কর্ম্মনাশের ভয়ে আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠি না—কারণ, কর্ম্মফলের চেয়ে আরো যে বড় ফল আছে। প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইব বলিয়া কোমর বাঁধিলে চলিবে না—বস্তুত কৃতকার্য্য হইব কি না তাহা জানি না—কিন্তু প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে আমাদের অন্তরের বাধা ক্ষয় হয়—তাহাতে আমাদের তেজ ভস্মমুক্ত হইয়া ক্রমশ দীপ্যমান হইয়া উঠে এবং সেই দীপ্তিতেই, যিনি বিশ্বপ্রকাশ, আমার চিত্তে তাঁহার প্রকাশ উন্মুক্ত হইতে থাকে। আনন্দিত হও, যে, কর্ম্মে বাধা আছে—আনন্দিত হও, যে, কর্ম্ম করিতে গেলেই তোমাকে নানাদিক হইতে নানা আঘাত সহিতে হইবে এবং তুমি যেমনটি কল্পনা করিতেছ বারম্বার তাহার পরাভব ঘটিবে, আনন্দিত হও যে, লোকে তোমাকে ভুল বুঝিবে ও অপমানিত করিবে—আনন্দিত হও, যে, তুমি যে বেতনটি পাইবে বলিয়া লোভ করিয়া বসিয়াছিলে বারম্বার তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। কারণ, ইহাই যে সাধনা। যে ব্যক্তি আগুন জ্বালিতে চায়, সে ব্যক্তির কাঠ পুড়িতেছে বলিয়া দুঃখ করিলে চলিবে কেন? যে কৃপণ শুধু

শুষ্ক কাঠই স্তূপাকার করিয়া তুলিতে চায় তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। তাই ছুটির পরে কর্ম্মের সমস্ত বাধাবিঘ্ন সমস্ত অভাব অসম্পূর্ণতার মধ্যে আজ আনন্দের সহিত প্রবেশ করিতেছি। কাহাকে দেখিয়া? যিনি কর্ম্মের উপরে বসিয়া আছেন তাঁহার দিকেই চাহিয়া।

তাঁহার দিকে চাহিলে কর্ম্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলিয়া যায়। চেষ্টার চেষ্টারূপ আর দেখিতে পাই না, তাহার শান্তিমূর্ত্তিই ব্যক্ত হয়। কাজ চলিতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে—ভরা জোয়ারের জলের মত সমস্ত থম্‌থম্ করিতে থাকে। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি ঘোষণা রটনা কোমর বাঁধিয়া গলদঘর্ম্ম হইয়া দাপাদাপি করা এ সমস্ত একেবারেই ঘুচিয়া যায়। চিন্তায় বাক্যে কর্ম্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনাকে আপনি আড়াল করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া উঠে—যেমন সুন্দর আজিকার এই সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী! তাহার প্রচণ্ড তেজ, প্রবল গতি, তাহার ভয়ঙ্কর উদ্যম কি পরিপূর্ণ শান্তির ছবি বিস্তার করিয়া কি কমনীয় হাসিই হাসিতেছে! আমরাও আমাদের কর্ম্মের আসনে পরমশক্তির সেই শান্তিময় মহাসুন্দর রূপ দেখিয়া উদ্ধত চেষ্টাকে প্রশান্ত করিব—কর্ম্মের উদগ্র আক্ষেপকে সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া দিব—আমাদের কর্ম্ম, মধু দ্যৌঃ, মধু নক্তম্, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ—এই সমস্তের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় হইয়া উঠিবে।

---

শ্বশুরের মঙ্গল কামনায় নব বিবাহিতা বালিকার

## প্রার্থনা। *

আমার জীবনে এমন একটী দিন আসিয়াছিল, যে দিন হইতে আমার জীবনকে উন্নত করিবার জন্য, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা এই সকল নারীগুণে বিভূষিত করিবার জন্য পরমেশ্বর আমাকে তোমাদের স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। যে সম্বন্ধ সমগ্র মানবমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া আজ আমি তোমাদিগকে পিতা মাতারূপে লাভ করিয়া কৃতার্থ। এই অভাবনীয় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া আমি দয়াময় ঈশ্বরকে প্রণাম করি। হে পরমপিতা! তুমি কৃপা করিয়া আমার নূতন চক্ষু উন্মোচন করিয়া দিয়াছ। এতদিন তোমায় এ ভাবে পাই নাই। তোমার নব প্রেম-আলিঙ্গনে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। তুমি আমায় সাধুসঙ্গ দিয়া ও তোমার প্রতিনিধি যে পরম পূজনীয় পিতা মাতা তাঁহাদের দ্বারা আমাকে তোমার সেই সুপ্রশস্ত কণ্টকবিহীন পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমার প্রেমের অন্ত নাই। তুমি প্রেমময়। তোমার প্রেমে আমাকে যে মগ্ন করিয়া রাখিয়াছ। সহস্রধারে তোমার প্রেম

* এই বালিকা বধূর হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত কথাগুলি কেমন সরল সুন্দর মহান ভাবপূর্ণ। ধনী দরিদ্র সকল হিন্দুর ঘরেই বালিকা বধূ আছে। প্রাণাধিক পুত্রের বালিকা-বধূ মায়ের প্রাণের কত শত সাধ-বাসনাজড়িত বাঙ্গার ধন, কত আদরের জিনিস—এই বালিকা-বধূর ন্যায় মহানভাব হৃদয়ে ধারণ করিয়া—"সমগ্র মানবমণ্ডলে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, সেই বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া" শ্বশুর শাশুড়ীকে "পিতা মাতা রূপে লাভ" করিয়াছেন, আর সেই "পরম পূজনীয় পিতামাতা" ঈশ্বরের "প্রতিনিধি" এবং বধূর "জীবনকে উন্নত করিবার জন্য পরমেশ্বর" তাহাকে শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহের আস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন—যদি সকল বালিকা-বধূই তাহাদের শ্বশুরালয়ের নূতন জীবন আরম্ভ করেন, তাহা হইলে সে শ্বশুরালয় কি মধুর পবিত্র প্রীতিময় হয়!!

সম্পাদক।

আমার প্রতি অবিরাম অবিশ্রান্ত ঢালিতেছে। কিন্তু আমি কি হৃদয়হীন! আমি এত কৃতঘ্ন যে প্রতিদিন একবিন্দুও প্রেম তোমার চরণে উপহার দিতে সমর্থ হই না। কত মোহে মগ্ন থাকি, সত্য হইতে কত দূরে, কতদূরে বিচরণ করি; তোমার সুধাসিঞ্চিত প্রেম-আলিঙ্গন ভুলিয়া যাই। তবুও তোমার চন্দ্র আমায় স্নিগ্ধ আলো দেয়, সূর্য্য আমায় দীপ্তিমান জ্যোতি দান করে ও তোমার অনন্ত বৈচিত্রময় ধরাতল কত শান্তি দেয় এবং তোমার অসীম সৌন্দর্য্যপূর্ণ নভঃস্থল মাতার ন্যায় দেহ আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া রাখে ইহার ত কণামাত্রও ব্যতিক্রম ঘটে না। যাঁহার স্নেহের আশ্রয়ে থাকিয়া অদ্য তোমায় এই সকল কথা বলিতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি ও যাঁহার গৃহে আসিয়া তোমায় আমার অন্তরের অন্তরে পাইয়াছি, সেই পরমারাধ্য পরম পূজনীয় পিতৃদেবের জন্মদিনোপলক্ষে তোমার কাছে তাঁহার মঙ্গল কামনা করিতে উপস্থিত। তাঁহার স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত। তবুও আজি এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে প্রার্থনার সুললিত সঙ্গীত ভরিয়া, অসীম সাহসে শির উন্নত করিয়া তোমার নিকটে যাচিতেছি যে আমার এই প্রার্থনা তোমার চরণে গ্রহণ করিতেই হইবে। হে বিশ্বনাথ! তুমি আমার পরম স্নেহময় পিতাকে সুস্থ ও সবল রাখ এবং তাঁহাকে দীর্ঘজীবন দান কর ও তোমার করুণা তাঁহার প্রতি বর্ষণ কর। এই তোমার কাছে প্রার্থনা; এই আমার চিরন্তন প্রার্থনা।

---

## পাতিব্রত্য।

স্বামী স্ত্রীলোকের মহদ্‌গুরু এইটি সকল স্ত্রীলোকের জানা আছে। তিনি আমাদের দেবতুল্য। স্বামী আমাদের অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র। তাঁহাকে আমাদের সতত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীলোক স্বামীগত প্রাণ হইলে সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ হয়। সচ্চরিত্র গুণবান স্বামী পাইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা কত তপস্যা কত আরাধনা করেন, কত পূজার্চ্চনা করেন। সকল-সুখ-কল্যাণকর পরমপিতা পরমেশ্বর, যিনি তাঁহার পুত্র কন্যা সন্তানদিগের জন্য সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল বিধান করিতেছেন, ভাল স্বামী লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হয়। বিবাহের পর যাহাতে স্বামীর সংসারে আসিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিতে সক্ষম হয়েন এবং স্বামীকে সর্ব্ববিষয়ে প্রসন্ন করিতে সক্ষম হয়েন, সেই বিষয়ে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের বিশেষ যত্নবতী হওয়া চাই। স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্য ব্রতে ব্রতী হইয়া পতিপরায়ণা হওয়া উচিত। পতি পত্নীর উভয়ের মনের মিল হওয়া চাই, অভিন্ন হৃদয়ে পরস্পরে যুক্ত হইতে হইবে। পতিসেবা স্ত্রীলোকের একটি পরম ধর্ম্ম। পতিকে গুরু মানিয়া, তাঁহাকে ভালবাসিয়া, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর কিছুতেই তেমন সুখ হয় না। যাহাতে স্বামীর কোন বিষয়ে বিরক্তি এবং কষ্টের কারণ উপস্থিত না হয় সেইদিকে আমাদের জীবনের লক্ষ্য থাকা চাই। যাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলাম, পিতামাতাকে ছাড়িয়া চিরজীবনের মত যে স্বামীর গৃহে আসিলাম, সেই স্বামীর গৃহ যাহাতে উজ্জ্বল হয়, শ্বশুরকুলের যাহাতে গৌরব বৃদ্ধি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মে কর্ম্মে সমন্বিতা

হইয়া পবিত্রভাবে সংসারের সকল কর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে চালাইলে সেই গৃহ শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে। ধর্ম্মকর্ম্ম নিজগৃহে থাকিয়া পরিবারের মধ্যে যেরূপে করিতে পারা যায়, তেমন আর কোথাও হয় না। নিজ পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়া স্বামীর পিতামাতা, স্বামীর ভাইভগিনী, স্বামীর আত্মীয় স্বজন—এ সকলকে আপন বলিয়া মনে করিয়া লইতে হইবে। আপন পিতামাতা ভাইভগিনীর মত ইঁহাদের যত্ন, সেবা শুশ্রূষা করিয়া স্বামীর প্রিয় হইতে হইবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ত্যাগস্বীকার আন্তরিক প্রফুল্লতার সহিত স্বীকার করা কর্ত্তব্য। এই ত্যাগস্বীকারে কত সুখ পাওয়া যায়। ভগবানের দৃষ্টিতে ইহা অতি প্রিয় বলিয়া ইহা মনুষ্যেরও প্রিয় জানিবে। ইহাতেই পারিবারিক সুখসম্পদ বর্দ্ধিত হয় এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলা দূর হয়। স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গরূপে আমরা ব্যক্ত। তাঁর সুখে তাঁর সম্পদে আমাদের সুখ সম্পদ, তাঁহার দুঃখ কষ্টে আমাদের দুঃখ কষ্ট মনে করিতে হইবে। স্বামীর অবস্থার অনুবর্ত্তী হইয়া পত্নীকে চলিতে হইবে। নিজের পিতা মাতা ধনী হইলে স্বামীর দুঃখদারিদ্র্যে কাতর হইয়া স্বামীর উপর অশ্রদ্ধা করিবেক না। স্বামীর অবস্থানুযায়ী সকল কর্ম্মে সহায়তাদ্বারা প্রফুল্লমনে সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আমাদিগকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহভোগিনী হইতে হইবে। নিজে দরিদ্রের কন্যা হইয়া ধনী স্বামীর ঘরে আসিলে তাঁহার সুখ সম্পদে বিহ্বল হইয়া আলস্যে দিন কাটাইবেক না। স্বামী সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক ও বিদ্বান হইলে স্ত্রীর সৌভাগ্যের সীমা থাকে না। কিন্তু স্বামী যদি দুশ্চরিত্র হন তাহা হইলে যদি তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিয়া কঠোর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সতত কলহে প্রবৃত্ত হও এবং উগ্রতা প্রদর্শন কর তাহা হইলে কখনো সুফল প্রাপ্ত হইবে না। সুশীলা সচ্চরিত্রা পতিপ্রাণা স্ত্রীর কর্ত্তব্য স্বামীর দোষ অগ্রাহ্য করিয়া মধুর আলাপে মধুর বাক্যে, সেবা শুশ্রূষার দ্বারা, সতত সদাচরণ এবং সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বামীকে সুখী করিবার উপায় অবলম্বন করা। স্বামীর দোষ শুনিলেও পাপ হয়। তাহার মহৎ দৃষ্টান্ত—যখন দক্ষ যজ্ঞ হয়, তখন দুর্গার সমক্ষে তাঁহার পিতা শিবের অনেক নিন্দা করাতে তিনি তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পিতা কন্যার নিকট স্বামীকে অনুপযুক্ত বলিয়া যুক্তি দেখাইতে গিয়া শেষে নিজের কন্যাটিকেই হারাইলেন। আদর্শ-সতীস্ত্রীর স্বামীর উপর কিরূপ ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল! সতী পিতার নিকটেও স্বামীর নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। পতিব্রতা সতী স্ত্রীর আরও কত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। সীতা নিজের সতীত্ব প্রমাণ করাইবার জন্য অগ্নি পরীক্ষা পর্য্যন্ত দিতে কুণ্ঠিত হন নাই এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বামীর প্রিয় হইয়া সকলের সম্ভ্রমনীয় হইয়াছিলেন। সাবিত্রী স্বামীর মৃতদেহ লইয়া সজীব করাইবার জন্য যম দেবতার পর্য্যন্ত শরণাগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সতীত্বে প্রসন্ন হইয়া যমদেব বর প্রদান পূর্ব্বক স্বামীর জীবনদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সকল স্ত্রীলোক আমাদের পূজনীয়া ও প্রাতঃস্মরণীয়া। এদেশে সতী নারীর জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই সকল স্ত্রীলোকের দৃষ্টান্ত আমাদের অনুসরণ করিয়া চলা উচিত। পিতামাতার কর্ত্তব্য যে তাঁহারা বাল্যকালে ধর্ম্ম ও বিদ্যাশিক্ষা এবং সদ্-

পদেশ দ্বারা কন্যাদিগের মনকে এরূপভাবে গঠিত করেন যে তাঁহারা স্বামীর গৃহে আসিয়া শ্রীতে ও হ্রীতে পরিপুষ্ট হইতে পারে। পরমেশ্বর শুভ অভিপ্রায়ে তাঁহার শুভ সংকল্প সাধিত করিবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করিয়া এবং তাহাদের পরস্পরকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার নিয়ম করিয়া দিয়া ও দাম্পত্য ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদিগকে একটি গুরুতর সম্বন্ধে সংযোজিত করিয়াছেন। এই ঐশ্বরিক নিয়মের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পতি পত্নী উভয়ে মিলিতভাবে পরস্পরের প্রতি অব্যভিচারী থাকিলে সংসারে প্রভূত মঙ্গল হয়। আমাদিগকে স্বামীর অনুগতা ও আজ্ঞানুসারিণী হইয়া চলিতে হইবে। স্বামীর সঙ্গে সকল কর্ম্মে যোগ দিয়া, তাঁহাকে নেতা ভাবিয়া, সকল কর্ম্মে সহায়তা-দ্বারা, সৎপরামর্শ দ্বারা সুশীলা স্ত্রীর উপযুক্ত কার্য্য করিতে যত্নবান হইতে হইবে এবং সতত তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। পতিব্রতা সতীর প্রেম কি বিশুদ্ধ! পতি পত্নীর বিশুদ্ধ প্রেমে সকলই পবিত্র হয়। ইহার বিপরীতে পতি পত্নীর কেহ ব্যভিচার দোষে দূষিত হইলে, সংসার হইতে সুখ শান্তি দূরে পলায়ন করে এবং গৃহ অশান্তির আলয় হয়। পিতামাতা ভাল না হইলে সন্তানকে কাহার দৃষ্টান্তে ভাল করিবে? সেইজন্য পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া, ধর্ম্ম-বলে বলীয়ান হইয়া, জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিতে নিজেদের মনকে উন্নত কর, তবে তোমার গৃহ পরিবার সকলি উজ্জ্বল হইয়া শোভাময় হইবে। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর কোন মতের অনুমোদন করিতে না পারিলে বিরুদ্ধবাদী হইয়া তাঁহার মনে কষ্ট উৎপাদন করিবেক না; সর্ব্বদা সুশীলা, সচ্চরিত্রা ও তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক সৎকার্য্যে সুমন্ত্রণা দ্বারা তাঁহার সহায় হইতে হইবে। পতি ও পত্নী উভয়েরই সুশীল, সচ্চরিত্র এবং সদ্‌গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা না হইলে একের দোষে অন্যকে কষ্ট পাইতে হয় এবং পরিবারের মধ্যে অশেষ অশান্তি ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়। পতিপত্নী উভয়ে আপনাদিগকে পরমপিতা পরমেশ্বরের দাস দাসী ভাবিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্ম পালনে নিযুক্ত থাকিলে দম্পতির বিশুদ্ধ প্রেমে সকল সুখ বর্দ্ধিত হইবে। ইহাই সকলের কল্যাণকর। সতী সাধ্বী স্ত্রীর পতির প্রিয় হইতে কত না ইচ্ছা যায়। স্বামীর কল্যাণের জন্য, এবং সকল কল্যাণের জন্য পরমপিতা পরমেশ্বরের শরণাগত হইতে হয়। তিনি ভিন্ন আমাদের কিছুতেই গতি নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, "যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি এবং ভার্য্যা স্বামীর প্রতি নিত্য সন্তুষ্ট, সেই পরিবারের নিশ্চয় কল্যাণ। ছায়ার ন্যায় তিনি স্বামীর অনুগতা ও সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন এবং স্বচ্ছা থাকিবেন। এবং সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যেতে সুদক্ষ হইবেন।" নিজের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম ভাবিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া সকল কর্ম্ম করিলে সুখ শান্তিতে সকলি পবিত্র হইবে। সকল সুখের মূলে পরমপিতা পরমেশ্বর। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত দাম্পত্যপ্রেমই বল, কি পারিবারিক সুখশান্তিই বল, কিছুই স্থিতিশীল হয় না। অতএব সকল কর্ম্ম সম্পাদনের আগে তাঁকে প্রণিপাত করিয়া বিশুদ্ধ চিত্তে স্বীয় আত্মাকে সেই অদ্বিতীয় মঙ্গলস্বরূপে সমাধান করিয়া পতিপত্নী পরস্পরের শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনে যত্নবান হইবেক।

---

## বায়ুর অঙ্গারকবাষ্প।

কাঠ কয়লা প্রভৃতি দাহ্যপদার্থে প্রচুর অঙ্গার মিশ্রিত আছে। আমরা এই সকল জিনিসকে যখন জ্বালাইতে আরম্ভ করি, তখন ঐ সকল অঙ্গার (Carbon) বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিশিয়া অঙ্গারক বাষ্প (Carbonic acid gas) উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং রাসায়নিক কার্য্যের জন্য প্রচুর তাপ ও আলোক উৎপন্ন হইয়া পড়ে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঠ ও কয়লার আগুণ জ্বালাইলে যেমন তাপ ও আলোকের উৎপত্তি হয়, সঙ্গে সঙ্গে কতকটা অঙ্গারক বাষ্পও উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়।

পৃথিবীর সমগ্র কল-কারখানায় বৎসরে কত কয়লা পোড়ে, তাহা স্থির করা কঠিন নয়। সুতরাং উহা হইতে কত অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত হয় তাহারও হিসাব চলে। এইপ্রকার গণনায় দেখা গিয়াছে, কেবল কয়লার দাহনে প্রতি সেকেণ্ডে ৭৬ টন্ অর্থাৎ প্রায় একুশ শত মণ ওজনের অঙ্গারকবাষ্প আমাদের আকাশের বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে। বলা বাহুল্য কেবল অগ্নিই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্প জোগায় না। প্রাণীর প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত ঐ বাষ্পের এক একটু বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে, এবং নানা জৈব পদার্থের পচনেও অঙ্গারকবাষ্প উৎপন্ন হইতেছে; ইহারও একটি মোটামুটি হিসাব খাড়া করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাব হইতে দেখা যায়, দশ লক্ষ লোক প্রতি ঘণ্টায় প্রায় আড়াই টন্ অর্থাৎ সত্তর মণ ওজনের অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়।

অঙ্গারকবাষ্প বায়ু অপেক্ষা প্রায় দেড় গুণ ভারী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বিশাল বাষ্পের স্তূপ প্রতি মুহূর্ত্তে বায়ুতে আসিয়া পড়িতে থাকিলে, তাহা ভূপৃষ্ঠের নিম্নতম প্রদেশে সঞ্চিত হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপারে তাহা দেখা যায় না। যে সকল তরল বা বায়বীয় পদার্থের ঘনতা একপ্রকার নয়, একত্র রাখিলেই তাহারা ধীরে ধীরে পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক সমঘন মিশ্র পদার্থ উৎপন্ন করিতে থাকে। এটি তরল এবং বায়বীয় পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম। অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে আসিয়া পড়িলেই, পূর্ব্বোক্ত কারণে বায়ুর সহিত বেশ সমানভাবে মিশিয়া যায়।

সমগ্র বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্প আছে তাহা নানা প্রকারে স্থির করা হইয়াছে। এই সকল হিসাব হইতে দেখা যায়, আমাদের কারখানা এবং কলের অগ্নি হইতে প্রতি বৎসর যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার হাজার গুণ অঙ্গারকবাষ্প সর্ব্বদাই আকাশের বায়ুতে মিশ্রিত রহিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে হাজার বৎসর ধরিয়া কল কারখানার কাজ চলিতে থাকিলে কেবল কলের অগ্নি দ্বারাই বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে।

অঙ্গারকবাষ্প উদ্ভিদের একটি প্রধান ভোজ্য, কিন্তু প্রাণীসকল সাক্ষাৎভাবে ইহা হইতে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না। বরং শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত এই বাষ্পটিকে দেহস্থ করিলে, তাহা বিষবৎ কার্য্য করে। দশ হাজার ভাগ বায়ুতে ১৫ভাগ অঙ্গারকবাষ্প থাকিলেই, তাহা প্রাণীর জীবনরক্ষার অনুপযোগী হইয়া পড়ে। তখন তাহার দ্বারা আর শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ চলে না। পৃথিবীর নানা অংশে কল-কারখানার সংখ্যা যে প্রকার দ্রুত বাড়িয়া চলি-

য়াছে, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে বায়ু দূষিত হইতে হইতে শীঘ্রই ঐ সীমায় আসিয়া পৌঁছিবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকজন আধুনিক বৈজ্ঞানিকের মনে ঠিক্ ঐ আশঙ্কারই উদয় হইয়াছিল। অপরাপর বৈজ্ঞানিকগণ বহু বৎসর পূর্ব্বে আকাশের বায়ু পরীক্ষা করিয়া, তাহাতে যে পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্পের সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ ছিল। প্রাচীন কালের সেই পরীক্ষার ফলের সহিত আধুনিক পরীক্ষার ফলের কি প্রকার পার্থক্য হয় জানিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা আশা করিয়াছিলেন, এখনকার বায়ুমণ্ডলে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প ধরা পড়িবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় আধুনিক জনাকীর্ণ প্রদেশের বায়ুমণ্ডলেও অঙ্গারকবাষ্পের একটু আধিক্য দেখা যায় নাই। শত বৎসর পূর্ব্বেকার কল-কারখানা-হীন সময়ে আকাশে যে পরিমাণ অঙ্গারকবাষ্প থাকিত, এখনকার বায়ুতে প্রায় তাহাই দেখা গিয়াছিল।

অধিকাংশ উদ্ভিদই অঙ্গারকবাষ্পকে নষ্ট করে। উদ্ভিদ্—দেহে যে হরিদ্-বর্ণের পদার্থ (Chlorophyll) মিশ্রিত থাকে, তাহাই বায়ুর অঙ্গারকবাষ্পকে টানিয়া লইয়া সূর্য্যকিরণের সাহায্যে অঙ্গার এবং অক্সিজেনে পরিণত করিয়া ফেলে। পৃথিবীর সমগ্র উদ্ভিদ্ গড়ে কি পরিমাণ অঙ্গারক বাষ্প নষ্ট করে, তাহার একটা মোটামুটি হিসাব করা কঠিন নয়। এইপ্রকার গণনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর সমবেত জনমণ্ডলী এবং অপর প্রাণিগণ যে অঙ্গারকবাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়, পৃথিবীর সমবেত উদ্ভিদ্ তাহার অধিক বাষ্প কখনই নষ্ট করিতে পারে না। কাজেই দেখা যাইতেছে, কল-কারখানার কয়লার দাহন হইতে যে বিশাল বাষ্পস্তূপ নিয়তই বায়ুমণ্ডলে মিশিতেছে, জমা-খরচে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্যে বায়ু দূষিত হওয়ার আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত রহস্যময় ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট একটা বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন ধরিয়া বিষয়টি লইয়া গবেষণা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা বড়ই বিস্ময়কর। ইঁহারা বলিতেছেন, আমাদের পৃথিবীর অধিকাংশ জুড়িয়া যে সকল সাগর মহাসাগর রহিয়াছে, তাহারা যেমন মেঘোৎপত্তি করিয়া এবং বায়ুপ্রবাহকে নিয়মিত রাখিয়া স্থলভাগকে সরস উর্ব্বর করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে সেইপ্রকার বায়ুমণ্ডল হইতে অস্বাস্থ্যকর অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করিয়াও পৃথিবীকে জীববাসোপযোগী করিয়া রাখিতেছে। জল জিনিসটা তরল পদার্থ হইলেও, কতকগুলি বায়বীয় পদার্থ তাহাতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশিয়া থাকিতে পারে। বরফ-গলা এক ঘন ফুট (Cubic foot) জলে ঠিক্ সেই আয়তনের ১১৫০ গুণ আমোনিয়া-বাষ্প মিশ্রিত থাকিতে পারে। বায়ুও জলে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে মিশ্রিত হয়। এই মিশ্রিত বায়ুই অধিকাংশ জলচর প্রাণীদিগকে জীবিত রাখে। জলের এই বিশেষ ধর্ম্মটির উপর নির্ভর করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন, বায়ুরাশিতে নানা প্রকারে যে অঙ্গারকবাষ্প আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার অনেকটা সমুদ্রের জল শোষণ করিয়া রাখে।

একটা উদাহরণ লইলে এই শোষণ ব্যাপারটির কথা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। মনে করা যাউক যেন কুড়ি হাজার ঘন ফুট আয়তনের একটি বাক্সে দশ হাজার ঘন ফুট সাধারণ বায়ু ও ঠিক সেই পরিমাণ জল আছে, এবং বাক্সের মুখ বন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। আকাশের বায়ুর দশ হাজার ভাগে সাধারণতঃ তিন ভাগ অঙ্গারকবাষ্প থাকে। সুতরাং বাক্সে আবদ্ধ দশ হাজার ঘন ফুট বায়ুতে নিশ্চয়ই তিন ঘন ফুট অঙ্গারকবাষ্প মিশ্রিত আছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কতকগুলি বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা জলের একটি প্রধান ধর্ম্ম। কাজেই এখানে আবদ্ধ জল অঙ্গারকবাষ্পমিশ্রিত বায়ুকে শোষণ করিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এক একটু করিয়া বায়ু জল ছাড়িয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিবে। এই দুই বিপরীত কার্য্য বহুক্ষণ চলিতে থাকিলে শেষে এমন একটি সময় আসিবে যখন জলের বায়ু-উদ্গীরণ এবং বায়ু-শোষণের মাত্রা ঠিক একই হইয়া দাঁড়াইবে। এই অবস্থায় উপরের বায়ু এবং জলমিশ্রিত বায়ু এই উভয়ের চাপ সমান হইয়া পড়ে। কাজেই তখন জল আর নূতন করিয়া বায়ু শোষণ করিতে পারে না।

এখন বায়ুর সহিত মিশ্রিত অঙ্গারকবাষ্পের অবস্থা কি হইল আলোচনা করা যাউক। বায়ুতে তিন ঘন-ফিট্ অঙ্গারকবাষ্প মিশ্রিত ছিল। কাজেই যখন আবদ্ধ জল সেই দশ হাজার ঘন-ফিট্ বায়ুর অর্দ্ধেক শোষণ করিয়া ভিতর ও বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় আনিয়াছিল, তখন অঙ্গারকবাষ্পেরও অর্দ্ধেক শোষণ করা ব্যতীত তাহার আর উপায়ান্তর ছিল না। অঙ্গারকবাষ্পই বায়ুকে দূষিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে দূষিত বায়ু কিয়ৎকাল জলের সংস্পর্শে থাকিলেই জল অস্বাস্থ্যকর বাষ্পকে হরণ করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল করিয়া তোলে। উদাহৃত বায়ুতে তিন ঘনফিট্ অঙ্গারকবাষ্প না থাকিয়া যদি ছয় ঘনফিট থাকিত, তাহা হইলেও উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ তিন ঘনফিট বাষ্প জল অনায়াসে শোষণ করিয়া রাখিতে পারিত।

আমরা পূর্ব্বের উদাহরণে জল এবং বায়ুর আয়তন সমান ধরিয়া হিসাব করিয়াছি। বলা বাহুল্য জলের আয়তন যদি বায়ুর আয়তন অপেক্ষা অধিক হইয়া দাঁড়ায় তখন জল আয়তনের অনুপাতে অধিক করিয়া অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করিতে থাকিবে। ভূপৃষ্ঠের অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া যে সাগর মহাসাগর গুলি বিশাল জলরাশি ধারণ করিয়া রহিয়াছে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে তাহারাই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বায়ুরাশিতে এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অঙ্গারকবাষ্প থাকিতে দিতেছে না। আধুনিক কল-কারখানা হইতে যে প্রচুর অঙ্গারকবাষ্প বায়ুতে আসিয়া মিশিতেছে, সমুদ্রের জলরাশিই তাহার অধিকাংশ ধীরে ধীরে গ্রাস করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল রাখিতেছে; এবং আবার কোন কারণে যখন বায়ুর অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ভিতর বাহিরের চাপকে সাম্যাবস্থায় রাখিবার জন্য সেই সকল জলরাশিই পূর্ব্বশোষিত অঙ্গারকবাষ্প উদ্গীরণ করিয়া আকাশের অঙ্গারকবাষ্পের অভাব পূর্ণ করিতেছে।

এক সমুদ্রই অঙ্গারকবাষ্প শোষণ করে না। সমুদ্রের জলে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহারাও ঐ বিষাক্ত বায়ুকে গ্রাস করে। বায়ুরাশিতে যে অঙ্গারকবাষ্প

মুক্তাবস্থায় আছে, এক সমুদ্রের জলই তাহার প্রায় ২৭ গুণ শোষণ করিয়া রাখিতেছে। তা' ছাড়া জলমিশ্রিত কার্ব্বনেট্ ও বাইকার্ব্বনেট্ প্রভৃতি নানা যৌগিক পদার্থগুলি যে কত বাষ্প কুক্ষিগত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কোন কারণে বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বা কমিয়া আসিলে আর বিপদের আশঙ্কা নাই। বিশ্বনাথ সৃষ্টি রক্ষার জন্য সমুদ্রজলে এমন একটি ধর্ম্ম যোজনা করিয়া দিয়াছেন যে, আকাশে অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্য হইলে সমুদ্র জলই সেই অনাবশ্যক বাষ্পকে শোষণ করিয়া লইবে, এবং তার পর কোন কালে সেই বাষ্পের অভাব হইলে যুগযুগান্তরের সঞ্চিত ভাণ্ডার হইতে সেই সমুদ্রই অভাব মোচন করিতে থাকিবে। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। শীতাতপ আঘাত উত্তেজনা প্রভৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে ঠিক একপ্রকারেই কার্য্য করে। কিন্তু অঙ্গারক বাষ্পের কার্য্যটা উহাদের উপর ঠিক বিপরীত হইতে দেখা যায়। উদ্ভিদ সকল অঙ্গারক বাষ্প দেহস্থ করিলেই পুষ্ট হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু কোন প্রকারে সেই একই বাষ্প শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত প্রাণীর দেহে প্রবিষ্ট হইলে বিষের কার্য্য সুরু করিয়া দেয়। উদ্ভিদের প্রয়োজনীয় এবং প্রাণীর বর্জ্জনীয় বাষ্পটিকে বিধাতা যে কৌশলে বায়ুমণ্ডলে নিয়মিত রাখিয়া উভয়েরই সুখ স্বাস্থ্যের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল, মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

যেমন মূল সত্য, আমাদের নিকট অবশ্যম্ভাবীরূপে প্রতীয়মান হইলেও—ক্যাণ্টের ভাষা অনুসারে—তাই বলিয়া উহা কম অপেক্ষিক ও কম বিষয়ীগত নহে, (Subjective) সেইরূপ নৈতিক সত্যও আমাদের নিকট অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে প্রতীয়মান হইলেও উহা কম বিষয়ীগত নহে; কিন্তু যদি ক্যাণ্টের ন্যায়, অবশ্যকর্ত্তব্যতা ও অবশ্যম্ভাবিতাতে আসিয়াই থামা যায়, তাহাহইলে অজ্ঞাতসারে সত্য ও মঙ্গলকে—একেবারে ধ্বংস করা না হউক,—দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়।

মঙ্গল ও অমঙ্গলের মধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী প্রভেদ আছে সেই প্রভেদের মধ্যেই অবশ্যকর্ত্তব্যতার পত্তনভূমি; আবার অবশ্য কর্ত্তব্যতা, যুক্তি অনুসারে স্বাধীনতার পত্তনভূমি। যদি মানুষের কতকগুলি কর্ত্তব্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্য সেই কর্ত্তব্য সাধন করিবার শক্তিও তাহার থাকা চাই;—ধর্ম্মনিয়ম পালন করিবার জন্য, বাসনা ও প্রবৃত্তিকে প্রতিরোধ করিবার সামর্থ্যও থাকা চাই, মানুষের স্বাধীনতা থাকা চাই; বস্তুতও মানুষ স্বাধীন—তাহা না হইলে, মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা আত্মবিরোধ উপস্থিত হয়। অবশ্যকর্ত্তব্যতার সাক্ষাৎ নিশ্চিততার সঙ্গে সঙ্গে, স্বাধীনতার নিশ্চিততা আপনিই আসিয়া পড়ে।

অবশ্য, ইহা স্বাধীনতার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ; কিন্তু Kant যে মনে করেন, ইহাই স্বাধীনতার একমাত্র বৈধ প্রমাণ—এইটিই Kant-এর ভুল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি সাক্ষীচৈতন্যের প্রমাণ না মানিয়া, কেবল যুক্তির প্রমাণই গ্রহণ করিয়াছেন।

যুক্তির প্রমাণ কি আত্মচৈতন্যের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত হওয়া আবশ্যক নহে? আমার স্বাধীনতা আমার কি একটা নিজস্ব জিনিস নহে? পরীক্ষাবাদের সম্বন্ধে (:Empirism) তাঁহার বিষম ভয় না থাকিলে, সাক্ষীচৈতন্যের সাক্ষ্য তিনি অবিশ্বাস করিতে পারিতেন না; কিন্তু তাহা হইলে যুক্তির উপরেও অসীম বিশ্বাস স্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় না। আমরা যেরূপভাবে পৃথিবীর গতিকে বিশ্বাস করি, সেরূপভাবে আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি না। আমাদের অন্তরে ক্রমাগত স্বাধীনতার ভাব অনুভব করি বলিয়াই আমরা স্বাধীনতাকে বিশ্বাস করি।

একথা কি সত্য—কোন একটা কাজ উপস্থিত হইলে, সে কাজটা করিবার জন্য আমরা ইচ্ছা করিতেও পারি, নাও করিতে পারি?—এই প্রশ্নটির মধ্যেই সমস্ত স্বাধীনতার সমস্যা বিদ্যমান।

কাজ করিবার শক্তি ও ইচ্ছা করিবার শক্তি—এই দুইয়ের পার্থক্য প্রথমে নির্দ্ধারণ করা যাউক। অবশ্য, আমাদের অধিকাংশ মনোবৃত্তিই আমাদের ইচ্ছার সেবায় নিযুক্ত ও ইচ্ছার শাসনাধীনে অধিষ্ঠিত; কিন্তু এই ইচ্ছার আধিপত্য প্রকৃত হইলেও নিতান্ত সীমাবদ্ধ; আমি আমার বাহুকে নাড়াইতে ইচ্ছা করি,—অনেক সময়েই নাড়াইতে সমর্থ হই। কিন্তু আমার পেশীসমূহ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে আমি অনেক সময় আমার বাহুকে নাড়াইতে সমর্থ হই না, ইত্যাদি; কার্য্যের সম্পাদন সব সময়ে আমার উপর নির্ভর করে না; কিন্তু সব সময়েই আমার উপর নির্ভর করে কি?—না আমার কার্য্য করিবার সঙ্কল্প। বাহিরের চেষ্টা নিবারিত হইতে পারে, কিন্তু আমার সঙ্কল্প কখনই নিবারিত হইতে পারে না। নিজ ইচ্ছার রাজ্যে ইচ্ছাই সর্ব্বময় অধিপতি।

ইচ্ছার এই সর্ব্বময় আধিপত্য আমরা অন্তরে উপলব্ধি করি। ইচ্ছাশক্তি কি প্রকারে প্রযুক্ত হইবে, প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বেই আমার অন্তরে তাহা অনুভব করি। যখন আমরা কোন কাজ করিবার ইচ্ছা করি, সেই সময়ে আমরা ইহাও অনুভব করি যে উহার উলটাটা করিতেও আমরা সমর্থ; আমি অনুভব করি, আমি আমার সঙ্কল্পের প্রভু—ঐ সঙ্কল্প আমি রহিত করিতেও পারি, সমানভাবে রক্ষা করিতেও পারি, পুনর্গ্রহণ করিতেও পারি। আমার স্বেচ্ছাকৃত কাজটা রহিত হইলেও, ইচ্ছা করিলে উহা যে আমি করিতে পারি—এই অনুভবটি রহিত হয় না। ইচ্ছাশক্তির সহিত এই অনুভবটি সর্ব্বদাই অবস্থিত; এই অনুভবটি ইচ্ছার সমস্ত বহিরভিব্যক্তির উপরে। অতএব স্বাধীনতাই ইচ্ছাশক্তির মুখ্য উপাধি, এবং এই উপাধিটি ইচ্ছার সহিত চিরবিদ্যমান।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি বাসনাও নহে, প্রবৃত্তিও নহে, বরং ঠিক্ তাহার বিপরীত। অতএব ইচ্ছার স্বাধীনতা—বাসনা ও প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নহে। বাসনা ও প্রবৃত্তিতেই মানুষের দাসত্ব, ইচ্ছাতেই মানুষের স্বাধীনতা। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বাধীনতার প্রভেদ যদি অন্যত্রও রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে মনস্তত্ত্ববিদ্যাতে এই প্রভেদ স্থাপন করা কর্ত্তব্য—এই দুইকে এক করিয়া ফেলা কর্ত্তব্য নহে। যখন প্রবৃত্তিসমূহ নিজ খেয়ালের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, তখনই উহা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে;—ইহাকেই উচ্ছৃঙ্খলতা বলে। যখন অন্য প্রবৃত্তিসমূহ একটা কোন বিশেষ উদ্দাম প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কাজ করে

তখনই তাহা অত্যাচার ও উৎপীড়নে পরিণত হয়। এই উচ্ছৃঙ্খলতা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই স্বাধীনতা। কিন্তু এই সংগ্রামের একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই; এই উদ্দেশ্যটি কি? না—বিবেকের আদেশ পালনরূপ কর্ত্তব্যসাধন। আমাদের বিবেক এবং বিবেক যে ন্যায় ধর্ম্মকে আমাদের নিকট প্রকাশ করে সেই ন্যায় ধর্ম্মই আমাদের প্রকৃত নিয়ন্তা ও প্রভু। বিবেকের অনুসরণ করাই ইচ্ছার নিজস্ব নিয়ম, এবং সে ইচ্ছা ইচ্ছাই নহে যে এই নিয়মের অধীন না হয়। যতক্ষণ না বিবেক,—বাসনা প্রবৃত্তি ও স্বার্থের বেগকে ন্যায়ের দ্বারা প্রতিরোধ করে, ততক্ষণ আমাতে আর আমি থাকি না। বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মই প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে আমাদিগকে মুক্ত করে এবং মুক্ত করিয়া আর একটা কিছুর দাসত্ব আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় না। কারণ—ন্যায়ধর্ম্মের অনুসরণে স্বাধীনতাকে বিসর্জ্জন করা হয় না—প্রত্যুত স্বাধীনতাকে রক্ষা করা হয়, স্বাধীনতার বৈধ ব্যবহার করা হয়।

স্বাধীনতাতে এবং বিবেক ও ন্যায়ধর্ম্মের সহিত স্বাধীনতার ঐক্য সাধনেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। মানুষ বিবেকের আলোকে আলোকিত স্বাধীন জীব বলিয়াই মানুষকে পুরুষ বলা যায়।

স্বাধীনতা থাকা কিংবা না থাকা, ইহাতেই একটা জিনিসের সহিত পুরুষের প্রভেদ। জিনিস কি? না যাহা স্বাধীন নহে—সুতরাং যাহা আপনার নিজস্ব নহে, যাহাতে আপনাত্ব কিছুই নাই; শুধু গণনার হিসাবে তাহার একটা পৃথক্ সত্তা আছে মাত্র—সে পৃথক্ সত্তা পুরুষের ন্যায় প্রকৃত পৃথক্‌সত্তা নহে, উহা পৃথক্ সত্তার একটা অসম্পূর্ণ নকল মাত্র। নিজের উপর, জিনিসের কোন অধিকার নাই; যে কেহ প্রথমে আসিয়া জিনিসকে গ্রহণ করে এবং আপনার বলিয়া চিহ্নিত করে—জিনিস্ তাহারই। কোন জিনিসই নিজের নড়াচড়ার জন্য দায়ী নহে, কেন না সে, ইচ্ছা করিয়া নড়াচড়া করে না, এমন কি, সে নড়াচড়া করিতেছে কি না তাহা জানেও না। দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই আছে; কেন না, পুরুষ বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীন; এবং এই বুদ্ধি ও স্বাধীনতার জন্যই পুরুষ দায়ী।

জিনিসের কোন আত্মমর্য্যাদার ভাব নাই; পুরুষেরই আত্মমর্য্যাদা আছে।

জিনিসের নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই—পুরুষ জিনিসের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে তাহাই জিনিসের মূল্য। পুরুষ জিনিসকে ব্যবহার করাতেই জিনিসের যাহা কিছু মূল্য—জিনিস পুরুষের সাধনোপায় মাত্র।

অবশ্যকর্ত্তব্যতার সহিত স্বাধীনতার অস্তিত্ব ভিতরে ভিতরে জড়িত; অর্থাৎ ইহা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য এইরূপ বলিলে—ইহা করিবার স্বাধীনতা আমার আছে—এইরূপ বুঝাইয়া যায়। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে কর্ত্তব্যও নাই এবং যেখানে কর্ত্তব্য নাই সেখানে অধিকারও নাই।

(ক্রমশঃ)

---

## প্রার্থনা।

কে আমি? কিছুই নই শুধু ধূলিসার,
যা কিছু পেয়েছি, সবি তব করুণার।
পথ আমি চিনিনাক, তব লক্ষ্য ধরে,
হইতেছি অগ্রসর এ সংসার পরে।
কত ভয়, কত শঙ্কা এ ভীরু পরাণ
কেন না নিশ্চিন্ত হয়, করি সব দান
তোমার চরণ তলে? আমার ভাবনা
ভবিষ্যের, কত মোর সহস্র বেদনা

তারে ভয় করি আমি, দুর্ব্বোধ হৃদয়
কেন গো তোমারে সঁপি নিশ্চিন্ত না হয়!
আমার অদৃষ্টে ওগো ভাগ্যের দেবতা,
আমার সকল সুখ, সব দুঃখ ব্যথা
তব দত্ত তব দান, কৃতজ্ঞতা ভরে,
রাখিব যা দিবে তুমি যতনে আদরে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী

---

## প্রার্থনা।

দয়াময় জগদীশ তুমি বিনা আর,
কে বুঝিবে হৃদয়ের রাগিণী আমার।
সুখ উছলিত প্রাণ, তবু আঁখিকোনে
কেন অশ্রু ঝরে বিভু, বল তুমি বিনে
কে জানিবে? এত সুখ, আনন্দ মাঝার
কার দয়া রাশি, বুকে জাগে অনিবার।
অতি দীন অতি দুঃখী ছিল যে হৃদয়
এ সৌভাগ্য সুখ লভি পূর্ণ সমুদয়।
কাঙালিনী ছিনু আমি। অমূল্য রতন
দিয়াছ আমারে বিভু হৃদয় গগন
পরিপূর্ণ সুখভরে,৷তব দত্ত দান
তোমারি চরণে সঁপি দেছি ভগবান।
তুমি দয়া করে ওরে রেখ স্নেহছায়,
তব দয়া লভি হোক, ধন্য এ ধরায়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## নানা কথা।

### আমেদিয়া-সম্প্রদায়।

আজ কয়েক মাস হইল কলিকাতা টাউনহলে যে ধর্ম্মসঙ্ঘ বসিয়াছিল, তাহাতে মির্জ্জা গোলাম আমেদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত আমেদিয়া-সম্প্রদায়ের মতামত আলোচিত হয়। তাঁহাদের "message of peace" অর্থাৎ শান্তি-বাণী নামক ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। পঞ্জাব প্রদেশ হইতে ঐ পুস্তক বাহির হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের সহিত অনেকে মিলিয়াছেন। উক্ত মতপ্রবর্ত্তক promissed Messiah ও Mahdi বলিয়া আপনাকে বিঘোষিত করিয়াছেন। সে যাহা হউক তাঁহার পুস্তকখানি সহৃদয়তা ও উদারতায় পরিপূর্ণ। তিনি বলিতেছেন "স্বদেশীয়গণ! আমরা সকলে হিন্দু বা মুসলমান, আমাদের মধ্যে শত শত মতভেদ থাকিলেও জগতের স্রষ্টাপাতা বিধাতা এক ঈশ্বরে আমরা সমবিশ্বাসী। আমরা যে কেবল মনুষ্য বলিয়া এক লক্ষ্য পরায়ণ তাহা নহে, আমরা একই দেশের অধিবাসী, পরস্পরের প্রতিবেশী। যাহাতে আমরা সকলে বন্ধুভাবে অবস্থান করিতে পারি, কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল বিষয়ে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারি, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কেননা আমরা একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। সে ধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, যে ধর্ম্ম অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে বলে না; সে মনুষ্য মনুষ্যই নহে, যাহার ভিতরে সমবেদনা নাই। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমান বিচার, তিনি মনুষ্যের মধ্যে পার্থক্য বিধান করেন নাই। যে শক্তি যে গুণ তিনি ভারতের পূর্ব্বতন লোকের মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই তিনি কি আরবীয় কি পারসিক, কি সিরীয়, কি চীনদেশীয়, কি জাপানী, কি ইউরোপীয়, কি আমেরিকান সকলের মধ্যে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। সকলেই সমান ভাবে বায়ু, বৃষ্টি, অগ্নি হইতে উপকার লাভ করিতেছে, বসুন্ধরা সকলকেই সমানভাবে শস্যে ফল ফুলে সেবা করিতেছে। ইহা হইতেই আমরা এই স্বর্গীয় সত্য ও শিক্ষা লাভ করি যে আমাদিগকেও অপরের প্রতি সদ্ভাব প্রকাশ করিতে হইবে, সঙ্কীর্ণমনা হইয়া থাকিলে চলিবে না। হিন্দু ও মুসলমান যে কেহ এই প্রগাঢ় সত্যের দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাহার বিরোধী হইবে, কেবল যে সে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ও অশেষ কষ্ট ভোগ করিবে, তাহা নহে, তাহাদের সন্তান সন্ততিগণকেও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। বিধাতা প্রদর্শিত নীতি বারিতেই জীবন পরিবর্দ্ধিত হয়, ইহারই অবলম্বনে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কোরাণের প্রথমেই আছে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু সৎ, তাহা ঈশ্বরে বর্ত্তমান, যিনি এই সমস্ত জগতের রাজা। সকল দেশের সকল কালের লোক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই সকল মহৎ ভাবের প্রকাশ কোন জাতিবিশেষের সম্মুখে হয় নাই বা অপরজাতিকে ঈশ্বর এককালে বিস্মৃত হন নাই বা তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টান ও য়িহুদিরা এখনও বিশ্বাস করেন যে ধর্ম্ম প্রবক্তাগণ নিরবচ্ছিন্ন এসরাইল বংশের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং ঈশ্বর অপরাপর জাতির উপর একেবারেই বিরূপ। এমন কি যিশুখৃষ্টের সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে, তিনি কেবল এসরাইল জাতির অন্তর্গত (lost sheep) বিভ্রান্ত মেষগণের জন্য (মনুষ্যের উদ্ধারার্থ) আসিয়াছেন। এ কথায় খৃষ্টের দেবত্বের পরিচয় মিলে না। খৃষ্ট কি কেবল এসরাইল জাতির দেবতা, তিনি কি অন্য কোন জাতির নহেন, যে অপর জাতির সংস্কার বা পরিচালনার সঙ্গে তাঁহার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নাই। য়িহুদি ও খৃষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যে ইহাই মিলে যে য়িহুদিগণের মধ্যেই সকল ধর্ম্ম প্রবক্তা আবির্ভূত হইয়াছেন এবং কেবলমাত্র একটি জাতির নিকট সত্যগ্রন্থগুলি উদ্ভাসিত হইয়াছিল। খৃষ্টানগণের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস এই যে যিশুতেই প্রত্যাদেশ আসিয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্যের প্রতি প্রত্যাদেশের পথ চিরকালের জন্য একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর্য্যসমাজের মধ্যেও অনুরূপ মতের পরিচয় মিলে। তাঁহারা বলেন যে প্রত্যক্ষ

আধ্যাত্মিক সত্যের প্রকাশ ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে নাই। কেবল চারিজন ঋষিকে নির্ব্বাচন করিয়া ঈশ্বর তাঁহার সত্য তাঁহাদিগের নিকট কেবল সংস্কৃত-ভাষাতেই প্রকাশ করিয়াছিলেন; উহাই বেদ। কিন্তু কোরাণের ভাব অন্যরূপ। কোরাণে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে "এমন কোন জাতি নাই, যাহার মধ্যে সতর্ক করিবার জন্য ধর্ম্ম উপদেষ্টা প্রেরিত হয় নাই"। ঈশ্বর যেমন যথাযোগ্যরূপ কামনার বিষয় সকল মনুষ্য মাত্রেরই মধ্যে বিধান করেন, তেমনি তিনি সকলের আত্মার কল্যাণের জন্য তাহার উপায় বিধান করিয়া থাকেন। তিনি দেশ বা জাতি বিশেষের পরিপোষক নহেন, তিনি সমস্ত দেশের সকল কালের, সকল মনুষ্যের পরিপোষক, সকল করুণার নিদান, দৈহিক আধ্যাত্মিক সকল শক্তির মূল, সকলের আশ্রয়! তাঁহার করুণা সকল দেশের সকল কালের মানবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। কাহারও বলিবার সাধ্য নাই যে তিনি দেশ বিশেষে বা ব্যক্তি বিশেষের উপরে তাঁহার করুণা বর্ষণ করেন, অপর জাতি বা দেশ সকলকে তাঁহার করুণা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তিনি জাতি বিশেষের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিলেন, অপর জাতির নিকট তিনি প্রকাশিত হয়েন না, তিনি ইঙ্গিত বা অলৌকিক কার্য্যে এক সময়ে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে লুক্কায়িত আছেন। কেহই কোন যুগে তাঁহার করুণার বাহিরে থাকিতে পারে না, কেহই তাঁহার শুভ আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত নহে।

ঈশ্বরের ভাব, সত্য সত্যই, এমনই উদার। আমাদিগকে সেই উদারতার অনুসরণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশেই এই পুস্তকখানি আপনাদের হস্তে অর্পণ করিতেছি, এবং প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর সকলের অন্তরে সত্যের ভাব জাগ্রত করিয়া দিন, পরস্পরের ভিতরে সহানুভূতি বিকশিত করুন। বন্ধুগণ! পরলোকের তত্ত্ব বহু লোকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত, কেবল তাঁহাদেরই সুবিদিত, যাঁহারা জীবিত থাকিয়াও মৃত, অর্থাৎ বিষয়ে অনাসক্ত।

আপনারা সকলেই জানেন যে একতা ও মিলন সকল প্রকার অসুবিধা ও বিঘ্নকে বিদূরিত করিয়া দেয়। যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা একতা লাভের জন্য সচেষ্ট হউন। হিন্দু ও মুসলমান আমরা একই দেশে বাস করিতেছি ও আমরা কখন মনেও করিতে পারি না যে ইহাদের মধ্যে এক জাতি অপর জাতিকে এই ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিবে। অন্যদিকে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এদেশে নানা কারণে নানা বন্ধনে এমনই বিজড়িত, যে উভয়ের মধ্যে সেই বন্ধন রজ্জুকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব। যদি কখন এদেশে বিনাশের কারণ আসিয়া উপস্থিত হয়, হিন্দু মুসলমান ইহাদের মধ্যে কোন এক জাতি রক্ষা পাইবে না, উভয়কেই মরিতে হইবে। যদি ইহাদের মধ্যে এক জাতি অপরকে ঔদ্ধত্য সহকারে ঘৃণিত করিবার চেষ্টা করে, অপর জাতিকেও ঘৃণিত হইতে হইবে। যদি এক জাতি অপর জাতির প্রতি মমতা বা সমবেদনা প্রকাশ না করে, অপর জাতিকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে। যদি এক জাতি অপর জাতির বিনাশ সাধনে উদ্যত হয়, তবে তাহার ঠিক সেই অবস্থা, যে বৃক্ষের সেই শাখা কাটিতে উদ্যত, যাহার উপর সে বসিয়া আছে। আপনারা এক্ষণে সুশিক্ষিত, অনুকূল সময় আসিয়া উপস্থিত; পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব ও ঘৃণা পরিহার করিতে হইবে, সকলকে সখ্য ও মৈত্রীর দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। তোমরা যে শিক্ষা লাভ করিয়াছ, তাহার প্রভাবে স্বদেশীয় ও প্রতিবেশীর উপরে তোমার সমবেদনা জাগিয়া উঠুক। একেত সংসাররূপ মরুভূমির মধ্যে আমাদিগকে বিচরণ করিতে হয়, তাহার উপর প্রখর সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রচণ্ড উত্তাপ আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। এই উত্তাপ ও পিপাসা শান্তি করিবার একমাত্র ঔষধ মিলন ও একতার স্নিগ্ধ বারি।

বর্ত্তমানে যে দুর্য্যোগ চলিতেছে, তাহার জন্য আমাদের পরস্পরের মধ্যে শান্তি স্থাপনের বিশেষ আবশ্যক। আমরা নানা পরীক্ষা ও দুর্নিমিত্তের মধ্যে পড়িয়াছি। ভূমিকম্প দুর্ভিক্ষ প্লেগ সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে, এবং ঈশ্বর আমাকে বলিতেছেন, যদি লোকে অনুতাপ পরায়ণ হইয়া অসৎ কর্ম্ম হইতে বিনিবৃত্ত না হয়, বিপদের পর বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। সকলে সাবধান হও। এইরূপ ঘোর বিপদ আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু মুসলমান মিলিত হও।

আপনারা বলিতে পারেন যে ধর্ম্ম-বিষয়ক পার্থক্য এতই অধিক যে মিলন হইতেই পারে না। কিন্তু ভগবানের আদেশ লক্ষ্য করিয়া চলিলে ধর্ম্মের পার্থক্য বাধা দিতে পারে না। যাহা কিছু পার্থক্য আছে সকলেরই মীমাংসা হইতে পারে, যদি জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি পথ-প্রদর্শক হয়। যখন এক সম্প্রদায় উত্থিত হইয়া অপর সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রবক্তাকে অকারণ নিন্দা করে, ধর্ম্মগ্রন্থ গুলিকে প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া ঘোষণা করে, তখনই উভয় জাতির মধ্যে পার্থক্য ভীষণ হইয়া দাঁড়ায়।

যাঁহারা উভয় জাতির সম্মিলন প্রয়াসী তাঁহারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, যে কোরাণের শিক্ষা বেদের শিক্ষার বিরোধী নহে। যাঁহারা আর্য্য-সমাজের অন্তর্ভূত তাঁহারা বলেন বেদের ভিতরেই ঈশ্বরের সমস্ত বাণী নিহিত। কিন্তু এই হিন্দুজাতির ভিতরে পরবর্ত্তী সময়ে যে সকল অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, অসংখ্য লোক তাহাদের অনুবর্ত্তী এবং তাহারা স্বীকার করে, যে ঐ অবতারগণ স্বর্গীয় সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি তাহাই হয়, তবে ঈশ্বরের সত্যের প্রকাশ যে কেবল বৈদিক সময়ে হইয়াছিল এবং বেদেই তাহা নিহিত, একথা অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা যাইতে পারে। লক্ষ লক্ষ লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করে, ইহাও বলে যে স্বর্গীয় সত্যের প্রকাশ (divine revelation) তাঁহার নিকট হইয়াছিল। এমন কি তাহারা এতদূর পর্য্যন্তও বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণ দেহধারী ঈশ্বর।

হিন্দুধর্ম্মের শেষযুগে নানকের আবির্ভাব। তাঁহার নিষ্ঠা ও পবিত্রতার বিরুদ্ধে একটি কথা বলিবার নাই। তাঁহার দলস্থ লোক, যাহারা শিখ বলিয়া খ্যাত, বর্ত্তমানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। তিনি প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন, যে স্বর্গীয় সত্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল। "গ্রন্থ" ও "জনম সাক্ষী" পুস্তকে তাহার

পরিচয় পাওয়া যায়। উহার এক স্থানে আছে যে ঈশ্বর তাঁহাকে বলিয়াছেন, যে মুসলমান-ধর্ম্ম সত্য। এই কারণে তিনি মক্কা তীর্থে যাত্রা করেন। তিনি মুসলমান ধর্ম্মের আদেশ পালন করিতেন। সত্য সত্যই তিনি ঈশ্বরের নিষ্ঠাবান সেবক ছিলেন এবং ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার প্রেমের রসাস্বাদন করিতে দিয়াছিলেন। তিনি জাতিতে হিন্দু,কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মের পক্ষপাতী। দেরাতে নানকের যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তাহার গাত্রে কোরাণের এই কথাই সুস্পষ্ট লিখিত আছে যে "ঈশ্বর ভিন্ন আর অন্য ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদই তাহার প্রচারক"। তিনি সাধনা প্রভাবে নির্ম্মল চরিত্রগুণে ধর্ম্মের এমন নিগূঢ় তত্ব সকল জানিতে পারিয়াছিলেন, যাহা পণ্ডিতগণের নিকটেও অপরিজ্ঞাত ছিল। হিন্দুজাতির উপরে তাঁহার অবিচলিত প্রেম, অথচ মুসলমানের উপরে হিন্দুজাতির যে ঘৃণা আছে, তাহা বিদূরিত করিবার জন্য, তিনি যথোচিত চেষ্টা পাইয়াছিলেন। সমগ্র হিন্দু-সমাজ যদি নানকের আদেশ প্রতিপালন করিতেন, তাহা হইলে হিন্দু মুসলমানের ভিতরে পার্থক্য বিদূরিত হইত এবং উহারা এক জাতিতে পরিণত হইত।

ঈশ্বরের বাণী ও তাঁহার প্রকাশের বিরাম নাই। তিনি পুরাকালে যেমন আবির্ভূত হইতেন, এখনও তেমনি প্রকাশিত হয়েন। তিনি এখনও আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করেন। তাঁহার মহৎ ভাবের খর্ব্বতা নাই। বিগত ৩০ বৎসর ধরিয়া আমি তাঁহার কথা শুনিতেছি,।

শত শত ঈঙ্গিত তিনি আমার সম্মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কোন জাতিই নাই, যাহার সম্মুখে তাঁহার প্রকাশ হয় নাই। বেদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রকাশ নিবৃত্তি পায় নাই। যাঁহার সূর্য্য সকলকে আলোক দিতেছে যাঁহার বৃষ্টি দেশ নির্ব্বিশেষে নিপতিত হইতেছে, এমন কি হইতে পারে যে তিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে অনুদারভাবে জাতিবিশেষের উপরে বিশেষকালে বিশেষ ভাষায় তাঁহার কৃপা বিতরণ করিবেন। হিব্রুগণ বলেন যে এসরাইল জাতি, ঈশ্বরের প্রিয় জাতি এবং ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক কেবল তাহাদেরই মধ্যে সম্ভব। জেরোয়াষ্টার ধর্ম্মভুক্তগণ বলেন তাঁহাদের ধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্ম হইতেও প্রাচীন। এইরূপ ধারণাই অন্য ধর্ম্মের উপরে বিরাগ আনয়ন করে। সকলেই আপনাপন ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তনে বিব্রত। এতদিন কেহই বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা পান নাই। গৌতম বুদ্ধ ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, বেদের দেবত্বে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তাই লোকে অজ্ঞেয়বাদী নাস্তিক বলিয়া তাঁহার নিন্দা ঘোষণা করিল। ভারতে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইল না বটে, কিন্তু দেশ দেশান্তরে তিনি বিজয়ী হইলেন। সমগ্র মানব সমাজের এক তৃতীয়াংশ লোক তাঁহার শিষ্য। রুশিয়া আমেরিকায়ও এ ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতেছে।

অসংখ্য মনুষ্য যে ধর্ম্ম-প্রবক্তাকে সম্মাননা করে, যদি সেই বিদেশীয় ধর্ম্ম-প্রবক্তার নিন্দাবাদে আমরা প্রবৃত্ত হই, তবে উহা হইতে যে বিষ উৎপন্ন হয়,তাহাতে আমাদের দেহ আত্মা উভয়ই জর্জ্জরিত হইবে। বিবাদ কলহে শান্তি নাই, আরাম নাই, আমরা মুসলমান, আমরা অন্য দেশের ধর্ম্ম প্রবক্তাগণের নিন্দা ঘোষণা করি না। ঈশ্বর ধর্ম্মপ্রবক্তাগণকে যে সম্মান দিয়াছেন, অপরের পক্ষে তাহা দুর্লভ। বেদের অনুবর্ত্তী হইয়া লোকে এক ঈশ্বরকে পূজা করে না; কেহ বা সূর্য্যকে কেহ বা অগ্নিকে কেহ বা গঙ্গাকে কেহ বা অসংখ্য দেবতাকে পূজা করে। বেদের ধর্ম্ম এমনই জটিল যে তাহারা সকলেই বেদ হইতেই অনুরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করে। আর্য্য সমাজীরা অগ্নি বায়ু জল অর্থে ঈশ্বরই বুঝেন। কিন্তু তাঁহাদের ব্যাখ্যা সমগ্র হিন্দুসমাজের ভিতরে এখনও গৃহীত হয় নাই। বেদের ভিতর ঘোর আপত্তিকর নিয়োগ-বিধি রহিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে বেদের ভিতরে উহা অনুপ্রবিষ্ট হওয়াই সম্ভব। তজ্জন্য আমরা বেদের আদৌ নিন্দাবাদ করি না। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আর্য্য-সমাজের লোকেরা আমাদের উপর বিরূপ। আর্য্যসমাজের লোকেরা যদি হজরত মহম্মদকে প্রবক্তা বলিয়া স্বীকার করেন, আমরা অমেদিয়া সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বেদ ও ঋষিগণকে সম্যক শ্রদ্ধা করিতে প্রস্তুত। আমাদের পরস্পরের মধ্যে এইরূপ নিয়ম-পত্র লিখিত হউক, যে অপরের নিন্দাবাদ করিবে, তাহাকে দণ্ডস্বরূপ তিন লক্ষ টাকা দিতে হইবে! আমেদিয়া সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা এক্ষণে প্রায় চারি-লক্ষ। স্বদেশীয়গণ! শান্তির সমান আর কিছুই নাই। আমাদের মধ্যে কত বিবাদ বিসম্বাদ বর্ত্তমান। ইহা বিদূরিত করিবার আর অন্য উপায় নাই। কোরাণ শান্তির কথাই প্রচার করিয়া আসিতেছেন। কোরাণে আছে "বিশ্বাসীগণ বল যে আমরা জগতের সমস্ত ধর্ম্ম প্রবক্তাকে বিশ্বাস করি, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য রাখি না, কাহাকেও গ্রহণ করিতে গিয়া অপরকে পরিত্যাগ করি না"। এমন উদার ভাব আর কোথায় আছে। যাহারা অন্য ধর্ম্মের ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণকে নিন্দা করে তাহারা যে কেবল ঈশ্বরের নিকটে অপরাধী তাহা নহে, তাহারা বিবাদের বীজ প্রোথিত করে। ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন "প্রতিমা বা প্রতিমাপূজককে গালি দিও না, তাহারা তোমার ঈশ্বরকে গালি দিবে, কেন না, তাহারা ঈশ্বর কি, তাহা জানে না। কিন্তু লোকে হজরত মহম্মদের নিন্দা করে। মহম্মদের প্রতি মুসলমানগণের এমনই শ্রদ্ধা, যে তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবা মাত্র মুসলমানরাজা তাঁহার সিংহাসন হইতে অবতরণ করেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার দাসের ন্যায় জ্ঞান করেন। তাঁহার নিন্দাবাদ করা কিছুতেই সঙ্গত নহে।

যখন ধরা পাপে পরিপূরিত হয়, পাপের মাত্রা পুণ্যের মাত্রাকে অতিক্রম করে, তখনই ঈশ্বর একজনকে দূত স্বরূপ প্রেরণ করেন। রোগ হইলেই যে চিকিৎসকের প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। যখন বেদের উৎপত্তি হয়, তখন কিছু পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয় নাই। মহম্মদ যখন আবির্ভূত হন, তখন চারিদিকে নিবিড় অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল। জনেক ইউরোপীয় মিসনরি Rev. Pfender নিজেই Mizan-ul-Haq নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে সে সময়ে খ্রীষ্টিয়ানগণের বিলক্ষণ পতন হইয়াছিল। তাহার খ্রীষ্টি-

য়ান নামে কলঙ্ক আনিয়াছিল। কোরাণেই আছে যে সে সময়ে "দেশ ও সমুদ্র সকলই কলঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল।" মহম্মদ আসিয়া কি করিলেন। তাঁহার প্রথম কার্য্য আরব জাতির সংস্কার। সে সময়ে তাহারা মনুষ্য নামের যোগ্য ছিল না। চৌর্য্য দস্যুবৃত্তি নরহত্যা ব্যভিচার তাহাদের কার্য্য ছিল। মদিরাপানে দ্যূতক্রীড়ায় তাহারা রত হইত। কিন্তু মহম্মদ অল্প দিনের ভিতরেই তাহাদিগের ভিতরে অলৌকিক উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে অনেকেই তাঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। এমন কি মহম্মদের প্রাণনাশ করিবার তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু ক্রমে তাহারা আপনাদের বিলাস বিভব সকলই বিসর্জ্জন দিয়া মহম্মদেরই শরণাপন্ন হইল। অনেকে বলেন যে মহম্মদ তরবারির সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন। কিন্তু এ কথা একেবারেই সঙ্গত নহে। ৪০ বৎসর বয়সে তাঁহার হৃদয় ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইল। মক্কা হইতে কয়েক মাইল দূরে হীরা পর্ব্বত-গুহায় তিনি লুক্কায়িত ভাবে ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। একদিন ঈশ্বর তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইলেন। বলিলেন পৃথিবীস্থ জনগণ ঈশ্বরের পথ পরিত্যাগ করিয়াছে, পাপে কলঙ্কিত হইয়াছে। আমি তোমাকে প্রবক্তা apostle নিয়োগ করিলাম, তুমি সকলকে সাবধান কর, নচেৎ ঘোর শাস্তি তাহারা প্রাপ্ত হইবে। হজরত বলিলেন আমি যে নিরক্ষর। ঈশ্বর তখন তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন এবং স্বর্গীয় জ্ঞান তাহাতে নিহিত করিলেন। হজরত সেই আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে অনেককে আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। তিনি যে আবাসে অবস্থান করিতেন, শত্রুগণ সেখানে আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু ঈশ্বর যাঁহাকে রক্ষা করিতে চান, কে তাহাকে বিনাশ করিতে পারে। হজরত আবু বেকারের সঙ্গে মদিনায় পলায়ন করিলেন। পথে শত্রুহস্তে তাঁহার জীবনসংশয়; তথাপি তাঁহার কোন বিঘ্ন ঘটিল না। মদিনায় গিয়া তিনি অনেককে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। ইহাতে মক্কার লোকের ক্রোধের আর অবধি রহিল না। যাহারা মক্কায় থাকিয়া ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকে বিদেশে পলায়ন করিল, কেহ বা আবিসিনিয়ার রাজার আশ্রয়ে চলিয়া গেল। যাহারা দরিদ্র মুসলমান, তাহাদের উপর নির্য্যাতনের আর সীমা রহিল না। মক্কার অধিবাসীগণ, সেই মুসলমানদিগের স্ত্রী পুত্র ও কন্যাকে ধরিয়া ঘোর নিষ্ঠুরতার সহিত বিনাশ করিতে লাগিল। সে নিষ্ঠুরতা ঈশ্বরের দয়া ও সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিল। তিনি মহম্মদকে বলিলেন, আমি আর্ত্তনাদ আর শুনিতে পারি না, অত্যাচারীগণকে বিনাশ কর, যাহারা নিরপরাধগণকে হত্যা করিয়াছে, তরবারি তাহাদিগকে বিনষ্ট করুক। তাহাই হইল। ইহারই নাম "জেহাদ"। সত্য সত্য তরবারির সাহায্যে এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। বরং কোরাণে আছে "মুসলমানধর্ম্মে বাধ্যতা নাই" অর্থাৎ জোর করিয়া কাহাকে এ ধর্ম্ম দীক্ষিত করিও না। মুষ্টিমেয় মুসলমান অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিল। তাহারা নিজের রক্ত দিয়া মুসলমানধর্ম্মের সত্যতা সপ্রমাণিত করিয়াছিল। ঈশ্বরের একত্ব স্থাপন করিতে তাহারা এমনই লালায়িত হইয়াছিল, যে তাহারা আফ্রিকার মরুভূমে, চীন-দেশে তাহারা সৈনিকের বেশে নহে, কিন্তু দীন—প্রচারক রূপে গমন করিয়া বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইল। বৈরাগ্যের বেশে ভারতে আসিয়া, এ ধর্ম্ম তাহারা প্রচার করিল। ইউরোপের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়া, এ ধর্ম্মের সমাচার ঘোষণা করিল। সকল দেশের সকল জাতির প্রতি এ ধর্ম্মের দৃষ্টি, ঐক্য স্থাপনই এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। খৃষ্ট-ধর্ম্মের মত নহে, যে যিশু কেবল এসরাইল জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। যিশুর নিকটে এক সময়ে একটি অপর জাতীয় স্ত্রীলোক আসিয়া বলিয়াছিল "প্রভু আমার প্রতি কৃপা কর"। যিশু তাহা শুনিয়া বলিলেন, আমি কেবল এসরাইল জাতির জন্য আসিয়াছি। সেই স্ত্রীলোক আবার প্রার্থনা জানাইল, যিশু কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। কিন্তু কোরাণে আছে যে মহম্মদ সমস্ত জাতির জন্য আসিয়াছিলেন। উপরে যাহা বলিলাম তাহার জন্য যিশুকে নিন্দা করিতেছি না, কেন না তাঁহার প্রচার তখন কেবল এসরাইলগণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মুসার শিক্ষার ভিতরে আমরা প্রতিহিংসার আদেশ দেখিতে পাই, কিন্তু যিশুর শিক্ষাতে ক্ষমা ও দয়ার কথার বিশেষ উল্লেখ আছে। কিন্তু কোরাণ মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন। কোরাণের আদেশ এই যে মুসার আদেশানুযায়ী, অপরাধীকে তাহার অপরাধ-বিবেচনায় দণ্ড দিবে, এবং যিশুর আদেশানুযায়ী ক্ষমা প্রদর্শন করিবে, যখন বুঝিবে ক্ষমা প্রভাবে অপরাধীর চৈতন্যোৎপাদনের সম্ভাবনা আছে।

আনুষ্ঠানিক দান—পরলোকগত কলিকাতা Corporation এর Health Officer Dr. R. Sen এর শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার সহধর্ম্মিণী দশ টাকা ও ভাগলপুর নিবাসী পরলোক গত বামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের শ্রাদ্ধোপলক্ষে তাঁহার জনৈক আত্মীয় দুই টাকা, আদি ব্রাহ্মসমাজে দান করিয়াছেন। ভগবান্ পরলোকগত আত্মাদের শান্তিবিধান করুণ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

---

# বিশেষ দ্রষ্টব্য।

## গ্রাহকের প্রতি।

আমাদের সানুনয় নিবেদন এই যে আপনার নিকট বর্ত্তমান শক পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকারমূল্য ও মাশুল হিসাবে যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া অগৌণে ঐ টাকা পাঠাইয়া দেন এই পূজার সময়ে এখানকার কর্ম্মচারী ও পাওয়ানাদারদিগের সকল পাওনা ও অগ্রিম-দেয় চুকাইয়া দিতে হয়। আশা করি বিমুখ হইতে হইবে না।

১৮৩১ শক, ১লা আশ্বিন।
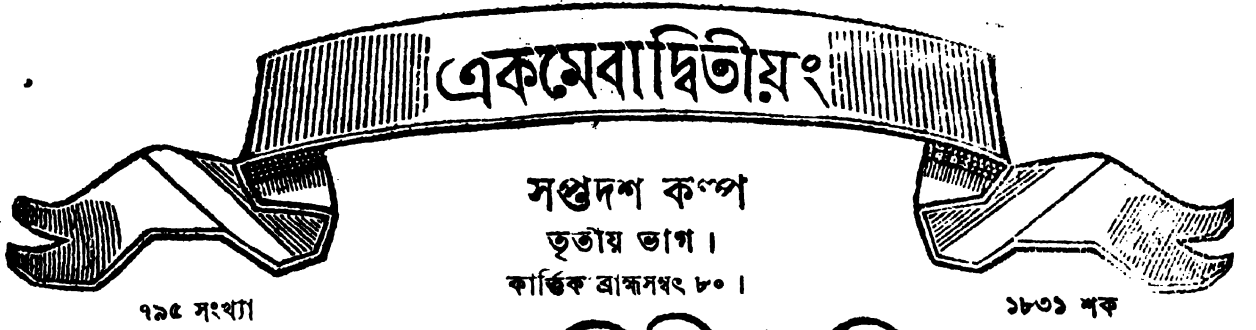
"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

## একাদশ ঋক।

ইতিহাস এই—গৃৎসমদ ঋষি যজ্ঞস্থলে একাকী ছিলেন। ইন্দ্র-শত্রু অসুরেরা তাঁহাকে যজ্ঞস্থলে একাকী দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, ইন্দ্র আমাদিগের ভয়ে গৃৎসমদের রূপ ধারণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিল। গৃৎসমদ, 'আমি ইন্দ্র নহি' অসুরদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ইন্দ্রের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন—

যঃ পৃথিবীং ব্যথমানামদৃংহত্তঃ পর্ব্বতান্ প্রকুপিতা অরম্নাৎ।
যো অন্তরিক্ষং বিমমে বরীয়ো যো দ্যামস্তভনাৎস জনাসইন্দ্রঃ"

হে জন সকল, যিনি গতিশীল পৃথিবীকে চক্ররেখায় দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্ব্বত সকলকে স্বস্বস্থানে নিয়মিত রাখিয়াছেন; যিনি অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত রাখিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যোহত্বাহিমরিণাৎ সপ্তসিন্ধূন্ যোগা উদাজদপধা বলস্য।
যো অশ্মনোরন্তরগ্নিং জজান সংবৃক্সমৎসু স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি মেঘকে হনন করিয়া বন্ধন হইতে জল প্রেরণ করিয়া সপ্তসিন্ধুকে পূর্ণ করেন, যিনি বল নামক অসুর কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গো সকল উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যুদগ্নি উৎপাদন করেন, যিনি যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র (আমি নহি)।

যেনেমাবিশ্বাচ্যবনাকৃতানি যোদাসং বর্ণমধরং গুহাকঃ।
শ্বঘ্নীব যোজিগীবাল্লক্ষমাদদর্যঃ পুষ্টানি স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যাঁহার দ্বারা এই নশ্বর বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে, যিনি নিকৃষ্ট দাসবর্ণকে গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় (ব্যাধ যেমন পক্ষী হনন করিয়া তাহাকে গ্রহণ করে) শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র (আমি নহি)।

যংস্মাপৃচ্ছন্তি কুহসেতিঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনম্।
সোঅর্যঃ পুষ্টীর্বিজইবামিনাতিশ্রদস্মৈধত্ত স জনাসইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যে ঘোর দেব সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই। যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত

ধন বিনাশ করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তিনি ইন্দ্র (আমি নহি)।

যোরধ্রস্য চোদিতা যঃ কৃশস্য যো ব্রহ্মণো নাধমানস্য কীরেঃ।
যুক্তগ্রাব্ণো যোবিতা সুশিপ্রঃ সুতসোমস্য স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি সমৃদ্ধি প্রদান করেন, যিনি দরিদ্রকে এবং স্তুতিকারী ব্রাহ্মণকে ধন দান করেন, যিনি শোভন হনুবিশিষ্ট হইয়া সোমাভিষবকারী যজমানের রক্ষক, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যস্যাশ্বাসঃ প্রদিশি যস্য গাবো যস্য গ্রামা যস্য বিশ্বে রথাসঃ॥
য সূর্য্যং য উষসং জজান যো অপাংনেতা স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, অশ্ব সমূহ, গ্রাম সমূহ এবং রথ সমূহ যাঁহার আজ্ঞাধীন, যিনি সূর্য্যকে এবং উষাকে উৎপাদন করিয়াছেন, যিনি জল প্রেরণ করেন, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যংক্রন্দসী সংযতী বিহ্বয়েতে পরেঽবর উভয়া অমিত্রাঃ।
সমানং চিদ্রথমাতস্থিবাংসা নানা হবেতে স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, একপথগামী দ্যুলোক ও ভূলোক যাঁহাকে আহ্বান করে, উত্তম ও অধম বিরোধী শত্রুগণ আত্মরক্ষার্থ যাহাকে আহ্বান করে, একবিধ রথারূঢ় দুই জনই যাঁহাকে নানা প্রকারে আহ্বান করে তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যস্মান্ন ঋতে বিজয়ন্তে জনাসো যং যুধ্যমানা অবসে হবন্তে।
যো বিশ্বস্য প্রতিমানং বভূব যো অচ্যুত চ্যুৎ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি না হইলে লোকে জয়লাভ করিতে পারে না, যুদ্ধকালে রক্ষালাভের নিমিত্ত লোকেরা যাহাকে আহ্বান করে, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিনিধি, এবং যিনি অচ্যুত পর্ব্বত সকলকেও চূর্ণ করেন, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যঃ শশ্বতো মহ্যেনো দধানানমন্যমানাঞ্ছর্বা জঘান।
যঃ শর্ধতে নানুদদাতি শৃধ্যাং যো দস্যোর্হন্তা স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, যিনি বজ্র দ্বারা বহু সংখ্যক মহাপাপী অপূজককে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দস্যুগণের হন্তা, তিনি ইন্দ্র, (আমি নহি)।

দ্যাবা চিদস্মৈ পৃথিবী নমেতে শুষ্মাচ্চিদস্য পর্বতা ভয়ন্তে।
যঃ সোমপা নিচিতো বজ্রবাহুর্যো বজ্রহস্তঃ স জনাস ইন্দ্রঃ॥

হে জন সকল, দ্যাবা পৃথিবী তাঁহাকে নমস্কার করে, পর্ব্বতগণ তাঁহার বলে ভীত হয়, যিনি সোমপাতা, দৃঢ়াঙ্গ, বজ্রবাহু ও বজ্রযুক্ত, তিনিই ইন্দ্র, (আমি নহি)।

যঃ সুন্বতে পচতে দুধ্র আচিদ্বাজং দর্দর্ষি স কিলাসি সত্যঃ।
বয়ন্ত ইন্দ্র বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুবীরাসো বিদথমাবদেম॥

হে ইন্দ্র, তুমি দুর্দ্ধর্ষ হইয়া সোমাভিষবকারী পাপকারী যজমানকে অন্ন প্রদান কর, অতএব তুমিই সত্য। আমরা প্রিয় ও বীর পুত্র পৌত্রাদি বিশিষ্ট হইয়া চিরকাল তোমার স্তোত্র পাঠ করিব।

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,
## মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি।)

আমার মধ্যে এমন একটি পুরুষ আছেন যিনি সম্মানের যোগ্য; এই জন্য, তাঁহাকে সম্মান করা আমার যেরূপ কর্ত্তব্য সেইরূপ তাঁহার প্রতি অন্যকেও সম্মান প্রদর্শন করাইবার অধিকার আমার আছে। যে পরিমাণে আমার অধিকার—ঠিক্ সেই পরিমাণে আমার কর্ত্তব্য। একটি অপরটির সাক্ষাৎ হেতু। আমার অন্তরস্থ পুরুষ যাহা কিছু করেন তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা—অর্থাৎ আমার বুদ্ধি ও আমার স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যদি আমার পবিত্র কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে, অন্যের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার আমার কোন অধিকার থাকে না। কিন্তু যেহেতু আমার অন্তরস্থ পুরুষটি শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র, সেই হেতু তিনি

আমার নিজের সম্বন্ধে আমার উপর একটি কর্তব্য স্থাপন করেন এবং অন্যের সম্বন্ধে আমাকে একটি অধিকার প্রদান করেন।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, পাপ, প্রভৃতির হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া যেমন আপনার অবনতি আমি নিজে সাধন করিতে পারি না, সেইরূপ অন্যকেও তাহা করিতে দিতে পারি না।

পুরুষ—এক মাত্র পুরুষই অলঙ্ঘনীয়।

এই পুরুষ শুধু যে আত্মচৈতন্যের অন্তরতম মন্দিরেই অলঙ্ঘনীয় তাহা নহে, পরন্তু তাঁহার সমস্ত বৈধ অভিব্যক্তির মধ্যে, তাঁহার সমস্ত কার্য্যের মধ্যে, কার্য্যের সমস্ত পরিণামের মধ্যে, এমন কি যাহার দ্বারা পুরুষ আপনার কার্য্যসাধন করিয়া লন সেই উপায় সমূহের মধ্যেও তিনি অলঙ্ঘনীয়।

সম্পত্তির অলঙ্ঘনীয়তার পত্তনভূমি এইখানেই। এই পুরুষই সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান সম্পত্তি। পুরুষ হইতেই অন্য সমস্ত সম্পত্তির উৎপত্তি। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। সম্পত্তির নিজের কোন স্বত্বাধিকার নাই; সম্পত্তির যিনি অধিকারী তিনিই তাঁহার নিজ চরিত্র, নিজ স্বামিত্ব, নিজ অধিকার সেই সম্পত্তির উপর মুদ্রিত করিয়া দেন।

পুরুষ যখন আপনার উপর কর্তৃত্ব হারায় তখন তাহার অবনতি না হইয়া যায় না। নিজের উপর পুরুষের যে অধিকার সে অধিকারের হস্তান্তর হইতে পারে না। আপনার উপর পুরুষের যা-ইচ্ছা-তাই করিবার অধিকার নাই; পুরুষ আপনার প্রতি একটা জিনিসের মত ব্যবহার করিতে পারে না, সে আপনাকে বিক্রয় করিতে পারে না, হত্যা করিতে পারে না, এবং যে দুই উপাদানে সে গঠিত—সেই স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেককে সে কোন প্রকারেই রহিত করিতে পারে না।

শিশুদিগেরও কতকগুলি অধিকার কি জন্য থাকে?—এই জন্য যে, তাহারা পরে স্বাধীন পুরুষ হইয়া উঠিবে। যে পুনর্ব্বার শৈশবদশা প্রাপ্ত হয় সেই অতিবৃদ্ধেরই বা কতকগুলি অধিকার কেন থাকে?—যে নিতান্ত নির্ব্বোধ তাহারই বা কতকগুলি বিশেষ অধিকার কেন থাকে? যেখানে জ্ঞানের উন্মেষ ও যেখানে জ্ঞানের অবশেষ-চিহ্ন দেখা যায় সেখানেও লোকে স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি বদ্ধ-পাগল, কিংবা যে বৃদ্ধ 'ভিমরতি'গ্রস্ত হইয়াছে তাহার কোন অধিকার থাকে না কেন? তাহার কারণ, তাহারা তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে। দাসত্ব প্রথা এত ঘৃণিত হইল কেন? কারণ, ইহাতে করিয়া মনুষ্যত্বের প্রতি সাংঘাতিক আঘাত করা হয়। এই জন্য কতকগুলি বাড়াবাড়ি আত্মোৎসর্গের কাজও দোষের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। সেরূপ ধরণের আত্মোৎসর্গ করাও দোষ, কাহাকে করিতে বলাও দোষ। মানব-অধিকারের যেটি সারাংশ তাহার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা,—স্বাধীনতার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা, পুরুষের আত্মমর্য্যাদার বিরুদ্ধে আত্মোৎসর্গ করা—এই সকল আত্মোৎসর্গের কাজ বৈধ নহে। স্বাধীনতার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা কতকগুলি নৈতিক ধারণার উল্লেখ করিলাম—এই সকল নৈতিক ধারণার মধ্যেই স্বাধীনতা অধিষ্ঠিত ও স্বাধীনতার প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। অতঃপর আমরা পাপ পুণ্যের বিচার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। ইহাই নৈতিক ব্যাপারের শেষ উপাদান।

---

## মনুর উপদেশ।

আচম্য প্রযতো নিত্যমুভে সন্ধ্যে সমাহিতঃ
শুচৌ দেশে জপন্ জপ্যমুপাসীত যথাবিধি ॥

সূর্য্যের উদয়াস্ত উভয় সন্ধিকালে, আচমন করিয়া, সুসংযত হইয়া, শুচিদেশে অনন্যমনে যথাবিধি গায়ত্রী জপ করত উপাসনা করিবে।

যদি স্ত্রী যদ্যবরজঃ শ্রেয়ঃ কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ
তৎসর্ব্বমাচরেদ্যুক্তো যত্রবাস্য রমেন্মনঃ ॥

যদি স্ত্রীলোক বা শূদ্রাদিও কিছু শ্রেয় কার্য্যের অনুষ্ঠান বা উপদেশ করেন, ব্রহ্মচারী যত্নবান হইয়া সে সমুদয় সমাচরণ করিবেন, অথবা তাঁহার যাহাতে মনের প্রসন্নতা হয় তাহাই করিবেন।

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ ॥

কোন কোন আচার্য্য ধর্ম্ম ও অর্থকে, কেহ বা কাম ও অর্থকে, কেহ বা ধর্ম্মকে, কেহ বা অর্থকে, শ্রেয় বলিয়া থাকেন; পরন্তু ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গই শ্রেয়—ইহাই স্থির নিশ্চয়।

আচার্য্যো ব্রহ্মণোমূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ
মাতা পৃথিব্যা মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বো মূর্ত্তিরাত্মনঃ ॥

আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি; পিতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মূর্ত্তি; মাতা পৃথিবীর মূর্ত্তি এবং ভ্রাতা আপনার দ্বিতীয় মূর্ত্তি।

আচার্য্যশ্চ পিতাচৈব মাতা ভ্রাতা চ পূর্ব্বজঃ
নার্ত্তেনাপ্যবমন্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ ॥

আচার্য্য, পিতা, মাতা বা ভ্রাতা কর্ত্তৃক পীড়িত হইলেও ইহাঁদিগকে, কাহারও—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের—অবমাননা করা উচিত নহে।

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাম্,
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥

সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে পিতামাতা যে ক্লেশ সহ্য করেন, শতবর্ষেও তাহা পরিশোধ করিতে পারা যায় না।

তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাদাচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে।

প্রতিদিন পিতা মাতার ও আচার্য্যের প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে। ইহাঁরা তিন জনে তুষ্ট থাকিলে সমুদয় তপস্যা সমাপ্ত হয়।

তেষাং ত্রয়াণাং শুশ্রূষা পরমং তপ উচ্যতে
ন তৈরভ্যননুজ্ঞাতো ধর্ম্মমন্যং সমাচরেৎ ॥

ইহাঁদের তিন জনের শুশ্রূষাকেই পণ্ডিতেরা পরম তপস্যা বলিয়াছেন। ইহাঁদের অনুমোদিত না হইলে অপর কোন ধর্ম্মের আচরণ করিতে নাই।

ত্রিষ্বপ্রমাদ্যন্নেতেষু ত্রীন্ লোকান্ বিজয়েদ্ গৃহী
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা দেববদ্দিবি মোদতে ॥

এই তিনজনের সম্বন্ধে প্রমাদ না করিয়া যে গৃহী অবস্থিতি করেন, তিনি তিন লোক জয় করেন। এবং তিনি স্বশরীরে দীপ্যমান হইয়া দেবতাদিগের ন্যায় স্বর্গে বিমলানন্দ উপভোগ করেন।

সর্ব্বে তস্যাদৃতা ধর্ম্মা যস্যৈতে ত্রয় আদৃতাঃ
অনাদৃতাস্তু যস্যৈতে সর্ব্বাস্তস্যাফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥

যিনি এই তিন জনকে আদর করেন, তাঁহার ধর্ম্মকে আদর করা হয়। আর যিনি এই তিন জনের অনাদর করেন, তাঁহার সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম নিষ্ফল হয়।

যাবৎত্রয়স্তে জীবেয়ুস্তাবন্নান্যং সমাচরেৎ
তেষ্বেব নিত্যং শুশ্রূষাং কুর্য্যাৎ প্রিয়হিতেরতঃ ॥

যতদিন ইহাঁরা জীবিত থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত অন্য কর্ম্ম করিবে না; প্রতিদিন ইহাঁদেরই প্রিয়কার্য্যসাধন ও সেবা-শুশ্রূষা করিবে।

তেষামনুপরোধেন পারত্র্যং যদ্ যদাচরেৎ
তত্তন্নিবেদয়েৎ তেভ্যো মনোবচনকর্ম্মভিঃ ॥

ইহাঁদের সেবাদির অবিরোধে পারত্রিক

কর্ম্ম যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, সে সমুদয় ইহাদিগকে নিবেদন করিবে।

ত্রিষেতেষ্বিতিকৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাদুপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে॥

তিনজনকে উক্তরূপে শুশ্রূষা করিলেই পুরুষের সমস্ত ইতিকৃত্য শেষ হয়। ইহাই সাক্ষাৎ পরম ধর্ম্ম। তদ্ভিন্ন অন্য সমস্তকে (ধর্ম্মের অন্য বাহ্যানুষ্ঠানকে) উপধর্ম্ম বলা যায়।

---

## ধর্ম্ম।

### (প্রাপ্ত)

অতি পুরাকাল হইতে মানুষ জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে ধর্ম্ম কি?—প্রকৃত ধর্ম্ম কাহাকে বলে? প্রত্যেক জাতি—এমন কি প্রত্যেক মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ঐ সকল উত্তর বিচিত্র হইলেও, তাহাদের মধ্যে যে একতা আছে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া তৎসমুদায়কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। ক্রিয়াকলাপ।

সকল দেশে এক সময়ে না এক সময়ে হোম, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি কতকগুলি বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তখনকার বিশ্বাস এই ছিল যে, ঐ সকল বাহ্যক্রিয়া সম্পাদন করিলেই পাপমুক্ত হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভারতবর্ষে বৈদিক কালে যাগযজ্ঞের বাহুল্য ছিল এবং আর্য্যজাতির নিত্য নৈমিত্তিক ধর্ম্মকার্য্য অনেক পরিমাণে ঐ বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুগামী হইয়া চলিয়া আসিয়াছে। তৎপরে উপনিষদ্ আসিয়া বলিলেন :—

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা ঽস্মিন্ লোকে জুহোতি
যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি॥

হে গার্গি! যে ব্যক্তি এই অবিনাশী পুরুষকে না জানিয়া যদিও বহু সহস্র বৎসর ইহলোকে হোম যাগ যজ্ঞ তপস্যা করে, তথাপি সে স্থায়ী ফল প্রাপ্ত হয় না।

জ্ঞানযোগে পরব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন, ব্রহ্মদর্শন এবং তাঁহার সহবাসজনিত ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করাই মুক্তি, ইহা প্রচারিত হইল। কিন্তু এই মহদ্ভাব সর্ব্বসাধারণ গ্রহণ করিতে পারিল না। অল্পসংখ্যক সাধক মধ্যে এই উচ্চ ধর্ম্ম আবদ্ধ রহিল। জনসাধারণ বাহ্যক্রিয়া সকল লইয়াই সন্তুষ্ট রহিল। ক্রমশঃ ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িল এবং বাহ্যক্রিয়ার আড়ম্বরে মানুষের অন্তর্দৃষ্টি তিরোহিত হইল। এই সময়ে শাক্যসিংহ আসিয়া মুক্তির আর এক পথ দেখাইলেন। অষ্টসোপানমার্গ দিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের উপায় প্রদর্শন করিলেন এবং নিজ জীবনে তাহা সাধন করিয়া সকলকে স্তম্ভিত করিলেন। জনসমাজ বিপর্য্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বহু দর্শন-শাস্ত্রের উৎপত্তি হইল। কালসহকারে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিতাড়িত হইলে পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইল। উপনিষদের একেশ্বর বাদ চলিয়া গিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতা আসিলেন। এত দূর পরিবর্ত্তন হইল যে এক দিকে বাহ্যক্রিয়ার মহা সমারোহ, অপর দিকে জীবন অতি হীনভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। মনকে প্রবোধ দিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত, নদী হ্রদে পবিত্রতা আরোপ করিয়া তাহাতে স্নান ও তীর্থ পর্য্যটন প্রভৃতি পাপ-মোচনের সহজ উপায় সকল ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইল।

২। মত ও বিশ্বাস।

কতকগুলি মত ও বিশ্বাস ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ,

পরমাণু নিত্য তাহা হইতে কি জগৎ ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে, অথবা শূন্য হইতে ব্রহ্ম তাহা সৃজন করিয়াছেন, দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদ, পূর্ব্ব ও পরজন্ম, জড় ও মায়াবাদ, সাকার ও নিরাকার বাদ, অবতারবাদ এবং কোন সাধু পুরুষকে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যবর্ত্তী করিয়া সেই সাধুর শরণাগত হইয়া মুক্তিলাভ, ইত্যাদি মতের উপর ধর্ম্মকে স্থাপিত করা হইয়া থাকে। এই প্রকারে পৃথিবীতে অগণ্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন। ঐ সকল মতের বিচারে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। পণ্ডিতেরা কত গ্রন্থ রচনা করিয়া মানুষকে বিক্ষিপ্ত ও সংশয়াপন্ন করিয়া তুলিলেন। ধর্ম্ম-যুদ্ধে পৃথিবী আকুল হইয়া পড়িল।

৩। পূজা।

বিভিন্ন প্রকারের পূজাকে তৃতীয় শ্রেণী বলা যাইতে পারে। নিরাকার পূজা, অবতার পূজা, মূর্ত্তি পূজা এবং ব্রহ্মের কোন কোনও স্বরূপ একটি চিত্রেতে অঙ্কিত করিয়া তাহার পূজা প্রচলিত আছে। উপনিষদের আর্য্য ঋষিগণ, ইহুদিরা এবং মুসলমানেরা নিরাকার ব্রহ্মের পূজার প্রচার করিয়াছেন। ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অনেক লোক কেবল কোন চিহ্নের পূজা করিয়া থাকেন। এই সকল পূজাই ধর্ম্ম বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই সকল, ধর্ম্মের এক এক অঙ্গ ও ভাব মাত্র। এ সকলেও ধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হয় নাই। সাময়িক অবস্থানুরূপ বিধাতার নানা প্রকার ব্যবস্থা মাত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপের প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশে ঠিক এই প্রকার ঘটিয়াছিল। সেখানেও প্রথমে কতকগুলি বাহ্যক্রিয়া ধর্ম্মবোধে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইলে ইউরোপের অবস্থান্তর হয়। পরে ক্যাথলিক ধর্ম্মের এমন শোচনীয় অবস্থা ঘটে যে, সংস্কারক লুথারের প্রয়োজন হইল। ধর্ম্ম অনেক পরিমাণ পরিশুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক দলে মত ও বিশ্বাস লইয়া এরূপ সংগ্রাম উপস্থিত হইল, যে জ্বলন্ত চিতাগ্নিতে কত নরহত্যা হইয়া গেল। কালসহকারে চ্যানিং ও থিয়োডার পার্কার প্রভৃতি নেতাগণের নেতৃত্বে ইউরোপে ও দূর আমেরিকাতে ইউনিটেরিয়ান ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উদারতা ও ক্ষমা আসিয়া শান্তি স্থাপন করিতেছে।

যুগ-ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম-রাজ্যের এবম্প্রকার অবস্থায় ভগবান সর্ব্বাঙ্গীন ও সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রেরণ করিলেন। সে ধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন যে, ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক ব্যাপার। পরমাত্মা পূর্ণ ও অশরীরী। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিকৃতি এবং সসীম, কিন্তু তাহা অশরীরী ও অমর। অগ্রে আপনাকে জানিয়া পরমাত্মাকে জানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সংযমদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করা, কামনা ও স্পৃহা নির্ব্বাণ করা, সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। জ্ঞানযোগে সেই জ্ঞানময়ের পূজা করা, সাধনা দ্বারা জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সমাধান করা এবং তজ্জনিত ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও যোগানন্দ উপভোগ করা, সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। পরব্রহ্মে প্রীতি, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বিশ্বপিতা ও সকল নরনারীকে তাঁহার সন্তান জ্ঞানে ব্রহ্মপ্রীতিকাম হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করা সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। অধ্যাত্মযোগে ব্রহ্মের অনুজ্ঞা সকল প্রণিধান করিয়া জীবনের কার্য্য ও নরনারীর সেবা করা সে ধর্ম্মের লক্ষ্য। ফলতঃ যে

ক্রিয়া দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলন হয় না—সে অনুষ্ঠান ব্রহ্মলাভের সহযোগী নহে। সংসারাশ্রমে থাকিয়া অথচ তাহার অতীত হইয়া আত্মা দ্বারা পরমাত্মাকে বিদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই সে ধর্ম্মের উপদেশ।

নাবিরতোদুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্মফল কামনা প্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই; সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় নাই।

ইন্দ্রিয় সংযম না করিলে চিত্ত শুদ্ধি হয় না। ব্রতাবলম্বন করিয়া যতি হইলেআত্মা স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্থির ও নির্ম্মল হয় এবং তখন তাহাতে পরমাত্মার ছবি প্রতিফলিত দেখা যায়। সেই জন্য যুগ-ধর্ম্ম সর্ব্বাগ্রে সংযম অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন। আমি হোম যাগ যজ্ঞ করিলাম, নদ নদী হ্রদকে পবিত্র জ্ঞানে প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করিলাম, দেহকে মার্জ্জিত করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধিতে চর্চ্চিত করিলাম, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বসনে তাহাকে আচ্ছাদিত করিলাম, শরীরের শুচি হইল বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে আত্মার শুচি চাই। রিপুগণকে আপন বশে আনিতে হইবে। তাহারা প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় আমাকে বিপথে লইয়া যাইতেছে। বিবেক সারথি তাহাদিগকে সংযম করিতে পারিল না। তবে আর আমার কি হইল? হায়! কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও চাতুরী দ্বারা ধনোপার্জ্জনে আমরা পরাঙ্মুখ হই না। স্বার্থসাধনে ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই এবং ব্যভিচারে আত্মাকে কলুষিত করি।

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্"

নিজ আত্মা-রূপ শ্রেষ্ঠ কোষ-মধ্যে সেই নির্ম্মল ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বাস করিতেছেন। তথায় তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তবে আর তীর্থ পর্য্যটনে, দেব দর্শনে ও উপাসনা মন্দিরে গমন করিয়া কি অভিষ্ট সিদ্ধ হইল? এই সুন্দর মনোহর ও বিচিত্র বাহ্য-জগতে বিশ্বরচয়িতার জ্ঞান, শক্তি, সৌন্দর্য্য ও মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। ইতিহাসে সেই বিধাতা, পুরুষ-রূপে কার্য্য করিতেছেন, সেখানে তাঁহার হস্ত দেখিলাম না। হায় ব্রহ্মদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমি পরমাত্মাকে প্রিয় বলিয়া বুঝিলাম না, সেই অক্ষর ব্রহ্মে প্রীতি স্থাপন করিলাম না, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে প্রিয় করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে অক্ষম রহিলাম এবং চলিষ্ণু ক্ষণভঙ্গুর পদার্থকে প্রিয় জ্ঞানে তাহার মায়ায় বদ্ধ হইলাম। কাজেই ঐ সকল বস্তুর অভাবে আমাকে সতত হাহাকার করিতে হইতেছে। সেই সারাৎসার ভগবানে যদি প্রীতি স্থাপন করিয়া তাঁহাতে আত্মা সমাধান করিতে শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আমার এ প্রকার দুর্দ্দশা হইত না। অনাথ আশ্রম-সকলের অবিভাবক ও অবিভাবিকারা অনাথ নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগকে, কত যত্নে ও স্নেহে অপত্যনির্ব্বিশেষে লালন পালন করিয়া থাকেন। হায় আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি তাহাতে নিয়োজিত করিতে পারিলাম না।

এই সংসারে জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের কর্ম্মক্ষেত্র অতীব প্রশস্ত। সেবাধর্ম্মের মত আর কিছু নাই। জীবে দয়া, জীবের দুঃখ মোচন করা এবং মানুষের সেবা করাই ভগবানের প্রিয় কার্য্য।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়-কার্য্য-সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

আমি স্বার্থপর হইয়া নিজের ও পরিবার বর্গের সেবায় কালাতিপাত করিলাম। পর দুঃখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম না। জনসাধারণের হিতসাধন পক্ষে আপনার শক্তি সামর্থ্যকে কিঞ্চিৎ পরিমানেও নিয়োজিত করিলাম না। ইতর জন্তুর সহিত আমার পার্থক্য কোথায় রহিল।

হে ভগবান্! তুমি আমাকে অনেক দেখাইলে ও শুনাইলে। এমন জীবন্ত ও পূর্ণ যুগ-ধর্ম্ম আমার সম্মুখে ধরিলে। আমি তাহা আপন জীবনে গ্রহণ করিতে পারিলাম না! আমার দশা কি হইবে।

---

## সেখ সাদি।

### বার্দ্ধক্য।

জীবন ত অবসন্ন প্রায়। কয়েকটি মুহূর্ত্তের বিলম্ব রহিয়াছে। আমার আত্মা দেহ হইতে চলিষ্ণু। পৃথিবীতে আসিয়া কয়েক গ্রাস মাত্র আহার করিয়াছি। অদৃষ্ট আসিয়া আদেশ করিল, যথেষ্ঠ হইয়াছে, চল, আর কাজ নাই।

চিকিৎসক মুখবিবর হইতে সজোরে ভগ্নদন্ত উৎপাটন করে; জান না সে কি কষ্ট। মৃত্যু আসিয়া দেহ হইতে আমার অস্তিত্ব টানিয়া তুলিতেছে; ভাব দেখি আমার কি নিদারুণ যন্ত্রণা।

তুমি আমার রোগ শান্তির জন্য চিকিৎসক আনিবার কথা বলিতেছ। কিন্তু গৃহের অঙ্গরাগে কি হইবে। দেখিতেছ না যে আমুল ভিত্তি কাঁপিতেছে।

কোন এক বৃদ্ধের সহিত সুন্দরী যুবতীর পরিণয় হইয়াছিল। বৃদ্ধ যথেষ্ঠ স্নেহ করিত, কিন্তু স্ত্রীর মন উঠিত না। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া যুবতী একটি অশান্ত সুশ্রী যুবককে পতিত্বে বরণ করিল। পত্নী নূতন পতির সৌন্দর্য্যে এমনই বিভোর, যে তাহার অসদাচরণেও ক্ষুব্ধ হইত না, বলিত আমি তোমার সহিত নরকের যন্ত্রণাও ভোগ করিতে প্রস্তুত, বৃদ্ধের সঙ্গে স্বর্গবাসও চাহি না। তোমার মুখে পলাণ্ডুর গন্ধ আমার ভাল লাগে, কদাকারের হস্তে গোলাপও আমার অতৃপ্তিকর।

তুমি গন্তব্য পথের শেষ সীমায় পৌঁছিবার জন্য যাত্রা করিয়াছ। ধীরে চল। আরব অশ্বের ন্যায় নিতান্ত দ্রুত চলিও না। শীঘ্র অবসন্ন হইয়া পড়িবে। দেখ উষ্ট্র দিবারাত্র চলিয়াও কাতর হয় না।

অনেক দিন হইল একটি প্রফুল্লবদন উৎসাহী যুবককে দেখিয়াছিলাম। বহুকাল পরে দেখি সে বৃদ্ধ হইয়াছে। বিবাহ করিয়া সন্তান সন্ততিতে পরিবৃত হইয়া পড়িয়াছে। মুখে তাহার সে আনন্দ নাই, সকল প্রকার তৎপরতা চলিয়া গিয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৃদ্ধ বলিল, যৌবনের যে স্রোত চলিয়া গিয়াছে, তাহা ত আর ফিরিবার নহে। শস্যে পাক ধরিলে সে কি আর মাথা তুলিয়া থাকিতে পারে। হায়! আমার সেই পূর্ব্ব আনন্দের অবস্থা একেবারেই তিরোহিত।

প্রৌঢ়! কলপ দিয়া তুমি তোমার কেশদাম কালো করিতে পার। কিন্তু আমার বার্দ্ধক্যজনিত কুব্জ-পৃষ্ঠ আর সোজা হইবার নহে।

একদিন আমার বৃদ্ধা মাতাকে অকারণ তিরস্কার করিয়াছিলাম। মাতা ক্ষুণ্ণ হইয়া সাশ্রু-নয়নে বলিলেন, বাল্যের তোমার সেই অসহায় অবস্থা কি মনে পড়ে না। এক্ষণে তুমি বলশালী হইয়াছ, জান না কি সেই অসহায় অবস্থায় কেবল আমার

এই বক্ষকেই তুমি সজোরে ধরিয়া থাকিতে। সে দিন চলিয়া গিয়াছে, তাই বলিয়া কি এই অসহায়া বৃদ্ধাকে তিরস্কার করিতে হয়।

যৌবন ও প্রেম।

হৃদয়কে যে অধিকার করিতে পারে সেই ত প্রকৃত সুন্দর। যাহার উপর প্রেম পড়িয়াছে, তাহার নিকট নিরবচ্ছিন্ন সেবা প্রত্যাশা করিও না। প্রেমের মিলনে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়।

প্রেমের তাড়নে অনেক সময়ে সতীত্বের ও সাধুতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। যখন স্বর্ণের লোভ অপরকে আকৃষ্ট করিতে না পারে, তখন স্বর্ণত ধূলিমুষ্টির সমান।

সমগ্র কোরাণ একজনের কণ্ঠস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু হায় প্রেমের চিন্তাতে যখন সে নিমগ্ন, সে অক্ষর পর্য্যন্তও ভুলিয়া যায়।

কোন এক সুন্দর যুবার উপরে গুরুর বিশেষ প্রীতি পড়িয়াছিল। শিষ্য তাহা লক্ষ্য করিয়া গুরুকে বলিল, মহাশয় ত্রুটি দেখাইয়া আমাকে সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিবেন। গুরু উত্তরে কহিলেন, আমার দ্বারা তাহা ঘটিবে না। আমি তোমার সবই সুন্দর দেখি। ভৎর্সনার ভার অপরের উপর প্রদান কর। হায়! প্রেমিকের চক্ষু অজস্র ত্রুটি খুঁজিয়া পায় না, একটি মাত্র গুণ দেখিয়াই সে বিমুগ্ধ।

প্রেমাস্পদ বন্ধু গৃহে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া সাগ্রহে আসন ত্যাগ করিতে গিয়া জামা লাগিয়া হঠাৎ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। আলোক নির্ব্বাণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, আমার কুটীরে যখন তোমার আবির্ভাব হইয়াছে, অন্য আলোকের আবশ্যক কি?

কোন প্রেমিক তাহার প্রেমের পাত্রী অলোকসামান্যা সুন্দরীকে বলিয়াছিল অপরে তোমার সহিত আলাপ করিতে পায় কেন। সুন্দরী বলিল আমি আমার সৌন্দর্য্যে জ্বলিতেছি, কীট পতঙ্গ আসিয়া যদি ঝাঁপ দেয়, কি করিব। তুমি কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিও।

সে সম্পদের সুখ কি বুঝিবে, যে দারিদ্র্য না সম্ভোগ করিয়াছে।

অনুতাপ দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ উপশান্ত হইতে পারে, কিন্তু হায় নিন্দুকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কোথায়?

মদিরা পানে যে উৎফুল্ল, সে অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত অনিদ্রিত থাকে। কিন্তু যে ঈশ্বরের অমৃত পান করিয়াছে, শেষ-বিচার দিনই তাহার শুভ প্রাতঃকাল।

পার্থিব কোন বিষয়ে এতটা বিমুগ্ধ হইয়া পড়িও না, যে তাহার অভাবে তোমার অন্তর অশান্ত হইতে পারে।

তরঙ্গ না থাকিলে সমুদ্র-ভ্রমণ কতই তৃপ্তিকর, কণ্টক না থাকিলে গোলাপের সঙ্গ কতই মধুময়।

আনন্দের উদ্যানে আমি ময়ূরের ন্যায় সগর্ব্বে বিহার করিতেছিলাম, কিন্তু আজ প্রেমের পাত্রের বিরহে সর্পের ন্যায় ছটফট করিতেছি।

আমার প্রেমের সামগ্রীর সৌন্দর্য্য খুঁজিয়া পাইতেছে না। আমার চক্ষু দিয়া দেখ দেখি, তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে।*

---

## সুন্দরদাস।

আত্ম-জ্ঞান।

১

শুনে না শ্রবণ, দেখে না আঁখি,
শুঁকিয়া আত্মারে না পায় ঘ্রাণ;

* ইহার কোন কোন অংশ পত্রিকার অনুপযোগী হইলেও সাদির বৈচিত্র দেখাইবার জন্য দিলাম এবং এইখানেই সাদির অনুবাদ পরিসমাপ্ত হইল।

পরশি পাইতে ত্বক্ না পারে,
পারে না জিহ্বা করিতে বাখান।

২

মন বুদ্ধি হারে জানিতে যাঁরে,
চিত্ত অহঙ্কার তাঁরে কি জানে ?
শোভন-শব্দ স্তবধ বর্ণনে
আত্মারে আপনি আত্মাই জানে।

৩

সূর্য্য দেখা যায় সূর্য্যের তেজে
চাঁদের আলোতে চাঁদ পরখি,
নভে জ্বলে তারা নিজ আলোকে
তড়িতে তড়িৎ উঠে চমকি।

৪

দীপেরে প্রকাশে দীপ জ্বলিয়া
হীরাতে হীরার পায় আভাস,
তেমনি, সোম্য ! জানিও আত্মারে,
নিজ জ্ঞানে হয় নিজে প্রকাশ।

৫

বিশ্ব-সৃষ্টি, কেহ কহে, স্বভাবে,
কেহ কহে, কর্ম্ম তাহার মূল,
কাল, কেহ তার কারণ ভনে,
কেহ বকে আরো কতই ভুল।

৬

অকস্মাৎ কেহ, কেহ বা ব্রহ্মা
কল্পে স্রষ্টা বলি ; কেমনে মানি ?
হে সুন্দর ! যদি না অনুভবিস্থু,
অন্তর-আত্মারে কেমনে জানি ?

৭

কেহ বা বিচারে আকাশ মোক্ষ,
পাতাল কাহারো মোক্ষ নির্দ্দেশ ;
কেহ বা কিছুই না পারি বুঝিতে
এখানেই, বলে, সকলি শেষ।

৮

শিলায় কাহার মোক্ষ বিচার,
ছায়ামাত্র কেহ আশ্রিতে চায়,
হে সুন্দর ! শুন, আত্মজ্ঞান বিনা
নাহিক মোক্ষ অন্য কোথায়।

৯

মরণে মোক্ষ কহেন পণ্ডিত,
জৈনেরও মোক্ষ মরণে কেনা,
মরণে মোক্ষ তপস্বীও বলে,
মরণে মোক্ষ কহে শিবসেনা।

১০

ম্লেচ্ছও কহে ওই এক কথা,
এ নহে, বাণী সন্দেহ ভিন্ন ;
হে সুন্দর ! তুমি লভ আত্মজ্ঞান,
তাহা ছাড়া মোক্ষ নাহিক অন্য।

---

## প্রার্থনা।

প্রতিদিন ভয়ে ভয়ে শুধু চেয়ে থাকি,
আকুল কাতর হৃদে তোমারেই ডাকি।
বিষম পরীক্ষা স্মরি, দুর্ব্বল হৃদয়
হতেছে কাতর, বিভু করুণা নিলয়,
তোমার করুণা বিনা জানি মনে আমি
কে রাখিবে ? ওগো দেব ওগো অন্তর্যামী
আমার সকলি তুমি জানিতেছ, তবু
পরীক্ষা করিতে মোরে কেন চাও প্রভু ?
দীন আমি অতি দীন, আমি ক্ষুদ্রতম,
তুমি ভূমা অন্তহীন,—এ জীবনে মম
কি লীলা তোমার প্রভু ? এ চিত্ত দুর্ব্বল
কি শক্তি বিকাশে তুমি করিবে সকল !
নাই ভক্তি, নাই বল, নাই মোর ভাষা,
তোমার করুণা আছে এই মোর আশা।

---

## প্রার্থনা।

( জ্যোৎস্নার * জন্মদিনে )

দয়াময় জ্যোৎস্না মোর তব দত্ত দান,
তারে পেয়ে গেছে দুঃখ, জুড়ায়েছে প্রাণ।
তোমার এ দান আমি যতনে আদরে,
রাখিয়াছি কি আনন্দে সদা স্নেহ ভরে,
জান তুমি দয়াময়, আমার কামনা
কি জাগিছে অন্তরেতে, কি মোর প্রার্থনা।

---

* কবির পুত্রের নাম।

তুমিই দিয়াছ তারে, তুমি হাতে ধরে
এ সংসারে লয়ে চল প্রভু দয়া করে।
তুমি হও পিতা, মাতা, শিক্ষক তাহার
সত্য পথে ডাক তারে সংসার মাঝার।
পবিত্র নির্ম্মল কর, ক্ষুদ্র হিয়া মাঝে
তোমার আসন যেন সতত বিরাজে।
তব আশীর্ব্বাদ তারে থাকুক ঘিরিয়া,
ধ্রুবতারা সম থাক উজলি ও হিয়া।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

# DECLARATION OF TRUST

BETWEEN

NARA NATH MOOKERJEE and anr

and

SURENDRA NATH TAGORE and anr

*Dated the 22nd of august* 1909.

*This Indenture* made this 22nd day of august in the year of Christ one thousand nine hundred and nine, *Between Nara nath Mookerjee,* son of Nerode Nath Mookerjee, Brahmin, Land-holder of 29 Benia-pooker Road in the suburbs of the town of Calcutta, Executor to the will of Neel Comul Mookerjee deceased and *Umerto Lall Gangooly* the only surviving son of Ram Lall Gangooly deceased Brahmin Land-holder of the one part and *Surendra nath Tagore* son of Satyendra Nath Tagore of 19 Store Road, Ballygunge in the suburbs of Calcutta aforesaid, *Proney Lall Gangooly* son of Benode Lall Gangooly deceased of No 181/4 Upper Circular Road Calcutta, Brahmin Land-holders of the other part. *Whereas* the said Ram Lall Gangooly who was in his life time a Hindu Governed by the Bengal School of Hindu Law departed this life on the fourteenth December, one thousand eight hundred and sixty one, leaving before his death made and published his Last Will and Testament whereby and whereof he appointed the said Neel Comul Mookerjee ( since deceased ) his executor and whereby he desired that the dividend on the two Bonded Ware House shares ( particulars whereof are given in the schedule here under written ) should be regularly paid over to the Brahmo Somaj as realised *and whereas* on or about the fourteenth day of January one thousand eight hundred and sixty two, Probate of the said Will was duly obtained from the Supreme Court by the said executor *and whereas* the said Neel Comul Mookerjee did all along during his life time pay the dividend on the two Bonded Ware House shares to the Adi Brahmo Somaj, *and whereas* on the thirty first day of October one thousand nine hundred and seven the said Neel Comul Mookerjee died leaving before his death made and published his Last Will and Testament and whereby and whereof he appointed his grandson the said Nara Nath Mookerjee ( party hereto ) and another his executors *and whereas* of the said executors only the said Nara Nath Mookerjee has proved the said Will of the said Neel Comal Mookerjee deceased and has obtained Probate thereof from the High Court of Judicature at Fort William in Bengal in its Testamentary and Intestate Jurisdiction *and whereas* by a certain Indenture being a deed of Trust bearing date the eighth day of January one thousand eight hundred and thirty and made between Dwarka Nath Tagore, Kally Nath Roy, Prosunna Kumar Tagore, Ram Chunder Bidyabagish and Ram Mohun Roy, of the one part, Baikunta Nath Roy, Radha Prosad Roy and Rama Nath Tagore of the other part all that the messuage tenement land hereditaments and premises therein particularly described were conveyed to the said parties therein of the other part subject to the several trusts and to and for the ends intents and purposes in the said Indenture declared with liberty to the said parties of the one part or the survivor or survivors of them with the consent and concurrence of the said parties thereto of the other part to appoint by any deed or writing under their or his hands and seals or hand and seal to nominate substitute and appoint some other fit person or persons to supply the place of the trustees or trustee respectively dying desiring to be discharged or refusing or neglecting or becoming incapable by or in any means to act as such Trustee *and whereas* the said Neel Comul Mookerjee has all along up to the time of his death paid the dividend on the

said two Bonded Ware House shares to the Trustee for the time being of the said Indenture of Trust (Commonly Called Trustees of the Adi Brahmo Somaj) *and whereas* Dwijendra Nath Tagore, Janaki Nath Ghosal and Dwipendra Nath Tagore are the present Trustees of the said Indenture of Trust and of the said Adi Brahmo Somaj *and whereas* the said two Bonded Ware House shares were last in the possession of the said Nara nath Mookerjee as the Executor of the Will of the said Neel Comul Mookerjee but have since then been transferred and made over to the said Surrendra nath Tagore and Pronoy Lall Gangooly upon trusts as herein before mentioned. *Now this Indenture witnesseth* that it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto that the said Surendra Nath Tagore and Pronoy Lall Gangooly shall henceforth hold the said two Bonded Ware House shares particulars whereof are given in the schedule hereunder written upon trust to draw the dividend or bonus in respect thereof as and when the same will be declared and become due and make over the same to the said Dwijendra Nath Tagore, Dwipendra Nath Tagore and Janaki Nath Ghosal as such Trustees of the said Indenture of Trust and of the said Adi Brahmo Samaj or to the person or persons to be appointed Trustees hereafter in the place and stead of the said Dwijendra Nath Tagore, Dwipendra Nath Tagore and Janaki Nath Ghosal as Trustees of the said Deed of Trust and of the said Adi Branmo Somaj and it is hereby further declared that the said Trustees of this Indenture or the Survivor or survivors of them or their respective heirs executors administrators representatives and assigns shall be at liberty by a Deed or Deeds under their or his hand and seal to appoint Trustees or Trustee of this Indenture as and when occasion will arise. *In witness where of* the said parties to these presents have hereunto set their respective hands and seals the day and year first above written.

Signed Sealed and Delivered.

Sd. Nara nath Mookerjee
Sd. Umerto Lall Gangooly
Sd. Surendra nath Tagore
Sd. Pronoy Lall Gangulie

WITNESSES

Sd. Rabindra nath Tagore
Sd. Satyapersad Ganguli

SCHEDULE

Two Bonded ware House Association shares No. 1162 and 1165 of the nominal Value of Rs 500/ each, market value where of Rs 930/ each, Rs 1860/—

Sd. Nara nath Mookerjee
Sd. Umerto Lall Gangnly
Sd. Surendra nath Tagore
Sd. Pronoy Lall Gangulie

WITNESSES

Sd, Rabindra nath Tagore
Sd. Satyapresad Ganguli

**M. M. Chatterjee,**
*Attorney at law.*

## নানা কথা।

**আর্য্য-পৌণ্ড্রক।**—ভাদ্র সংখ্যার "প্রবাসীতে" শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ মণ্ডল আর্য্য-পৌণ্ড্রক জাতির আলোচনা করিয়াছেন। তিনি মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ের ১৪শ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিতে চান যে, পৌণ্ড্রক জাতি ও অন্যান্য কয়েকটি জাতি উপনয়নাদি সংস্কার-বিহীন হইয়া ব্রাহ্মণ দর্শনাভাবে শূদ্রভাবাপন্ন হইয়াছে। কুল্লুক ভট্ট বলেন যে পৌণ্ড্র দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক হোয়েনসাং পৌণ্ড্রদেশের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া গিয়াছেন। মালদহের অন্তর্গত পাণ্ডুয়া প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। কুলতন্ত্র নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়, যে এই পৌণ্ড্রকগণ রাঢ় দেশ হইতে বঙ্গে, তথা হইতে দক্ষিণ রাঢ়ে ও তৎপর ওড্র (উড়িষ্যা) দেশে গমন করেন। ২৪ পরগণার পোদেরা আপনাদিগকে পদ্যরাজ বা পদ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পোদেরা আপনাদিগকে পৌণ্ড্র বলিয়া অদ্যাপি বলিয়া থাকে। ভাষাতত্ত্বানুসারে পৌণ্ড্রক শব্দ অপভ্রংশ হইয়া পদ্যরাজ, পদ্দ, পদ্য ও পোদ আকারে পরিণত হওয়া সম্ভব। নানাকারণে পৌণ্ড্রক ও পোদ এক জাতীয় বলিয়া অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে।

**গুণত্রয়।**—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ "ভারতীর" ভাদ্র সংখ্যায় আর্য্য-আদর্শ ও গুণত্রয় শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দিয়াছেন। তিনি বলেন আর্য্য শিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিক-ভাব। যাহা সাত্ত্বিক তাহা বিশুদ্ধ।

মনের মালিন্য দুই প্রকার। ১ম জড়তা—ইহা তমোগুণ-প্রসূত ; ২য় উত্তেজনা বা কুপ্রবৃত্তি জনিত মালিন্য—ইহাও তমোগুণ প্রসূত। তমোমালিন্য দূর করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেক দ্বারা তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ, প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনা-শূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত। কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নহে। সেই জন্য বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কর্ম্ম বীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক ; তাহাতে যদি পাপ আসিয়া পড়ে, তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল'। সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন, অথচ সত্ত্ব-গুণের দোহাই দিয়া মহা-সাত্বিক সাজিয়া বড়াই করি। যদি সাত্বিক ভাব জাগ্রত হইয়া রজঃ-শক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমোগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয় নাই। উদ্দামশক্তি শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্বোদ্রেকের উপরে ধর্ম্ম-ভাব। স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ—ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এই মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে সত্ব রজঃ উভয়ে মিলিয়া তমোনাশ করে, একা সত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। রাজা রাম-মোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক সত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। রাজসিক ভাব প্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণ কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। ভগবৎসেবা সত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু ভাগবৎ সান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্বিক নিশ্চেষ্টতা আসিতে পারে। সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানব জাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না। তাহাতে রজঃ-শক্তিকে সত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে। প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। আমরাও বলি ধর্ম্ম-জীবনের সঙ্গে কর্ম্মযোগ না থাকিলে ধর্ম্ম সর্ব্বাবয়ব পূর্ণ হয় না। "তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" ইহাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রদর্শিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মুলমন্ত্র। আমরা সাত্বিক নিশ্চেষ্টতা চাই না, কর্ম্মঠ ধর্ম্মজীবন চাই।

**হাস্য।**—Frankfort ফ্রাঙ্ক-ফোর্টের জনৈক ডাক্তার স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগে "হাস্য-পরিহাস" ঔষধ স্বরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি বলেন এরূপ রোগী প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অনেকক্ষণ ধরিয়া হাস্য করিলে এ রোগ প্রশমন হয়। হাসিতে আরম্ভ করিয়া যে পর্য্যন্ত না চক্ষু হইতে জল বাহির হয়, ততক্ষণ হাসিতে হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এত হাস্যের কারণ উপস্থিত হইবে, তাহাই সমস্যার কথা। আমরা জানি অনেকে বিলক্ষণ হাসাইতে পারেন। তাঁহাদের সাহায্য লওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর কি? Christian Life 7th august.

**বুদ্ধদেবের অস্থি।**—আমরা গতভাদ্রের পত্রিকায় লিখিয়াছি যে পেশোয়ারের নিকট একটি ভগ্ন স্তূপের অভ্যন্তর হইতে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ ভস্মের পরিণাম কি হইবে, ইংরাজ গবর্ণ-মেণ্ট এখন তাহার কোন শেষ মীমাংসা করেন নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে তাঁহার সহকারী-সম্পাদক ঐ ভস্ম যাহাতে ভারতেই থাকে, তাহার জন্য বৌদ্ধ পত্রিকা জগৎজ্যোতি-সম্পাদককেও আবেদন করিতে বলিতেছেন।

The Association for the advancement of Scientific and Industrial Education of India সভা হইতে বিদেশে জ্ঞান উপার্জ্জনের জন্য সে দিন এক-শত যুবা প্রেরিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য বিগত ১২ই এপ্রেল তারিখে কালকাতা টাউনহলে এক সভার অধিবেশন হয়। রায় নরেন্দ্রনাথসেন বাহা-দুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। লর্ড বিশপ কপল-ষ্টন সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদেশযাত্রী যুবক-গণকে সম্বোধন করিয়া আপনার অন্তরের আনন্দ জ্ঞাপন করিয়া বলেন "ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ধর্ম্মের অভিমুখীন ; তাহারা পার্থিব বিষয়ের উপরিতন স্তরে অবস্থিত। শিল্প-বাণিজ্য বিস্তারে দেশ সমুন্নত হইবে এই লক্ষ্য ধরিয়া তোমরা বিদেশ যাইতেছ, নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে। আমি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের স্বরচিত হৃদয়গ্রাহী অতি সুন্দর জীবনী পড়িয়াছি। তিনি তাঁহার সময়ের অতীত পুরুষ ছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। মনুষ্য জীবনে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু সুন্দর, তাহার প্রতি তিনি অনুরাগী ছিলেন। যদিও এই সভা শিল্প-বাণিজ্য শিক্ষার উৎসাহ দিতেছেন, ঐ যে সাধু মহাপুরুষের মহান্ আদর্শ এদেশে রহিয়াছে, যাহাতে যুবকেরা কতক পরিমাণে সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারেন, তৎসম্বন্ধে এই সভা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করিবেন।"

**উৎকট-সাধন।**—তিব্বতের গিয়াংসি হইতে কয়েকমাইল দূরে পর্ব্বত-গাত্রে কয়েকটি গুহা আছে। তাহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ঠিক শ্রেণীবদ্ধ নহে। ঐ গুলি প্রস্তর দ্বারা বিনির্ম্মিত। প্রবেশদ্বার বাহির হইতে অর্গলবদ্ধ। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃত্রিম গুহার গাত্রে দীর্ঘ ও প্রস্থে ৬ ইঞ্চ পরিমিত একটি মাত্র গবাক্ষ আছে। গুহার অভ্যন্তরে এক একটি যোগী স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বাস করেন। গবাক্ষ দিয়া তাঁহার ভক্ষ্য প্রেরিত হয়। যোগী হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিতে পারেন এইমাত্র। ঐ গবাক্ষের এক পার্শ্ব ঢালু করিয়া তাহার মধ্য দিয়া জল দিবার ও রাখিবার ব্যবস্থা আছে। গহ্বরদ্বার বন্ধ হইলে সেই বিজন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে যোগীকে থাকিতে হয়। দিবা রাত্রের বোধ থাকে না। বাহিরের সঙ্গে যোগ কেবল ঐ গবাক্ষের মধ্য দিয়া আহার পান গ্রহণের সময়। ঐ গবাক্ষের ভিতর দিয়া বাহিরের আলোক পর্য্যন্ত দেখিতেও যোগীর পক্ষে নিষেধ। প্রথম অবস্থায় যোগী ব্রত ধারণ করিয়া ঈপ্সিত কয়েক মাস ঐ গহ্বরের মধ্যে অবস্থান করিয়া পরে বাহিরে আসিতে পারেন। কিন্তু সাধনমার্গে অগ্রসর হইলে জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্তও সেই সমাধি-গহ্বরের মধ্যে অবস্থান

করিবার নিয়ম আছে। এইরূপ একটি গহ্বরের নিকট গিয়া শুনিলাম, যে একটি যোগী উহার ভিতরে বিগত ২১ বৎসর ধরিয়া রহিয়াছেন। এই ব্যাপক কালের মধ্যে তিনি কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই, আলোক দেখেন নাই, বা একবারও বাহিরে আসেন নাই। বাহির হইতে ইঙ্গিত করিবার অব্যবহিত পরে একখানি শীর্ণ হস্ত গবাক্ষ বিবর দিয়া সামান্য বাহির হইল, পরক্ষণেই অন্তর্হিত হইল। দেখিলাম সেই শীর্ণ হস্ত খানি কাঁপিতেছে। একটি দীর্ঘ-নিশ্বাসের অস্ফুট শব্দ কর্ণে পৌছিল। বুঝিলাম না যে কিপ্রকারে মনুষ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ দারুণ কৃচ্ছ্র সহ্য করিতে পারে। আরও চারি পাঁচটি গুহা দেখিলাম। সেই একই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। শেষের দিকের একটি গুহার নিকট গিয়া শুনিলাম যে ৬০ বৎসর বয়স্ক একটি বৃদ্ধ বিগত ২২ বৎসর ধরিয়া তাহার ভিতর অবস্থান করিতেছিল, পূর্ব্ব দিবস তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। বিগত কয়েক দিন ধরিয়া সে আহার পান গ্রহণ করে নাই। ইঙ্গিতের কোন প্রতিশব্দ প্রদান করে নাই। সেই দিন প্রভাতে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রহরী দেখিয়াছে যে যোগীর দেহে প্রাণ নাই। তাহার শবদেহ দেখিতে চাহিলাম, কিন্তু শুনিলাম অপরের তাহা দেখিবার অধিকার নাই। দ্বারদেশে দেহান্ত সূচক পতাকা উড়িতেছে, মৃতের আত্মার কল্যাণের জন্য দীপাবলী জ্বলিতেছে। দ্বাদশ হইতে অষ্টাদশ বৎসরের কয়েকটি যুবাকে দেখিলাম, তাহারা গুহার ভিতরে শিক্ষা-নবিশের ন্যায় কয়েক দিন থাকিয়া বাহিরে আসিয়াছে। কিন্তু ভবিষ্যতে সমস্ত জীবন তাহার অভ্যন্তরে ক্ষেপণ করিবার আশা রাখে

ঐ যোগীরা গহ্বরের ভিতরে প্রবেশ সময়ে মনুষ্যের অস্থি হইতে বিনির্ম্মিত জপমালা, মনুষ্যের উরুর অস্থি নির্ম্মিত ভেরী, ভোজ্য পেয় রাখিবার জন্য নর কপাল লইয়া যায়; ভিতরে বসিয়া অর্থহীন সংস্কৃত মন্ত্র জপ করিতে থাকে, এবং হস্ত পদ অঙ্গুলি নানা ভাবে সংন্যস্ত করিতে অর্থাৎ বিবিধ আসন ও মুদ্রা করিতে শিক্ষা করে। ভূত পিশাচ সিদ্ধিও তাহাদের অন্যতম লক্ষ্য। হায় জ্ঞানের অভাব ও কুসংস্কারের প্রভাব মনুষ্যকে যে কতদূর বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে, ইহাই তাহার জাজ্জ্বল্যতর প্রমাণ।

Waddell's Lhassa.

অবশ্য মধ্যে মধ্যে নির্জ্জন সাধনার উপকারিতা সকলেই মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। বুদ্ধদেবও এই ভাবে আলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া জ্ঞানের আলোচনা বিনা এইরূপ দেহসাধ্য কৃচ্ছ্র সাধনে কি হইবে।

মৃত্যু।—আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ মিত্র ইহ জগতে আর নাই। ইঁহার জীবন নিষ্কলঙ্ক ছিল। নিজের অধ্যবসায় বলে কর্ম্মক্ষেত্রে নাম যশ উপার্জ্জন করিয়া এবং আত্মনির্ভর ও বিনয় নম্রতার দ্বারা এই সুখদুঃখময় সংসারে তিনি শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্ম্মই তাঁহার জীবনের সকল সময়ের বন্ধু ছিল। সেই ধর্ম্মই তাঁহাকে এই সংসারের পরপারে অমৃতধামে লইয়া গিয়াছে। তাঁহার পুত্রকন্যাগণের মুখশ্রীতেও তাঁহারই জীবনের আদর্শ দেখিতে পাই। তাঁহার শোকাতুরা বৃদ্ধা জননীকে আমরা আর কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব। তিনি ধন্যা, যে এমন সুপুত্র তিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। যোগীন্দ্রনাথ অধ্যয়নশীল, গ্রন্থকর্ত্তা এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ও প্রচারক ছিলেন। তাহার শ্রাদ্ধদিনের দান ২০৲ মুদ্রা আমরা প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

দান —শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী মহাশয় সমাজের উন্নতি কল্পে ৮৲ টাকা এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত মহাশয় নববর্ষ উপলক্ষে ৩৲ টাকা দান করিয়াছেন।

---

## ১৮৩১ শকের বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্যপ্রাপ্ত স্বীকার।

| | | |
|---|---|---|
| শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় | কলিকাতা | ২৲ |
| „ „ গৌরীশঙ্কর রায় | কটক | ৩৶০ |
| „ ডি, এন্, চাটার্জ্জি | কলিকাতা | ৩৲ |
| „ বাবু সুশীলকুমার ঘোষ | বর্ম্মা | ৫৲ |
| „ „ ললিতমোহন সিংহ | চুঁচুড়া | ২৩৷৶০ |
| „ মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর | কাশিমবাজার | ১২৷৵০ |
| „ বাবু মদনমোহন ব্রহ্মচারী | উত্তরকাশী | ৫৷৶০ |
| „ „ যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় | কলিকাতা | ১৷০ |
| „ „ অন্নদাচরণ চট্টোপাধ্যায় | উত্তরপাড়া | ১৸৵০ |
| „ „ গোকুলচন্দ্র ধর | বাঁশবেড়ে | ।০ |
| „ „ সীতানাথ বক্সী | আরানিনা | ৩।৴০ |
| „ „ অবিনাশচন্দ্র পাল | আলিপুর | ১৷০ |
| „ আর, টি, ভট্টাচার্য্য | কলিকাতা | ১৷০ |
| „ বাবু নিরঞ্জন রায় চৌধুরী | বড়িশা | ১৲ |
| „ „ সুরেন্দ্রনাথ বসাক | কলিকাতা | ১৷০ |
| „ „ হরিমোহন রায় | দিগবাজার | ৬৷৵০ |
| „ „ বিপিনবিহারী দে | কলিকাতা | ১৲ |
| „ „ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী | ঐ | ২৲ |
| „ „ পূর্ণচন্দ্র দত্ত | ঐ | ১৷৶০ |
| „ কুমার হৃষিকেশ লাহা বাহাদুর | ঐ | ৩৲ |
| „ বাবু বিহারিলাল মল্লিক | ঐ | ৩৲ |
| „ „ কানাইলাল শেঠ | ঐ | ৪।০ |
| „ „ সতীশচন্দ্র সিংহ | ঐ | ২৲ |
| „ এস, কে, লাহিড়ী | ঐ | ৩৲ |
| „ বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর | ঐ | ৬৲ |
| „ „ প্রসাদদাস বড়াল | ঐ | ৩৲ |
| „ „ দেবেন্দ্রনাথ রায় | ঐ | ১৷০ |
| „ „ বিহারিলাল রায় | বরিশাল | ২৷০ |

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, বৈশাখ মাস।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ৩৯০৸৬
পূর্ব্বকার স্থিত ... ৩৫৬৯৶৯

সমষ্টি ... ৩৯৫৯৸৶৩
ব্যয় ... ৪১৫৶৩

স্থিত ... ৩৫৪৪৸০

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৪৪৸০

৩৫৪৪৸০

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২২৯৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

নববর্ষের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটী হইতে প্রাপ্ত
৮৲

শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী
১০৲

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী
২৲

শ্রীমতী সুকেশী দেবী
১৲

শ্রীমতী চারুবালা দেবী
১৲

শ্রীমতী ইরাবতী দেবী
১৲

২৩৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫৲

শ্রীমতী সুকেশী দেবী
১৲

৬৲

২২৯৲

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৫২।০
পুস্তকালয় ... ৭॥৶০
যন্ত্রালয় ... ৬৯৶৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন ৩২৸০

সমষ্টি ... ৩৯০৸৬

ব্যয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ২১৬॥৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ... ৩৯৸৶৬
পুস্তকালয় ... ১৩৵৯
যন্ত্রালয় ... ১৩৪।৬
ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন ১০॥৯

সমষ্টি ... ৪১৫৶৩

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

---

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, জ্যৈষ্ঠ মাস।

### আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ... ৪৬৫৶০
পূর্ব্বকার স্থিত ... ৩৫৪৪৸০

সমষ্টি ... ৪০০৯৸৶০
ব্যয় ... ৩২১।৶৩

স্থিত ... ৩৬৮৮।৶৯

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
১০৮৮।৶৯

৩৬৮৮।৶৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২১৭৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়
২০০৲

নববর্ষের দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী | ২৲ |
| শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী | ১৲ |

আনুষ্ঠানিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত সুন্দরীমোহন দাস | ১০৲ |
| | ২১৭৲ |

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ১২৸৹ |
| পুস্তকালয় | ... | ৫৶৹ |
| যন্ত্রালয় | ... | ২৩৩৶৹ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৷৹ |
| সমষ্টি | ... | ৪৬৫৶৹ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ১৬৬৸৶৬ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ২৮৻৬ |
| পুস্তকালয় | ... | ১২৶৬ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১১০৴৬ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৪৶৩ |
| সমষ্টি | | ৩২১৶৩ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

---

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, আষাঢ় মাস।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ৩৬৫৴৹ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩৬৮৮৷৶৯ |
| সমষ্টি | ... | ৪০৫৩৷৷ ৯ |
| ব্যয় | ... | ৩৮৬৸৶৹ |
| স্থিত | | ৩৬৬৬৷৷৴৯ |

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲
সমাজের ক্যাশে মজুত
১০৬৬৷৷৴৯

৩৬৬৬৷৷৴৯

আয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ... | ২১০৲ |

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
১০৲

২১০৲

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৮৸৶৹ |
| পুস্তকালয় | ... | ১১৴৹ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৬৯৶৹ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৪১৲ |
| ইলেকট্রিক্ লাইট | ... | ২৫৲ |
| সমষ্টি | ... | ৩৬৫৴৹ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ২২৩৶৹ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ২৮৷৴৯ |
| পুস্তকালয় | ... | ৬৶৬ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১২২৷৹ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৫৷৷ ৯ |
| ইলেকট্রিক্ লাইট | ... | ১৷৷৹ |
| সমষ্টি | ... | ৩৮৬৸৶৹ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

---

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"

## ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব।

এই ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনতম যুগ হইতে ধর্ম্মের আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। সমুদ্র যেমন নিস্তরঙ্গ নহে, তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত অবিরাম চলিতেছে, এদেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক ঐরূপ। বেদের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে আমরা কি দেখিতে পাই; আর্য্য-ঋষিগণ অনন্তদেবের সন্ধানে ঘুরিতেছেন; তাঁহারা বায়ু বরুণ বজ্রবিদ্যুতের স্তব করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি কেবল মাত্র প্রকৃতির বৈচিত্রের মধ্যে প্রভূত শক্তিমান পদার্থ-নিচয়ের মধ্যে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সকল শক্তির মূল কারণের দিকে তাঁহারা তাকাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদের এই কালব্যাপী সফল চেষ্টায় পরে এদেশে উপনিষদের উন্মেষ হইল। উপনিষদকার ঋষিগণ সেই এক ঈশ্বরের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে আপনাদের সাধনা প্রভাবে লাভ করিয়া, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণে পারদর্শী হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং নেমা বিদ্যুতোভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ" সূর্য্য আমাদের দেবতা নহেন, চন্দ্র তারা আমাদের উপাস্য নহেন, অগ্নি-বিদ্যুৎ আমাদের আরাধ্য নহেন; কিন্তু যে মহাশক্তি সূর্য্য-চন্দ্র-তারার পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদিগকে কক্ষপথে নিয়োজিত করিতেছে, বিদ্যুতে অগ্নিতে তেজ বিবরণ করিতেছে, তিনিই আমাদের পরমারাধ্য পরম দেবতা। প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এই যে সন্ধানলাভ, তাহা স্মরণে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য আমরা প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনার প্রথম মন্ত্রে উচ্চারণ করি, "যো দেবোগ্নৌ, যোহপ্সু যো বিশ্বংভুবনমাবিবেশ যওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ" যিনি অগ্নিতে রহিয়াছেন অথচ যিনি অগ্নি নন, যিনি জলে রহিয়াছেন অথচ জল নন, যিনি ওষধি বনস্পতিতে বিশ্বভুবনে রহিয়াছেন অথচ ইহাদের কিছুই নন, তিনিই আমাদের উপাস্য দেবতা। আমরা আপাতদৃষ্টিতে এই মন্ত্রের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু এই মহাসত্যে পৌঁছিতে ঋষিদিগের যে কত যুগব্যাপী সাধনা ও তপস্যা লাগিয়াছিল তাহা আমরা কল্পনাতেও আনিতে পারি না। বাস্তবিকপক্ষে

শক্তিকে ছাড়িয়া দিয়া শক্তিমানের উপাসনা —এই যে সোপান হইতে সোপানান্তরে গমন, এতই কঠিন ও অভিনিবেশ-সাপেক্ষ, যে এই জ্ঞানোজ্জ্বল বর্ত্তমান শতাব্দিতে আমাদের দেশে অনেকেই ঠিকভাবে তাহা ধরিয়া উঠিতে পারেন না। কেহ বা গঙ্গাকে দেখিয়া প্রণিপাত করেন, কেহ ওষধি বা বৃক্ষবিশেষকে নমস্কার করেন, কেহ বা সূর্য্য কেহ বা অগ্নির পূজা করেন, এই রূপ বিবিধ শক্তির আরাধনা করেন। কিন্তু এ সকলই যে তাঁহারই শক্তির বিকাশ, তাঁহার অভাবে যে ইহার কিছুই থাকিতে পারে না, এ সকলের পশ্চাতে যে তাঁহারই হস্ত তাঁহারই শক্তি কার্য্য করিতেছে, কয়জন তাহা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই শক্তিমানকে স্মরণ করেন। "তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এ সকলেরই আবির্ভাব ও দীপ্তি যে তাঁহা হইতে, কয়জনের দৃষ্টি ও চিন্তা সে দিকে ধাবিত হয় এবং কয়জনের মস্তক সেই শক্তিমানের উদ্দেশে অবনত হয়। এক ভাবে বলিতে গেলে বেদের ভাব 'প্রভৃতির ভিতরে ঈশ্বর সন্দর্শন'; কিন্তু উপনিষদের ভাব আরও গভীর ও সমুন্নত, সে কি না 'আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন'। প্রকৃতি তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ বটে, কিন্তু আমাদের আত্মাই তাঁহাকে দেখিবার সুবিমল দর্পণ। আত্মার ভিতরে যদি পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ছবি সন্দর্শন করিতে পারিলে, তবে ত তোমার সাধনার চরম উৎকর্ষ সাধিত হইল।

মানবাত্মা তাঁহারই আদর্শে গঠিত। কিন্তু এই আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন, তাঁহার সত্তাতে তাঁহার ভাবে অবগাহন, ইহা হইতে বেদান্ত উত্তরকালে আমাদিগকে অন্য পথে লইয়া চলিল। বেদান্ত বলিলেন 'তাঁহার সঙ্গে আপনার অভেদ' চিন্তা কর। যদি এই সাধনাতে সিদ্ধিলাভ করিতে পার তাহা হইলে মুক্তিও তোমার করতলন্যস্ত। আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে সন্দর্শন—উপনিষদের এই সরস ভাব হইতে লোকে যতই জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অভেদ চিন্তার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই সাধন নীরস হইতে আরম্ভ করিল, উপাস্য উপাসক ভাব তিরোহিত হইবার উপক্রম হইল, সংসার-বৈরাগ্য ও সর্ব্ববিধ কঠোরতা আসিয়া ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। সর্পে যেমন রজ্জুভ্রম হয়, সেইরূপ মরীচিকা ও ভ্রান্তি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, বেদান্তের এই শিক্ষা লোক সমাজে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে শিক্ষা আত্মার প্রকৃতির বিরোধী, তাহা ব্যাপক কাল ধরিয়া মনুষ্যকে ধরিয়া রাখিতে পারে না।

এ দিকে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড জীবহিংসা অনুন্নত মানবগণকে পূর্ব্ব হইতেই ঘেরিয়া লইয়াছিল। উপনিষদের ভাব বেদান্তের ভাব একমাত্র জ্ঞানোন্নত লোকের ধর্ম্ম ছিল। কিন্তু লোকে যতই কেন বিপথগামী হউক না, জনসমাজ যতই কেন প্রকৃত ধর্ম্মপথ কল্যাণমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হউক না, যখনই তাহা সত্য সত্যই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা স্পর্শ করে, তখনই প্রতিঘাতের সময় উপস্থিত হয়। ঠিক এই সন্ধিক্ষণে বুদ্ধদেবের জন্ম। তিনি "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" বলিয়া ঘোষণা করিলেন, ধর্ম্মের নামে অকারণ জীবহত্যার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি আরও বলিলেন কর্ম্ম মাত্রেই পুনর্জ্জন্ম লাভের হেতু। এই বিবিধকষ্টক্লেশসঙ্কুল পুনর্জ্জন্ম যাহাতে না হয়, তাহার জন্য বাসনা-ত্যাগের উপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন যদি বাসনা উন্মূলন করিতে পার, তাহা হইলে নির্ব্বাণ লাভে সমর্থ হইবে।

এই ভাবে দিন কাটিয়া যায় গীতার শিক্ষা লোকের মনে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল। গীতা সমন্বয় গ্রন্থ, গীতাকার কাহাকেও উপেক্ষা না করিয়া বলিলেন আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে ত দেখিতেই হইবে, তাহার সঙ্গে সর্ব্বভূতে তাঁহার অধিষ্ঠান হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে, সমদর্শী হইতে হইবে, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চলিবে না, সংসার অচল হইয়া উঠিবে, ঈশ্বরের লক্ষ্য ব্যর্থ হইবে। ফলকামনা শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য সাধন কর, কর্ত্তব্যের অনুরোধে কর্ত্তব্য পালন কর, ফলের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিবে না। এই ভাবে যদি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পার মুক্তি-লাভে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে।

এইভাবে যুগযুগান্তর চলিতে চলিতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের সূচনা। বিবিধ কাহিনীর ভিতর দিয়া ধর্ম্মের ভাবকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পুরাণের বিপুল চেষ্টা, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত ঘাত-প্রতিঘাত তান্ত্রিক-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। তান্ত্রিক ধর্ম্ম অন্যান্য বিষয়ে মানবাত্মার উপযোগী না হইলেও তাহার অনন্য সাধারণ বিশেষ শিক্ষা এই ঈশ্বরকে মাতৃভাবে সন্দর্শন করা। মাতৃভাবে ঈশ্বরের সাধনা এই যে সমুন্নত শিক্ষা ইহা অন্য দেশের ধর্ম্মের ভিতরে নিতান্তই বিরল। বেদ তাঁহাকে পিতৃভাবে সেবা করিবার শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। পিতা নোঽসি” তুমি আমাদের পিতা, আর মনুষ্য মাত্রেই ভ্রাতা, এ শিক্ষা বেদ আমাদের অন্তরে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। ঈশ্বর যে আমাদের বন্ধু, তিনি যে আমাদের সুখ দুঃখে উদাসীন নন, এ শিক্ষাও বেদ আমাদিগকে প্রদান করিয়াছিল। কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্তে মৈত্রী-ভাব, বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদিগকে এ সত্য শিক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্ম করুণাময়ী মাতা বলিয়া তাঁহাকে সাধন করিতে আমাদিগকে বলিয়াছেন। পিতার স্নেহের ভিতরে যেন একটু কঠোরতা আছে, কিন্তু মাতার করুণার ভিতরে কেবলই ক্ষমা—কেবলই দয়া। আমরা যতই কেন মহাপাপে পাপী হই না, তাঁহার নিকট হইতে পরিচ্যুতির কোন আশঙ্কা নাই। তিনি তাঁহার উদার ক্রোড় প্রসারিত করিয়া আমাদের মত দুর্ব্বল সন্তানকে কেবলই আহ্বান করিতেছেন।

কিন্তু তান্ত্রিক ধর্ম্মের অন্য দিকে যে জীব-হিংসা রহিয়াছে, মূর্ত্তিপূজার যে ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহা আর স্থায়ী হইল না। গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া ঘোষণা করিলেন “নামে রুচি ও জীবে দয়া” ইহাই ধর্ম্ম। যাহা উহার প্রতিকূল তাহা ধর্ম্ম নহে। বেদ উপনিষদ ঈশ্বরকে রসস্বরূপ তৃপ্তি-হেতু বলিয়াছেন, কিন্তু গৌরাঙ্গদেব যে ভক্তির বন্যা বঙ্গদেশে প্রবাহিত করিলেন, নাম-কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যাহা ঘোষণা করিলেন, তাহা বাস্তবিকই অশ্রুতপূর্ব্ব ও নিতান্তই মর্ম্মস্পর্শী।

বেদের শিক্ষায় উপনিষদের শিক্ষায় অবতারবাদের মূর্ত্তিপূজার নাম গন্ধ না থাকিলেও পরবর্ত্তী সময়ে অবতারবাদ ও মূর্ত্তিপূজা এদেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিতরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং এই সকল অবতার অল্পে অল্পে ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে পাশ্চাত্য শিক্ষা এ দেশে বদ্ধমূল হইতে আরম্ভ হইল এবং আমাদের বদ্ধ-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইতে আরম্ভ করিল। তাহারই ফলে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি শিক্ষা প্রদান করিতেছেন

আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইবে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন প্রকৃতির ভিতরে ঈশ্বরকে সন্দর্শন করিতে অভ্যাস কর, আত্মার ভিতরে তাঁহাকে নিরীক্ষণ কর, অন্য সকল প্রকার বাসনা পরিহার করিতে পার, কিন্তু তাঁহাকে পাইবার কামনা ও উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইও না, জীব হত্যা করিও না, ধর্ম্মের নামে রক্তপাত করিও না, উপাস্য উপাসকের নিত্য সম্বন্ধ রক্ষা কর, ভয়ে বিপদে সম্পদে দারিদ্রে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ কর, তাঁহার অমোঘ আশ্রয় গ্রহণ কর, ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠান কর, সমদর্শী হও, সকলস্থানে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ কর, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাবৎ জীবে দয়া প্রদর্শন কর, তাঁহার নাম সঙ্কীর্ত্তন কর, ঈশ্বরকে পিতৃ ভাবে—বন্ধুভাবে—মাতৃভাবে পূজা কর, সকল মনুষ্যের সহিত ভ্রাতৃ—সৌহার্দ্দ্য স্থাপন কর, অবতারবাদ মূর্ত্তিপূজা ও মধ্যবর্ত্তীতাবাদ একেবারে পরিত্যাগ কর, তাঁহার আমার মধ্যে অন্য কোন ব্যবধান নাই আমরা তাঁহাকে প্রাণভরে ডাকিলে তিনি আমাদের প্রার্থনা বাক্য গ্রহণ করিবেনই এই জ্বলন্ত বিশ্বাসে তাঁহার কৃপা ভিক্ষা কর; চরিত্রকে নির্ম্মল কর, অন্তরের ভিতরে যে সকল সাধুভাব আছে তাহা বিকশিত কর, ব্রহ্মোপাসক গৃহস্থ হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, গৃহীর কার্য্য সাধন কর, হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার স্বরূপকে খর্ব্ব করিও না, তিনি অপ্রতিম—তিনি নির্ব্বিকার—নিরাকার তিনি পরম গুরু এই ভাবে সাধনা কর, সত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হও। সংক্ষেপতঃ ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

---

## শ্বাসযন্ত্রের বৈচিত্র্য।

মানুষ এবং উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের বিশেষ পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ইহারা সকলেই ফুস্‌ফুস্ দ্বারা বায়ু হইতে অক্সিজেন-বাষ্প গ্রহণ করিয়া জীবন ধারণ করে। স্পঞ্জের ন্যায় ছিদ্রবহুল এবং স্থিতিস্থাপক পদার্থ দ্বারা এই সকল ফুস্‌ফুস্ (Lungs) গঠিত। ছিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক থাকায়, উহার অনেক অংশই বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া প্রচুর অক্সিজেন্ বাষ্প শোষণ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডবিশিষ্ট নিম্ন-শ্রেণীর প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রের ব্যবস্থাও পূর্ব্বের অনুরূপ। তবে উচ্চ-শ্রেণীর প্রাণীদিগের ফুস্‌ফুসের ন্যায় ইহাদের ফুস্‌ফুসে অধিক ছিদ্র দেখা যায় না। এগুলি যেন কতকটা নিরেট ধরণের। ক্ষুদ্র দেহের পোষণের জন্য যে টুকু অক্সিজেনের আবশ্যক, ঐ সকল নিরেট ফুস্‌ফুস্ তাহা বায়ু হইতে অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারে।

মেরুদণ্ডযুক্ত প্রাণীদিগের শ্বাসযন্ত্রে যে একটা ঐক্য দেখা গেল, অপর প্রাণীদিগের যন্ত্রে সেপ্রকার একতা মোটেই দৃষ্ট হয় না। বহু বিচিত্র এবং অদ্ভুত উপায়ে ইহারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। মাকড়সার ফুস্‌ফুস্ আছে বটে, কিন্তু সেই যন্ত্রটি উহাদের শরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এতই বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে যে, হটাৎ দেখিলে তাহাকে ফুস্‌ফুস্ বলিয়া চিনিয়া লওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণীদিগের ন্যায় ইহাদের দুইটি ফুস্‌ফুসের আবশ্যক হয় না। একটির দ্বারাই উহারা বেশ শ্বাসকার্য্য চালাইয়া লয়। তা ছাড়া সাধারণ ফুস্‌ফুসে যেমন অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়, ইহাদের ফুস্‌ফুসে সেগুলি পর্য্যন্তও

থাকে না। বাঁশের ন্যায় কতকগুলি পাতলা অস্থিময় ফলক উপর্য্যুপরি সজ্জিত থাকিয়া ইহার রচনা করে। শ্বাসগ্রহণ করিলে ঐগুলিই বায়ুতে পূর্ণ হয়, এবং যন্ত্রের উপরে যে রক্তস্রোত সর্ব্বদা প্রবাহিত থাকে, তাহা ঐ বায়ু হইতেই অক্সিজেন শোষণ করে।

ভেক প্রভৃতি উভচর প্রাণিগণের শ্বাসযন্ত্র আরো অদ্ভুত। যখন সলাঙ্গুল ব্যাঙাচির আকারে ইহারা জলচরের ন্যায় জলে বাস আরম্ভ করে, তখন শ্বাসগ্রহণের জন্য মৎস্যের কান্‌কার (Gill ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র উহাদের দেহে সংলগ্ন থাকে। জলে মিশ্রিত অক্সিজেন-বাষ্প সেই কান্‌কার সংস্পর্শে আসিলেই শরীরের রক্ত সেই বাষ্পকে শোষণ করিয়া লইতে আরম্ভ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উভচর প্রাণীগুলি একটু বড় হইলে, তাহারা আর কান্‌কার দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করে না। বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শ্বাসযন্ত্র ক্রমে লোপ পাইয়া ফুস্‌ফুসের উৎপত্তি করিতে থাকে। পূর্ণবয়স্ক উভচরগণ সেই ফুস্‌ফুসের দ্বারা আমাদেরই মত বায়ু হইতে অক্সিজেন্ গ্রহণ করিয়া শ্বাসকার্য্য চালাইতে শিক্ষা করে।

কান্‌কা ও ফুস্‌ফুসের মধ্যে আকারগত অনেক পার্থক্য থাকিলেও, উহাদের কার্য্যে সম্পূর্ণ একতা দেখা যায়। প্রাণীগণ যখন বায়ু দ্বারা ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে, সেই বায়ুর অক্সিজেন্ রক্তে মিশিয়া যায়। জলে অধিক বায়ু মিশ্রিত থাকে না, যাহা একটু থাকে তাহাই দেহস্থ করিয়া জলচর প্রাণিগণকে জীবন রক্ষা করিতে হয়। স্থলচর প্রাণী সকল যেমন আকাশের বায়ু টানিয়া ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করিতে থাকে, উহারাও সেই প্রকার পুনঃ পুনঃ জল টানিয়া লইয়া কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম চালাইতে আরম্ভ করে। জলে যা' একটু আধটু অক্সিজেন মিশ্রিত থাকে, কান্‌কার রক্ত তাহা এই সুযোগে প্রায় নিঃশেষে শোষণ করিয়া দেহস্থ করিয়া ফেলে।

পতঙ্গজাতীয় প্রাণীগুলির জীবনের ইতিহাস যেমন বিচিত্র, তাহাদের শ্বাসযন্ত্রও তেমনি অদ্ভুত। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রের সহিত ফুস্‌ফুস্ বা কান্‌কার একটুও সাদৃশ্য দেখা যায় না। একপ্রকার অতি সূক্ষ্ম নল পতঙ্গ মাত্রেরই দেহের সর্ব্বাংশে জটিলভাবে পরিব্যাপ্ত দেখা যায়। এই নলিকাগুলিই উহাদের শ্বাসযন্ত্র। এগুলি যখন বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে, তখন দেহের প্রায় সর্ব্বাংশ বায়ুস্থ অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসে।

ফাঁপা হইলে জিনিস প্রায়ই ভঙ্গপ্রবণ হয়। ফাঁপা নল একটু চাপ পাইলেই ভাঙিয়া যায়। এই জন্য এ সকল জিনিসকে অতি সতর্কতার সহিত ব্যাবহার করিতে হয়। বাগানের গাছে জল দিবার জন্য যে সকল দীর্ঘ রবারের নল ব্যবহৃত হয়, বাহিরের আঘাতে সে গুলি যাহাতে হটাৎ নষ্ট হইয়া না যায়, তাহার জন্য মোটা তার স্প্রিংএর মত করিয়া তাহাদের চারিদিকে জড়াইয়া রাখা হয়। ধাক্কা লাগিলে এই তারই তাহা সামলাইয়া লয়। পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রে যে সকল নলিকা থাকে, সে গুলিকে রক্ষা করিবার জন্য ঠিক্ এই-প্রকারেই ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তারেরই মত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র নলিকার ভিতর স্প্রিংএর মত জড়ানো থাকে। কাজেই বাহিরের চাপে সহসা নলের কোন ক্ষতি হয় না।

মানুষ এবং অপর উচ্চশ্রেণীর জীবগণ নাসিকার ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু টানিয়া লয়। কান্‌কাযুক্ত জলচর প্রাণীগণ বাহিরের জল

কান্‌কার ভিতর দিয়া চালাইয়া তাহাকেই আবার মুখ দিয়া বাহির করে। পতঙ্গ জাতীয় প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রের সহিত নাসিকা বা মুখ-বিবরের অণুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ইহাদের দেহের পার্শ্বে কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র (Spiracles) থাকে। এই গুলি পতঙ্গের দেহস্থ নলিকাগুলির মুখ। বাহিরের বায়ু অনায়াসে এই সকল ছিদ্র-পথ দিয়া নলে প্রবেশ করিতে পারে। বায়ুমিশ্রিত ধূলিকণা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ যাহাতে হঠাৎ দেহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্যও প্রবেশপথে সুব্যবস্থা আছে। কতকগুলি পতঙ্গদেহের ঐ ছিদ্র পথগুলি এমন সুবিন্যস্ত লোমে আবৃত থাকে যে, কেবল বায়বীয় পদার্থ ব্যতীত অপর কোন পদার্থই নলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণাও ঐসকল সুসজ্জিত লোমে আটকাইয়া যায়।

বৃশ্চিক এবং কেন্দ্রী (কেন্নো) প্রভৃতি শতপদী প্রাণীগণ পতঙ্গ-জাতিভুক্ত নয়; কিন্তু তথাপি ইহাদের শ্বাসযন্ত্রে পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। শত শত ক্ষুদ্র নলিকা ইহাদের দেহাভ্যন্তরে গুচ্ছাকারে পরিব্যাপ্ত থাকে। পার্শ্বস্থ ছিদ্রগুলির সাহায্যে নলে বায়ু প্রবেশ করিলে রক্ত অক্‌সিজেন্-যুক্ত হইতে আরম্ভ করে।

মক্ষিকাজাতীয় কতকগুলি প্রাণী জীবনের প্রথমাংশে যখন সুঁয়ো পোকার আকারে (Larval Condition) থাকে, তখন তাহাদিগকে প্রায়ই জলে বাস করিতে দেখা যায়। কান্‌কাই খাঁটি জলচর প্রাণীদিগের একমাত্র শ্বাসেন্দ্রিয়। সুতরাং মক্ষিকা স্থলচর প্রাণী হইলেও জলচর অবস্থায় উহার কান্‌কা (Gill) থাকাই সঙ্গত মনে হয়। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুসন্ধান করিয়া শিশু মক্ষিকাগুলির দেহে সত্যই কান্‌কা দেখিতে পাইয়াছেন। এই অবস্থায় মক্ষিকাশিশুগুলির দেহের দুই পার্শ্বে অতি পাতলা এবং সূক্ষ্ম আঁশের মত কতক গুলি অংশ ধারাবাহিক সজ্জিত থাকে। সাধারণ মৎস্যের কান্‌কার তন্তুগুলিতে যেমন সর্ব্বদাই রক্ত প্রবহমান দেখা যায়, ঐ আঁশগুলির উপরে ঠিক্ সেই প্রকার রক্তস্রোত অবিরাম চলিতে থাকে। সুতরাং উহাকে কান্‌কারই রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। জলমিশ্রিত অক্‌সিজেন ঐ আঁসের উপরকার রক্তের সংস্পর্শে আসিলেই তাহা দেহস্থ হইয়া পড়ে। মৎস্য প্রভৃতি জলচরগণ যেমন মুখবিবর হইতে অবিরাম জল বহির্গত করিয়া সর্ব্বদাই এক জল-প্রবাহ কান্‌কার উপর দিয়া চালাইতে পারে, মক্ষিকা-শিশুগুলির দেহে সে প্রকার ব্যবস্থা না থাকিলেও, তাহাদের পুচ্ছগুলি কান্‌কার উপর দিয়া জল চালাইবার অনেকটা সহায়তা করে। ইহাদের পুচ্ছে সাধারণতঃ পক্ষীর ডানার মত তিনটি অংশ থাকে। মক্ষিকাশাবকগুলি সর্ব্বদাই এই ডানাগুলিকে আন্দোলিত করিয়া দেহের পার্শ্বস্থ সেই কান্‌কার উপর দিয়া অবিরাম জল প্রবাহ চালাইতে সক্ষম হয়।

মশক প্রভৃতি কতকগুলি প্রাণীও শৈশবে জলচর অবস্থায় থাকে। কোন ক্ষুদ্র পাত্র বা নর্দ্দামা ইত্যাদির জল বহুদিন আবদ্ধ থাকিলে তাহাতে বড় বড় পিনের মত যে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণের চঞ্চল পোকা দেখা যায় সেই গুলিই শিশু মশক। লম্বা দেহটিকে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভঙ্গিতে বক্র করিতে করিতে উহারা সর্ব্বদাই জলের ভিতর বিচরণ করে, এবং এক একবার জলের ঠিক উপরে উঠিয়া শ্বাসযন্ত্রটিকে

বায়ুতে পূর্ণ করিতে থাকে। ইহাদের দেহ পরীক্ষা করিলে কান্‌কার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। পতঙ্গদিগের দেহে যে নলিকাময় শ্বাসযন্ত্র (Spiracles) দেখা যায়, অনুসন্ধানে কেবল তাহারই অস্তিত্ব ধরা পড়ে। কাজেই বলিতে হয়, শৈশবে জলচর হইয়াও মশকগণ জলের অক্‌সিজেন্‌ গ্রহণ করে না; অক্‌সিজেনের জন্য আকাশের বায়ুর উপরই নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। এই কারণে শ্বাসযন্ত্রের নলিকাগুলিকে বায়ুপূর্ণ করিবার জন্য উহারা মাঝে মাঝে জলের উপরে ভাসিয়া উঠে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পতঙ্গজাতীয় প্রাণীর শ্বাসেন্দ্রিয়ে যে সকল নলিকা থাকে, তাহাদের কতকগুলির মুখ দেহের পার্শ্বে আসিয়া শেষ হয় এবং এই সকল ছিদ্রপথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইলে নলগুলি বায়ুপূর্ণ হইয়া পড়ে। শিশু মশকের দেহ পরীক্ষা করিলে, ঐ প্রকার একটি মাত্র বায়ুপ্রবেশ-পথ তাহার পুচ্ছপ্রান্তে দেখা যায়। সুতরাং বলিতে হয়, শিশুকালে মশক কেবল পুচ্ছ দিয়াই শ্বাসকার্য্য চালায়। বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য যখন মশকশিশুগুলি জলের উপরে উঠে, উহাদের পুচ্ছের ঐ কার্য্যটি তখন সুস্পষ্ট দেখা যায়। উহারা কখনই মস্তকগুলিকে জলের উপরে উঠায় না। বায়ুর আবশ্যক হইলে পুচ্ছের অগ্রভাগটিকে জলের উপরে রাখিয়া কিয়ৎকাল স্থিরভাবে ভাসিয়া থাকে, এবং তার পর সেই নলিকাগুলি বায়ুপূর্ণ হইলে, আবার নীচে নামিয়া নানা ভঙ্গিতে বিচরণ সুরু করিয়া দেয়।

জগতের নানা জাতীয় অসংখ্য প্রাণীমণ্ডলীর মধ্যে আমরা কেবলমাত্র কয়েকটির শ্বাসযন্ত্রের একটা মোটামুটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাদেরই গঠনে যে বৈচিত্র্য এবং নিপুণতা দেখা গেল, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া যে এক মহাসঙ্গীত অবিরাম ধ্বনিত হইতেছে, তাহারি সহিত তাল রাখিয়া প্রত্যেক প্রাণীকে বিচরণ করিতে হয়! ইহাই প্রাণীর প্রাণিত্ব। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই প্রাণিত্ব রক্ষার জন্য কাহাকেও একটু মাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। যে জগদীশ্বর সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সুনিপুণ হস্তে অতি ক্ষুদ্র আণুবীক্ষণিক কীটেরও শ্বাসপ্রশ্বাস আহারনিদ্রার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। এই কারণেই জগৎ এত সুন্দর এবং আনন্দময়। জীবনরক্ষা এবং আনন্দের জন্য যাহা সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, প্রত্যেক প্রাণী তাহা নিয়তই অযাচিত ভাবে পাইতেছে। ইহাই বিধাতার আশীর্ব্বাদ।

---

## মশা ও ম্যালেরিয়া।

বসন্ত কলেরার যেমন কীটাণু-বীজ আছে তেমনি ম্যালেরিয়ারও আছে। ইহারাই শরীরের রক্তে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া ঘটায়। এই জীবাণুরা খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে এবং দেখিতে দেখিতে শরীরের সমস্ত রক্তকে দূষিত করিয়া ফেলে।

কিন্তু ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ের কারণ অ্যানোফিলিস্‌ (anopheles) নামক একপ্রকার মশা; ইহারাই ম্যালেরিয়া-দেবীর বাহন। এই সব মশারা ডিম ও শিশু অবস্থায় ঝাঁক বাঁধিয়া জলে থাকে, তার পর বড় হইলে বাহির হয়। ইহারা যখন কোন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর গায়ের রক্ত শোষণ করে, তখন সেই

শোষিত রক্তের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণুও তাহাদের শরীরে প্রবেশ করে। মানুষের শরীরে এই সব জীবাণুরা যেমন বংশবৃদ্ধি করে, মশার শরীরেও তেমনি করে এবং উহাদের মধ্যে যাহারা একটু সবল, তারা মশার মুখের অগ্রভাগে স্থান লাভ করে। অন্যান্য মশাদের ন্যায় অ্যানোফিলিস্‌দের কোনো শব্দ নাই এবং ইহাদের কামড়েও কোনো যন্ত্রণা হয় না। কাজেই ইহাদের উপস্থিতি টের পাওয়া বড় কঠিন।

এই সব ম্যালেরিয়া-জীবাণুপূর্ণ মশা যখন আবার কোন সুস্থ লোককে কামড়ায়, তখন সেই মশার মুখ দিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু তাহার রক্তে প্রবেশ করে এবং বংশবৃদ্ধি দ্বারা দেখিতে দেখিতে তার রক্তকেও দূষিত করিয়া ফেলে। এইরূপে দুই এক সপ্তাহের মধ্যেই সেই ব্যক্তির জ্বর হয়।

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল এবং এখনও অনেকের বিশ্বাস আছে যে ম্যালরিয়াক্রান্ত জল-বায়ুই ম্যালরিয়ার বিষে পরিপূর্ণ—কিন্তু সে কথা নাকি সর্ব্বৈব মিথ্যা। ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানের জল বায়ু মাটি প্রভৃতি সমস্তই পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এক মশা ও মানুষের শরীর ছাড়া আর কোথাও ম্যালরিয়া জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এক লোক হইতে আর এক লোকের শরীরে ম্যালরিয়া চালিত করিবার জন্য দূষিত জল বাতাস প্রভৃতি দ্বারা অনেকরূপ চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু এক অ্যানোফিলিস্ মশার সাহায্য ছাড়া আর কোনো উপায়ই সফল হয় নাই। এমন কি ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীর গা হইতে রক্ত লইয়া সেই রক্ত অস্ত্রের সাহায্যে সুস্থ লোকের গায়ে প্রবেশ করাইয়া দেখা গিয়াছে যে কেবল কয়েকটি মাত্র লোকের সম্বন্ধে এই উপায় সফল হইয়াছে।

পক্ষান্তরে অন্য সমস্ত উপায় বাদ দিয়া একমাত্র মশার কামড়ে ম্যালরিয়া হইতে দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের জল বাতাসে ম্যালেরিয়ার নাম গন্ধও নাই। মশার কামড়ই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ কি না পরীক্ষা করিবার জন্য একবার সেখানকার একদল সম্পূর্ণ সুস্থ যুবক ইটালীর কোন ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থান হইতে মশা আনাইয়া নিজেদের দেহকে কামড়াইতে দেয়। কয়েকদিন পরে দেখা গেল তাহাদের সকলকেই ম্যালেরিয়া ধরিয়াছে।

অতএব ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচিতে হইলে অগ্রে এই মশার জাতকে ধ্বংস করিতে হইবে। বড় মশাত একটা দুটা করিয়া মারা সম্ভব হইবে না—কাজেই শিশু অবস্থায় তারা যখন ঝাঁক বাঁধিয়া জলে থাকে, তখনি তাদের মারার বিশেষ সুযোগ। বাড়ীর আশে পাশে যেখানে যত ছোট ছোট ডোবায় জল জমিয়া শিশু মশকদের বাসস্থান হইয়াছে, সেই সব ড্রেনের জল বাহির করিয়া দিতে হইবে বা মাটি দিয়া বুজাইয়া ফেলিতে হইবে, অথবা সেই জমা জলের উপরে এতটা পরিমাণ কেরোসিন তেল ঢালিয়া দিতে হইবে যাহাতে সেই জলের উপর রীতিমত একটা তেলের সর পড়ে। ইহাতে বাতাসের অভাবে শিশু মশকেরা নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। তাহারপর সেই তেলে আগুণ লাগাইয়া দিলে আর কোনো ভয়ের কারণ থাকিবে না। বড় মশার হাত হইতে এড়াইবার জন্য মশারি ব্যবহার করিতে হইবে। এ সব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি ম্যালেরিয়া ধরে তাহা হইলে কুইনাইন খাইতে হইবে। কুইনাইন শরীরে প্রবেশ করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণুরা আর বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না এবং যাহা থাকে তাও তাড়াতাড়ি

মরিয়া যায়। মিউগিনিয়া; ইটালী প্রভৃতি বিশেষ ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থানে কুইনাইন ব্যবহার করায় ম্যালেরিয়া প্রায় অদৃশ্য হইয়াছে।

ম্যালেরিয়ার রোগীর নিকট হইতে সুস্থ লোককে স্থানান্তরিত করিতে পারিলে ভাল হয়, তাহা না হইলে ম্যালেরিয়াবহ মশার হাত এড়ান কঠিন। এই সব সতর্কতা কিছু ব্যয় ও শ্রমসাধ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান গৃহস্থ তাহার তুলনায় ডাক্তার ও পথ্য খরচ এবং পরিবারের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

---

## বর্ত্তমান যুগ।

( বোলপুর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কথিত )

আমি পূর্ব্বেই একটি কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি—তোমরা যে এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমাদের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। তোমরা জান না এই কাল কত বড় কাল—ইহার অভ্যন্তরে কি প্রচ্ছন্ন আছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পৃথিবীর ইতিহাসে যে এক নূতন পৃষ্ঠার রচনা করিতেছে, এমন পৃষ্ঠা খুব কমই রচিত হইয়াছে। হাজার হাজার শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীতে এমন শতাব্দী খুব অল্পই আসিয়াছে। বিশ্বাস কর, বর্ত্তমান শতাব্দী সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এক মহা যুগান্তর আনিয়া দিবে—চারিদিকে আজ তাহারই সূচনা দেখিতেছি। কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবী জুড়িয়া এক উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছে। বিশ্ব-মানব প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইয়াছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতন জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করিবার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করিবার জন্য মানব মাত্রেই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশকে গড়িয়া তুলিবে। বসন্ত আসিলে বৃক্ষ যেমন করিয়া তাহার দেহ হইতে শুষ্ক পত্র ঝাড়িয়া ফেলে, নব পল্লবে সাজিয়া উঠে, মানব প্রকৃতি কোন্ এক প্রাণপূর্ণ হাওয়ায় ঠিক তেমনি করিয়া সাজিয়া উঠিবার জন্য ব্যাকুল। মানব-প্রকৃতি পূর্ণতার আস্বাদ পাইয়াছে, ইহাকে এখন কোনমতেই বাহিরের শক্তির দ্বারা চাপিয়া ছোট করিয়া রাখা চলিবে না। আসল জিনিসটা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না, অনেক সময়ে এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অস্বীকার করিয়া বসি। বাহিরের জিনিসটাই আমাদের চোখে বড় বলিয়া ঠেকে; এ কথা ভুলিয়া যাই মূল সত্য নিঃশব্দে গোপনে ধীরে ধীরে কার্য্য করিয়া থাকে। আজ আমরা বাহির হইতে দেখিতেছি চারিদিকে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত, যাহাকে আমরা পলিটিক্স ( Politics ) বলি। উহাকে যত বড় করিয়াই দেখি না কেন, উহা নিতান্তই বাহিরের জিনিষ। আমাদের আত্মাকে কিছুতে যদি জাগরিত করিতেছে সত্য হয়, তবে তাহা ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। এই ধর্ম্মের মূল-শক্তিটি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া কাজ করিতেছে বলিয়াই আমাদের চোখে উহা ধরা পড়িতেছে না; পলিটিক্সের চাঞ্চল্যই আমাদের সমস্ত চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা উপরকার তরঙ্গটাকেই দেখিয়া থাকি, ভিতরকার স্রোতটাকে দেখি না। কিন্তু বস্তুতঃ ভগবান যে মানব-সমাজকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়া একটা মস্ত নাড়া দিয়াছেন, ইহাই বিংশ শতাব্দীর বার্ত্তা। বিশ্বাস কর, অনুভব কর, উত্তর

দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া আজ এই ধর্ম্মের বৈদ্যুতশক্তি ছুটিয়া চলিয়াছে—ইহা কল্পনার কথা নয়। পৃথিবীতে আজ যে-কোনো তাপস সাধনায় প্রবৃত্ত আছে, তাহার পক্ষে এমন অনুকূল সময় আর আসিবে না। আজ কি তোমাদের নিশ্চেষ্ট থাকিবার দিন? তন্দ্রা কি ছুটিবে না? আকাশ হইতে যখন বর্ষণ হয়, ছোট বড় যেখানে যত জলাশয় খনন করা আছে, জলে পূর্ণ হইয়া উঠে। পৃথিবীতে আজ যেখানেই কোনো মঙ্গলের আধার পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইয়া আছে, সেখানেই তাহা কল্যাণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। সার্থকতা আজ সহজ হইয়া আসিয়াছে; এমন সুযোগকে ব্যর্থ হইতে দিলে চলিবে না। তোমরা আশ্রমবাসী এই শুভযোগে আশ্রমকে সার্থক করিয়া তোল। প্রস্তরের উপর দিয়া জলস্রোত যেমন করিয়া বহিয়া যায়, সেখানে দাঁড়াইবার কোনই স্থান পায় না, আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া তেমনি করিয়া এই প্রবাহ যেন বহিয়া না যায়! প্রিয়তম আশ্রমকে প্রস্তুত করিয়া রাখ। ঈশ্বরের প্রসাদস্রোত আজ সমস্ত পৃথিবীর উপরদিয়া বিশেষভাবে প্রবাহিত হইবার সময় এখানে আসিয়া একবারটি যেন পাক খাইয়া দাঁড়ায়। সমস্ত আশ্রমটি যেন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে। শুধু আমাদের এই ক্ষুদ্র আশ্রমটি কেন, ছোট বড় পৃথিবীর যেখানে যে কোন সাধনার ক্ষেত্র আছে মঙ্গল-বারিতে আজ পূর্ণ হউক। আশ্রমে বাস করিয়া এই দিনে জীবনকে ব্যর্থ হইতে দিও না। এখানে কি শুধু তুচ্ছ কথায় মাতিয়া হিংসা দ্বেষের মধ্যে থাকিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া দিন কাটাইতে আসিয়াছ? শুধু পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া ফুটবল খেলিয়া এতবড় একটা জীবনকে নিঃশেষ করিয়া দিবে? কখনই না—ইহা হইতেই পারে না। এই যুগের ধর্ম্ম তোমাদের প্রাণকে স্পর্শ করুক। তপস্যার দ্বারা সুন্দর হইয়া তোমরা ফুটিয়া উঠ। আশ্রম-বাস তোমাদের সার্থক হউক। তোমরা যদি মনুষ্যত্বের সাধনাকে প্রাণপণ করিয়া ধরিয়া না রাখ, শুধু খেলা ধুলা পড়া শুনার ভিতর দিয়াই যদি জীবনকে চালাইয়া দাও, তবে যে তোমাদের অপরাধ হইবে, তাহার আর মার্জ্জনা নাই, কারণ তোমরা আশ্রমবাসী।

আবার বলি তোমরা কোন্ কালে এই পৃথিবীতে আসিয়াছ, ভাল করিয়া সেই কালের বিষয় ভাবিয়া দেখ। পৃথিবীর ইতিহাসে এইরূপ যুগ আসে নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমান কালের একটি সুবিধা এই—বিশ্বের মধ্যে যে চাঞ্চল্য উঠিয়াছে একই সময়ে সকল দেশের লোক তাহা অনুভব করিতেছে। পূর্ব্বে একস্থানে তরঙ্গ উঠিলে অন্য স্থানের লোকেরা তাহার কোনই খবর পাইত না। প্রত্যেক দেশটি স্বতন্ত্র ছিল। এক দেশের খবর অন্য দেশে গিয়া পৌঁছিবার উপায় ছিল না। মার্টিন লুথারের সময় সমগ্র য়ুরোপে যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে আমাদের দেশের মধ্য দিয়াও ধর্ম্ম তরঙ্গ ছুটিয়াছিল। কিন্তু আমরা মার্টিন লুথারকে জানিতাম না, য়ুরোপও চৈতন্য দেবকে চিনিত না। দুই দেশকে একত্র দেখিবার কোন সুবিধাই ছিল না। এখন আর সেই দিন নাই। ঘরে বসিয়া দেশ বিদেশের খবর পাই। দেশের কোন স্থানে ঘা লাগিয়া তরঙ্গ উঠিলে সেই তরঙ্গ শুধু দেশের মধ্যে না—সমস্ত পৃথিবীর ভিতর দিয়া তীরের মত ছুটিয়া চলে। আমরা

সকলে এক হইয়া দাঁড়াই। কত দিক হইতে আমরা বল পাই ; সত্যকে আঁকড়াইয়া ধরিবার যে মহা নির্যাতন তাহাকে অনায়াসেই সহ্য করিতে পারি ; নানাদিক হইতে দৃষ্টান্ত ও সমবেদনা আসিয়া জোর দেয়—একি কম কথা। নিজেকে অসহায় বলিয়া মনে করি না। এই তো মহা সুযোগ। এমন দিনে আশ্রম বাসের সুযোগকে হারাইও না। জীবন যদি তোমাদের ব্যর্থ হয়, আশ্রমের কিছুই আসে যায় না—ক্ষতি তোমাদেরই। আমি বিশ্বাস করি একদিন না একদিন আমাদের এই আশ্রম সার্থক হইয়া উঠিবেই। কোন না কোন মহাপুরুষ কঠিন সাধনার দ্বারা এই আশ্রমকে জগতের মধ্যে ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবেন, এমন দিন আসিবেই ; তবে দুঃখ এই আমরা কিছুই করিলাম না। গাছ ভরিয়া বউল আসে। সকল বউলেই যে ফল হয় এমন নয়। কত ঝরিয়া পড়ে, শুকাইয়া যায়, তবু ফলের অভাব হয় না। ডাল ভরিয়া ফল ফলিয়া উঠে। ফল হইল না বলিয়া গাছ দুঃখ করে না, দুঃখ ঝরা-বউলের, তাহারা যে ফলে পরিণত হইয়া উঠিতে পারিল না।

এই আশ্রম যখন প্রস্তুত হইতেছিল, বৃক্ষগুলি যখন ধীরে ধীরে আলোক দিকে মাথা তুলিয়া ধরিতেছিল, তখনও এই নূতন যুগের কোনই সংবাদ আসিয়া পৃথিবীতে পৌঁছায় নাই। অজ্ঞাতসারেই আশ্রমের ঋষি এই যুগের জন্য আশ্রমের রচনা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; তখনও বিশ্ব-মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, শঙ্খ ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। বিংশ শতাব্দীর জন্য বিশ্ব-দেবতা গোপনে গোপনে কি যে এক বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, তাহার লেশমাত্রও আমরা জানিতাম না। আজ সহসা মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—আমাদের কি পরম সৌভাগ্য। আজ বিশ্ব-দেবতাকে দর্শন করিতেই হইবে, অন্ধ হইয়া ফিরিয়া গেলে কিছুতেই চলিবে না। আজ প্রকাণ্ড উৎসব ; এই উৎসব একদিনের নয়, দুই দিনের নয়—শতাব্দী-ব্যাপি-উৎসব। এই উৎসব কোন বিশেষ স্থানের নয় কোন বিশেষ জাতির নয়—এই উৎসব সমগ্র মানব-জাতির জগত-জোড়া উৎসব। এস আমরা সকলে একত্র হই, বাহির হইয়া পড়ি। দেশে কোন রাজার যখন আগমন হয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য যখন পথে বাহির হইয়া আসি তখন মলিন জীর্ণ বস্ত্রকে ত্যাগ করিতে হয়, তখন নবীন বস্ত্রে দেহকে সজ্জিত করি। আজ দেশের রাজা নন সমগ্র জগতের রাজা আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, নত কর উদ্ধত মস্তক। দূর কর সমস্ত বর্ষের সঞ্চিত আবর্জ্জনা। মনকে শুভ্র করিয়া তোল। শান্ত হও পবিত্র হও। তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে ফের। তিনি তোমাদের শিরে আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিন—মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন, মঙ্গল করুন।

---

## সুন্দরদাস।

সুখ-সমাধি।

খুলেছ জ্ঞানের দ্বার হে গুরু-গোবিন্দ।
ভক্তি ভরে বন্দি তব চরণারবিন্দ।
গোপী গেল যদি, গেল ভকতি চলিয়া,
যাহা ছিল পুরাতন সকলি লইয়া।
তক্র ত্যজি লহ ভাই নিঙাড়িয়া তত্ত্ব
ভোজনে পাইবে সুখ, স্বাদে অমৃতত্ব।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার,
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

হরিনামামৃত-কণা করিয়া সংগ্রহ
ছেদিয়াছি আন কর্ম্ম, আচার, আগ্রহ।
আত্মতত্ত্ব সুবিচার করি অনুক্ষণ
অনায়াসে কর্ম্মপাশ করেছি ছেদন।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
আর কিছু কর্ম্ম মোর নাহি লাগে মনে
সহস্র বিতণ্ডা বাণী বরিষাও কাণে।
কেবা করে জপ, তপ, তীর্থ, দান, ব্রত,
উপাস নিয়ম যম যজ্ঞ হোম যত।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
ইড়া কি পিঙ্গলা নাড়ী অন্য সুখমন (১)
ইহাতে কে যোগাভ্যাস করিবে এখন ?
কিছু দিন করে লোক আসন অভ্যাস
কিছু দিন যাপে রোধি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস
কিছু দিন কাটে লোক রাত্রি জাগরণে
উদাসী হইয়া ফিরে দেশ পর্য্যটনে।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
ভিন্ন ভিন্ন মুনির বিভিন্ন মত হেরি
মোক্ষ ছাড়ি মনের দুয়ারে করে ফেরি,
বর্ণাশ্রমে ফিরে ফিরে সন্ন্যাসভিতর
ধর্ম্ম অর্থ লভি কাম প্রহৃষ্ট অন্তর।
কেন মিছে বকবাদ কাহারো সহিত,
মিথ্যা সব বচন, তাহাতে নাই হিত।
কেহ বা প্রশংসা করে স্তুতি বহু বিধি
কেহ নিন্দে নিদারুণ বাক্য-বাণ বিঁধি।
বুঝিলেই হয় সব সঙশয় নাশ,
সমান করিয়া জানি গৃহ বনবাস।
কিছুতেই নহি বদ্ধ, মোহ, ভালবাসা,
নির্পক্ষ হইয়া হেরি বিশ্বের তামাসা।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

শরীরের চিন্তা করি কেন ? ভাবি তাই,
প্রারব্ধে যা আছে ঠিক আসিবে তাহাই।
স্বরগের নরকের সঙশয় হেন,
গমন ও আগমন যম ভয় কেন ?
শুন তত্ত্ব গুরু মুখে করহ মনন,
নিদিধ্যাসে কর পরে সময় ক্ষেপন।
কি আর বলিব অন্যে, কিবা আছে ফল,
খুলিয়া গিয়াছে মোর হৃদয়-কমল,
সহজে গিয়াছে মিটে ঘন অন্ধকার।
আলোকে উজ্জ্বল বাহ্য-অন্ত একাকার।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
দেহ আত্মা ভিন্ন, দেহে আত্মার নিবাস,
উভে নাহি মিশে, যথা জড় ও আকাশ।
দেহ নিত্য উপজিয়া নিত্য হয় ক্ষয়,
অজর অমর আত্মা নাহি তার লয়।
যার অনুভব আছে, সেই তাহা জানে,
সে পায় পরমানন্দ হৃদি মন প্রাণে।
কস্তুরী·কর্পূর দন্তে করিলে চর্ব্বণ,
অবশ্য প্রকাশে গন্ধ, কে করে গোপন।
বারিতে তুষার হয় তুষারেতে বারি,
আত্মা পরমাত্মা ভেদ এরূপ বিচারি
যথা নদী প্রবাহিয়া সাগরে মিলায়
ত্যজি দ্বৈত অদ্বৈত স্বভাব জীব পায়।
পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
সুখে নিদ্রা যাবে দাস-সুন্দর তোমার।
পূর্ণব্রহ্ম অখণ্ডিত হন অনাবৃত,
এ বিশ্বাস হইতে সংশয় অপহৃত ;
রজ্জুতে সর্পের ভ্রম সীসকে রজত
মৃগতৃষ্ণিকায় জল, তেমতি জগৎ।
দেখ, শুন, স্পর্শ কর, মুখে বল বাণী,
লহ ঘ্রাণ, অনাসক্ত থাকিবে আপনি।
উপরে উপরে হের জগতের ক্রিয়া
সাবধান! যেন তাহে না যাও মজিয়া।
হে গুরো! ভক্তির সহ এ উজ্জ্বল জ্ঞান
বহুরূপে এ অধমে করিয়াছ দান।

(১) সুষুম্না।

পশি হৃদে, তত্ত্বরস ঢাল অনিবার
হৃখে মিত্র যাবে দাস-সুন্দর তোমার।

---

## সংগ্রহ।

### ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
আচারেষু ব্যবস্থানং শৌচ মিত্যভিধীয়তে॥

অভক্ষ্য দ্রব্য পরিহার, সাধুসঙ্গ, সদাচার, ইহাই শৌচ।

প্রশস্তাচরণং নিত্যং অপ্রশস্তবিবর্জ্জনং।
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভির্ধর্ম্মদর্শিভিঃ॥

প্রশস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান, অপ্রশস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ, ইহাকেই ঋষিগণ মঙ্গল বলেন।

শরীরং পীড্যতে যেন শুভেন হ্যশুভেন বা।
অত্যন্তং তন্ন কুর্ব্বীত অনায়াসঃ স উচ্যতে।

শুভ কার্য্যই হউক, আর অশুভ কার্য্যই হউক, যাহা দ্বারা শরীর পীড়াযুক্ত হয়, তাহা অধিক করিবে না; ইহার নাম অনায়াস।

ন গুণান্ গুণিনো হন্তি স্তৌতি চান্যান্ গুণানপি।
ন হসেচ্চান্যদোষাংশ্চ সানসূয়া প্রকীর্ত্তিতা॥

গুণী ব্যক্তির গুণের অপলাপ না করা, সৎ গুণের প্রশংসা করা, অপরের দোষ দেখিয়া পরিহাস না করা, ইহারই নাম অনসূয়া।

যথোৎপন্নেন কর্ত্তব্যঃ সন্তোষঃ সর্ব্ববস্তুষু।
ন স্পৃহেৎ পরদারেষু সাস্পৃহা পরিকীর্ত্তিতা॥

যখন যাহা মিলিবে তাহাতে সন্তোষ, পরস্ত্রীতে অনভিলাষ, ইহাই অস্পৃহা।

বাহ্যমাধ্যাত্মিকং বাপি দুঃখমুৎপাদ্যতেঽপরৈঃ।
ন কুপ্যতি ন চাহন্তি দম ইত্যভিধীয়তে॥

বাহ্য কারণে বা মানসিক কারণে দুঃখ উপস্থিত হইলে ক্রোধ বা প্রতিহিংসা না করার নাম দম।

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥

আয় অল্প হইলেও প্রতিদিন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অক্ষুব্ধ চিত্তে অপরকে দিবে, ইহার নাম দান।

পরস্মিন্ বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্যে রিপৌ তথা।
আত্মবৎ বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥

পরের প্রতি, বন্ধুবর্গের প্রতি, শত্রু, মিত্র ও দ্বেষের পাত্রের প্রতি আত্মবৎ ব্যবহারের নাম দয়া।

শৌচমঙ্গলানায়াসা অনসূয়াস্পৃহাদমঃ।
লক্ষণানি বিপ্রস্য তথা দানং দয়াপি চ।

এই শৌচ, মঙ্গল, অনায়াস, অনসূয়া, দম, দান ও দয়া, ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

অত্রিসংহিতা।

ব্রহ্মতত্ত্বং নজানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥

যে ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না, অথচ উপবীতের জন্য গর্ব্ব করে, সেই ব্রাহ্মণ এই পাপে পশু বলিয়া বিদিত।

ক্রিয়াহীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চাণ্ডাল উচ্যতে॥

যে ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন, মূর্খ, সর্ব্বধর্ম্ম বিরহিত, নির্দ্দয়, সে চণ্ডাল বলিয়া গণ্য।

অত্রিসংহিতা।

### ব্রাহ্মণাদির বৃত্তি।

ব্রাহ্মণস্য যাজনপ্রতিগ্রহৌ, ক্ষত্রিয়স্য ক্ষিতিত্রাণম্, কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য; শূদ্রস্য সর্ব্বশিল্পানি। আপদ্যনন্তরা বৃত্তিঃ।

ব্রাহ্মণের জীবিকালাভের উপায় যাজন ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের জীবিকা রাজ্য-পালন; বৈশ্যের জীবিকা কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য, সুদগ্রহণ, ধান্যাদি বীজ রক্ষা। শূদ্রের জীবিকা সর্ব্ববিধ শিল্প। সমূহ বিপদ উপস্থিত হইলে পরপর বৃত্তিগ্রহণে বিশেষ দোষ নাই। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বৃত্তি, ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি এবং বৈশ্য শূদ্র বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারেন।

বিষ্ণুসংহিতা।

ক্রমশঃ।

---

## নানা কথা।

**মহারাষ্ট্র সাহিত্য-সভা।**—বিগত পূজার অবকাশ উপলক্ষে বরোদায় উক্ত সভা আহূত হয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষার উন্নতি বিধানই এই সভার উদ্দেশ্য। বরোদা মহারাজার অনুগ্রহ লাভ করিতে এই সভা সমর্থ হইয়াছে। এবারকার অধিবেশনে ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা ও অক্ষর কি হওয়া উচিত, তাহা ও আলোচিত হইয়াছিল। দেবনাগরী অক্ষর ও হিন্দী ভাষা সাধারণ রূপে পরিগৃহিত হইবার উপযোগী, অনেকেই এইরূপ মত দেন। ভারতের প্রায় বার তের কোটি লোক দেবনাগরী অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। সুবোধ পত্রিকা।

**বাইবেল।**—চারিশত আঠারটি ভাষার বাই-

:বল অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। ধন্য অধ্যবসায়। Christian life, september.

মহর্ষির আত্মজীবনী।—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, মহোদয় কর্তৃক উক্ত গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। মহর্ষিদেবের বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি ছবি ও তাঁহার পরিবার বর্গের মধ্যে অনেকের ছবি উহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। মহর্ষির আত্মজীবনী কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় থাকায় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা উহার ইংরাজি অনুবাদ দেখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইল। সত্যেন্দ্র বাবু উক্ত পুস্তকের ভূমিকায় অন্য যে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই গবেষণা পূর্ণ। পুস্তকখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে এবং উহাতে এক মহৎ অভাব বিদূরিত হইয়াছে। পুস্তকের মূল্য আড়াই টাকা মাত্র এবং উহা আদি-ব্রাহ্মসমাজে প্রাপ্তব্য।

সমালোচনা। শেখ মোহম্মদ জমীরুদ্দীন সাহেব নিজকৃত দুইখানি গ্রন্থ সমালোচনার জন্য আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন। প্রথমখানির নাম ইসলামী বক্তৃতা। ইহা ইংরাজি হইতে অনুবাদিত। যে সকল বক্তা অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত ইসলাম ধর্ম্মের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে টেলার সাহেব বলিয়াছেন যে "সত্যবাদিতা এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ইসলামের সহচর। মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখিবার এবং জাতিকে সুসভ্য করিবার ক্ষমতা ইহার অতি অদ্ভুত। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম "ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য।" ইহাতে হিতবাদী, সঞ্জীবনী, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি সংবাদপত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ডি-এল, মহাশয় বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত আরবী, পারসী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত। ইহাঁর মত আমরা সাদরে উদ্ধার করিতেছি। তিনি বলেন— "আরবী ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা মহামূল্য গ্রন্থ আল-কোরাণ বা কোরাণ শরিফ, অন্য নাম কোরকান বা মোছাহেব। ইহা জগতের এক অপূর্ব্ব পদার্থ, অদ্ভুত ও অমূল্য গ্রন্থ। ইহা পড়িবার পড়াইবার, শিখিবার শিখাইবার গ্রন্থ বটে। আমি নিজে হিন্দু, কিন্তু হিন্দু হইয়াও এ গ্রন্থের শতমুখে প্রশংসা করিতে পারি। কোরাণ এক মহামূল্য রত্ন। এ রত্ন যে না দেখিয়াছে, ধর্ম্ম জগতে তাহার এখনও সম্পূর্ণ অধিকার হয় নাই। যাহারা কোরাণকে "বহমনেইর কল্পিত উপন্যাস" বলে তাহারা রজক-বাহকের সহিত সখ্যতা করিতে পারেন; ধর্ম্মজিজ্ঞাসু বা সাহিত্যপ্রিয় ভদ্রলোকের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ না থাকাই ভাল। কোরাণের সমগ্র বিষয় কঠোর আরব্য ভাষায় লিখিত। ভাবের বেশ তরঙ্গ আছে, ভাষায় বেশ উচ্ছ্বাস আছে, পাণ্ডিত্যের ছটা খুব দেখা যায়, ব্যাকরণের বাঁধুনী খুব মজবুত, এবং শব্দ-বিন্যাসের চাতুর্য্য ও অলঙ্কারের সংযোজনা বড়ই সুন্দর, বড়ই কৌতূহলময়। সমুদয় কোরাণ-সাগরে এক অপূর্ব্ব বীরত্ব ব্যঞ্জক তেজের লহরী ছুটিতেছে। সেই তেজে এখনও যবন জাতি বাঁচিয়া আছে।" ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক সেখ মহাশয় এই মন্তব্যগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহা পাঠে যদি হিন্দুগণের চক্ষু মুসলমান-সাহিত্যে মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি উদ্‌ঘাটিত হয় এবং তাহার সত্যের প্রতি অভিনিবেশ জন্মিয়া মনের সংস্কার ও ঘৃণা তিরোহিত হয়, তবে হিন্দু-মুসলমান-নিবসিত ভারতবর্ষের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। পক্ষান্তরে মুসলমান ভ্রাতৃবর্গের প্রতিও আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই যে তাঁহারাও হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর সাহিত্য এবং বেদ উপনিষদাদি গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিতে অভ্যাস করুন, হিন্দুর আচার ব্যবহারের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করুন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও হৃদয় হইতে হিংসা ঘৃণা দূরীভূত হইয়া ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হইবে, বসতি শান্তিময় হইবে, দেশ মধুময় হইবে। বলা বাহুল্য আমরা যথনই পারি মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতে ক্রটি করি না। ইতিপূর্ব্বে হজরত মহম্মদের জীবনের প্রথমাংশ এই পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। সেখসাদির অমূল্য উক্তির সারাংশের অনুবাদও পত্রিকায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৩০১ সালের ২১ আশ্বিন লেখককে এই বলিয়া উপদেশ দেন,

"যে সমাজেই থাক, ঈশ্বরকে প্রাণের সহিত ভক্তি কর, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন কর, তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য কর, তাঁহাকে ডাকিয়া আরাধনা কর, তাহা হইলে তোমার মুক্তি হইবে। মাকে কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলে তিনি যেমন কোলে তুলিয়া লন, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিকটে কাঁদ, তিনিও তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন।

মহর্ষি এই বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন; "ঈশ্বর তোমাকে মুক্তি দিউন ও আশীর্ব্বাদ করুন।"

পাঠক! উপরোক্ত উপদেশটি যদিও ক্ষুদ্র, কিন্তু চিন্তা করিলে দেখা যায়, যে বিশেষ সার কথা উহার মধ্যে নিহিত আছে। তিনি কোন সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিতেন না, সকলকেই আদর করি

তেন ও উপদেশ দিতেন। এক ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন না, ইহাই তাঁহার মহত্বের লক্ষণ ছিল।

---

## আয় ব্যয়

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, শ্রাবণ মাস।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ২৬৩।/০ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩৬৬৬॥/৯ |
| সমষ্টি | ... | ৩৯২৯৸৵৯ |
| ব্যয় | ... | ৩৯২॥৵০ |
| স্থিত | | ৩৫৩৭। ৯ |

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৯৩৭।৯

---

৩৫৩৭।৯

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২০০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত
২০০৲

---

২০০৲

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ১৲ |
| পুস্তকালয় | ... | ২১৸৶০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৩৬॥৵০ |
| ব্রাঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৩৮ ০ |
| সমষ্টি | ... | ২৬৩।/০ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ১৫৬৵৩ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৩০।৶ |
| পুস্তকালয় | ... | ৭৸৵ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১৮৫৸৶৩ |
| ব্রাঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ১২ ৶৬ |
| সমষ্টি | ... | ৩৯২॥৵০ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

---

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, ভাদ্র মাস।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ৪৯৭॥/ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩৫৩৭। ৯ |
| সমষ্টি | ... | ৪০৩৪৸৯ |
| ব্যয় | ... | ৮৭১৸৬ |
| স্থিত | ... | ৩১৬৩৩ |

আয়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটিতে গচ্ছিত আদি-ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবৎ সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৫৬৩ ৩

---

৩১৬৩৩

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ২৬০৲

মাসিক দান।

৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মাসিক দান
২০০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ২০৲

আনুষ্ঠানিক দান।

শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসাদ মিত্র ২০৲

ডাক্তার,আর, সেনের সহধর্ম্মিণী ১০৲

বামাচরণ বসুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্ত ২৲

এককালীন দান।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় চৌধুরী ৮৲

২৬০৲

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৩১৮৵০ |
| পুস্তকালয় | ... | ১১৮৵০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১৮৪৷৵০ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৯৲ |
| সমষ্টি | ... | ৪৯৭৷/০ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ৬৮৯ /৯ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ২৮৷/৬ |
| পুস্তকালয় | ... | ৪৮/৩ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১৪৩৮৵৩ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৫৷ ৯ |
| সমষ্টি | ... | ৮৭১৮/৬ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।
সহঃ সম্পাদক।

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, আশ্বিন মাস।

### আদিব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ৫৪০৷৵০ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩১৬৩ ৩ |
| সমষ্টি | ... | ৩৭০৩৷৵৩ |
| ব্যয় | ... | ৬১৭৷ ৯ |
| স্থিত | ... | ৩০৮৬ /৬ |

স্থিত।

সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাত কেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৪৮৬ /৬

৩০৮৬ /৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ ... ... ৪১৪৲

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিং এজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে পাওয়া যায়
২০০৲

বগেড্ জয়ার হাউস সেয়ারের ডিভিডেণ্ড বাবৎ।

শ্রীনয়নাথ মুখোপাধ্যায় ২১০৲

সাম্বৎসরিক দান।

শ্রীবনমালী চন্দ্র ১৲

নববর্ষের দান।

শ্রীচন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত ৩৲

৪১৪৲

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৩৮৷৵০ |
| পুস্তকালয় | | ৭৷৵০ |
| যন্ত্রালয় | ... | ৭৮৷ ০ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ২৵০ |
| সমষ্টি | ... | ৫৪০৷৵০ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ৩৩৪৮৵৩ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৬২ /৯ |
| পুস্তকালয় | ... | ১৯৷/৬ |
| যন্ত্রালয় | ... | ২০০৮৵৩ |
| সমষ্টি | | ৬১৭৷ ৯ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।
শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।
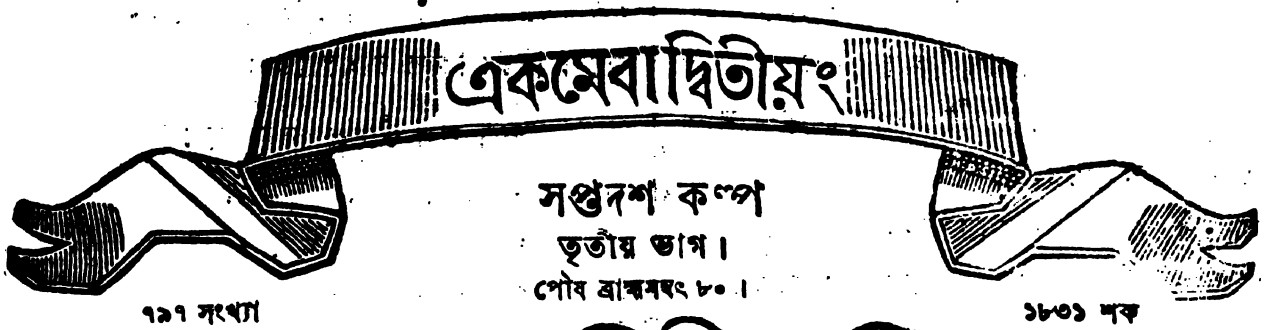
একমেবাদ্বিতীয়ং

সপ্তদশ কল্প

তৃতীয় ভাগ।

পৌষ ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।

৭৯৭ সংখ্যা ১৮৩১ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা


"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

## বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ষট্‌পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং
নহ্যধ্রুবৈঃপ্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পুনঃপুন এই কথাই বলেন যে, ধন রত্নাদি সকলই অধ্রুব পদার্থ, ইহা আমি বেশ জানি, এই অধ্রুব অনিত্য পদার্থের বিনিময়ে অথবা এই অধ্রুব অনিত্য পদার্থের সেবা স্তুতি দ্বারা সেই নিত্য সত্য পদার্থের লাভ কদাপি হয় না। যাহা ক্ষয়শীল তাহা অধ্রুব এবং যাহা অক্ষয় তাহাই ধ্রুব। ভ্রাতৃগণ! যখন দেখি যে, এই আমার গৃহ, এই আমার উদ্যান, এই আমার স্ত্রী পুত্রাদি, ইহাদের এত যে অভাব, আমি সে অভাব কিছুতেই পূর্ণ করিতে পারিতেছি না, তখন কাহার না মর্ম্ম পীড়া উপস্থিত হয়? আমরা দিন রাত সেই অভাবের প্রতীকারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। এমন কি, আবশ্যক হইলে জীবন বিসর্জ্জনও করিতে পরাঙ্মুখ হই না, কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন কালে ইহা কি একবার ভাবি যে, কাহার প্রদত্ত জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছি—এ জীবনদাতা কে? এ জীবনের উদ্দেশ্যই বা কি? আর যাহার জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে যাইতেছি, আমার জীবন বিসর্জ্জনে সে কি রক্ষা পাইবে? সে কি চিরন্তন সম্পদ, চির শান্তি এবং অমৃত-জীবন লাভ করিতে পারিবে? তাহাই যদি হইত, তবে—

"যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী
যদুপতির মথুরাপুরী কোথায় গেল?
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা"
রঘুপতির উত্তর কোশল কোথায় গেল?

এক দিন পূর্ণিমা-সম্মিলনে হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন, "হে বঙ্কিম সখে তোমরাও সবে; কালেতে বিলীন হইবে এ ভবে। নাম গন্ধ যশ কিছুই না রবে, কালেতে সকলি হইবে হারা।" সে বঙ্কিমও আর নাই, সে হেমচন্দ্রও নাই। এই অল্প দিনেই সব ফুরাইয়াছে।

আমি এক দিন দীল্লি গিয়াছিলাম। কিন্তু দীল্লি-দর্শন আমার উদ্দেশ্য ছিল না—আমার উদ্দেশ্য হস্তিনাপুর দর্শন; যেখানে এক দিন পাণ্ডুবংশীয় মহাপ্রতাপশালী হিন্দু রাজগণের বিজয়-কেতন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া প্রোথিত ছিল।

দীল্লি হইতে তিন ক্রোশ পদব্রজে শুষ্ক কণ্ঠে গমন করিয়া দেখিলাম কি? দেখিলাম, তৃণ গুল্মবিহীন দূরান্তব্যাপী প্রস্তর-স্তূপ মাত্র হা হা করিতেছে, আর পৃথ্বীরাজ-কন্যার সেই সাধের মিনার বিষাদতপ্ত মস্তক দিয়া ঊর্দ্ধে মরীচি জ্বালা উৎক্ষেপ করিতেছে! বায়ু শন্ শন্ করিয়া অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে? আমি জ্বলিয়া পুড়িয়া চলিয়া আসিলাম। ভাবিলাম হিন্দুর পরিণাম তো এই—এখন একবার লোকে যাঁহাকে দীল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলে, তাঁহার কীর্ত্তি দেখিব। জনৈক পথিক বলিয়া দিল, আগ্রার নিকটে সেকেন্দ্রায় যাও। আমি এস্থান হইতে সেকেন্দ্রা-তীর্থে প্রস্থান করিলাম। দেখিলাম ঐখানে বহু-বিশ্রুত বাদশাহ আকবরের সমাধিমন্দির। এই মন্দিরের তিন দিকে বৃহৎ বৃহৎ তিনটি দ্বার। উত্তরে কিছু দূরে শ্যাম সলিলা যমুনা প্রবাহিতা। শ্বেত ও লাল প্রস্তর দ্বারা এই সমাধি গৃহ পাঁচ স্তরে নির্ম্মিত হইয়া গগণ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান। প্রাচীরে বিচিত্র বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তরের কারুকার্য্য, এখন মলিন। মধ্যে সেই ধীসম্পন্ন পুরুষের মৃত-দেহ অন্ধকারে নিঃশব্দে কাল যাপন করিতেছে। দক্ষিণ দ্বারের দ্বিতীয় তলে রাজা মানসিংহ প্রভৃতি বারগণের নিকেতন শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। সম্মুখের তোরণ হইতে সমাধি মন্দির পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত প্রস্তরময় পথ। এই পথের মধ্যভাগে জলের আধার ও পার্শ্বে পুষ্পের উদ্যান। প্রকাণ্ড ইহার অট্টালিকা, প্রকাণ্ড দ্বার, প্রকাণ্ড প্রাচীর এবং বিশাল ক্ষেত্রে সুবৃহৎ পুষ্পোদ্যান। এখানে বাদসাহের ঐশ্বর্য্য এখনো সকলই বর্ত্তমান, কেবল সেই বাদসাহ ও বাদসাহী-প্রতাপ আর নাই—সে এখন চিরঘুমন্ত। সে আর জাগিবে না, কিন্তু তাহার যে বিষয় ভোগের প্রবল তৃষ্ণা, তাহা এই বিনাশের মধ্যে চিরজাগ্রত রহিয়াছে।

পল পল ছীজে দেহ যহ।
ঘটত ঘটত ঘটি যাই॥
সুন্দর তৃষ্ণা না ঘটে।
দিন দিন নৌতন ভাই॥
নিত নিত ডোলে তাঁকতী।
স্বর্গ মৃত্যু পাতাল॥
সুন্দর তিনোঁ লোকতে।
ভর্য়ো ন একো গাল॥
সুন্দর তৃষ্ণা করত হৈ্যে।
সবকো বাঁধি গুলাম॥
হুকুম করে ত্যোঁহী চলে।
গিনত শীত নহি ঘাম॥
সুন্দর তৃষ্ণাকে লিয়ে।
পরাধীন ভৈ যাই॥
দুঃসহ বচননিকো সহে।
যো পরহাত বিকাই॥

পলে পলে এই দেহ বিনষ্ট হইতেছে—কমিয়া কমিয়া কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু হে সুন্দর! তৃষ্ণা তো কমিতেছে না—সে দিন দিন নূতন হইয়া উঠিতেছে। শরীরের বল একদিকে কমিতেছে, তৃষ্ণার বল আর দিকে বাড়িতেছে। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই তিন লোক তাহার মুখে ফেলিয়া দাও, কিন্তু তাহার একগালও তাহাতে পূর্ণ হইবে না। হে সুন্দর! তৃষ্ণা সকলকে বন্ধন করিয়া গোলাম প্রস্তুত করিতেছে। সে গোলাম হুকুম অনুসারেই গমনাগমন করিয়া বেড়ায়। তাহার শীত গ্রীষ্ম বোধ নাই। এক তৃষ্ণারই জন্য লোক পরাধীন হয়। সেই ব্যক্তিই দুঃসহ বাক্যজ্বালা সহ্য করে, যে পরহস্তে বিক্রীত।

সুন্দর দেহ মলিন অতি।
বুরি বস্তুকো ভৌন॥

হাড় মাঁসকো কোথরা।
ভলী কহে তিহিঁ কৌন ॥
সুন্দর পঞ্জর হাড়কো।
চাম লপেট্যো তাহি ॥
তামে বৈঠ্যো ফুলিকে।
মো সমান কো আহি ॥
সুন্দর হাবে বহুতহী।
বহুত করে আচার ॥
দেহ মাহি দেখে নহি।
ভর্যো নরক ভণ্ডার ॥

হে সুন্দর! এই দেহ অত্যন্ত মলিন এবং ইহা কদর্য্য বস্তুর ভাণ্ডার। ইহা হাড়-মাংসে জড়িত, ইহাকে ভাল কে বলে? সুন্দর, চর্ম্মবেষ্টিত অস্থিপঞ্জরের মধ্যে উপবেশন করিয়া গৌরব-ভরে মনে করিতেছ যে আমার সমান আর কেহ নাই। লোক স্নানাদি করিয়া কত প্রকার আচার করিতেছে, কিন্তু তাহার দেহের মধ্যে যে নরক ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টি নাই।

আমি পুরাতন পুষ্পবৃক্ষের ছায়াতে প্রস্তর-পথের উপরে বিশ্রাম করিতে বসিলাম—দক্ষিণ হইতে মলয়-মারুৎ ধীরে ধীরে আমার কর্ণ-রন্ধ্রে বলিয়া গেল—

একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে,
একোঽনুভুংক্তে সুকৃতং একএবতু দুষ্কৃতং॥

দেখিলাম তো অধ্রুব পদার্থের এই অবস্থা। এই অধ্রুব পদার্থের দ্বারা যাঁহারা সুখ-শয্যা রচনা করেন, তাঁহারা অধ্রুব গতিই প্রাপ্ত হন। ধ্রুবগতি লাভের জন্য সেই ধ্রুব পুরুষেরই শরণাপন্ন হইতে হয়। সেই ধ্রুব পুরুষ কে এবং তিনি কি? ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিতেছেন—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা।

তিনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং অন্য তাবৎ পদার্থ হইতে প্রিয় এই অন্তরতর পরমাত্মা। তিনিই তোমাকে এই অধ্রুব তাবৎ পদার্থ ভোগের জন্য দিয়াছেন, তুমি ভোগ কর কিন্তু তাহাতে মুগ্ধ হইও না। মুগ্ধ হইবার বস্তু সেই চির সুন্দর, চির শান্তিময়, চিরসত্য চিরমঙ্গলময় সনাতন সৎ। এই সনাতন সৎই চিরসুন্দর, চিরশান্ত, চিরমঙ্গল ও সত্য। তিনিই অন্তরতর অন্তরতম পরমাত্মা। এই অন্তরতম পরমাত্মার শরণাপন্ন হইতে হইলে তাঁহার সহিত যোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। বলিলাম, যোগ নিবদ্ধ করিতে হয়। তবে এখন কি আমি তাঁহার সহিত যোগে নিবদ্ধ নহি? অবশ্য আছি। তবে কথা এই যে, যখন আমি আমার এই অবস্থা জানিব, বুঝিব, তখনই যোগ নিবন্ধন সিদ্ধ হইবে। মানবের পক্ষে ব্রহ্মস্বরূপ-তত্ত্বে অজ্ঞানতাই বন্ধন, তদ্‌জ্ঞানই যোগ ও মুক্তি।

সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।

বেদ বলিতেছেন যে, এই শরীরের অভ্যন্তরে দুইটি অশরীর উপলব্ধি স্থান আছে—তাহা আপনাকে আপনি জানিতেছে, এই আপনাকে আপনি জানাই তাঁহার স্থিতি-প্রতিষ্ঠা, কিম্বা বল যে—ইহাই তাঁহার সত্ত্বা। এই যে দুইটি সত্ত্বা তাহার একটি অপরিমিত ভূমা, আর একটি পরিমিত কর্ম্মফল ভোক্তা। অহং প্রত্যয়সিদ্ধ—অহং প্রত্যয়-প্রতিষ্ঠিত এই দুই জ্ঞানবিন্দু একত্র থাকিয়াই একজন সংসারে কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছে, অপর পুরুষ ভোগহীন নিষ্কলঙ্ক সাক্ষীরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই সাক্ষী পরমাত্মাকে ভুলিয়া যখন এই ভোক্তা জীবাত্মা কেবল বিষয়-সুখ সাধনার্থে সংসারে নিমগ্ন হয়, তখন তাহার পদে পদে শোক হয়; কিন্তু যখন এই জীবাত্মা তাহার হৃদ্গত প্রীতি-

কুসুমে পরমাত্মার পূজা করে ও এই জগতস্থ তাঁহার মহিমাকে দেখে এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সাধন করে, তখনি ঈশ্বরকে দেখে, দেখিলে তখন আর শোক থাকে না, পরমানন্দ অনুভব হয়, প্রেমের বিমল জ্যোৎস্না প্রকাশিত হয়।

সাকি বরু এ বাদা * বরাফরোজ জাম মা
মৎরব বগো কে কার জাহাঁ মুদ্ বকাম মা।
মা দর পিয়ালে অক্স রুখে ইয়ার দীদয়ম্
এ্যায় বেখবর জ লজ্জতে সোর্ব মদাম মা।

হে পথ প্রদর্শক, প্রেমের জ্যোৎস্নাতে আমার হৃদয় আলোকিত হইয়াছে। রে বন্দী, তুমি এই কথাই বল যে, জগতের কর্ম্মই আমার কর্ম্মে নিষ্পন্ন হউক। আমার হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই চিরবন্ধুর সুন্দর মুখচ্ছবি নিরীক্ষণ করিতেছি। রে বেহুঁস, সর্ব্বদা আমি যে এই কথাই বলিতেছি, তাহার মর্ম্মের প্রতি তুমি কর্ণপাত করিতেছ না ?

তুমি বলিতেছ যে, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান না হইলে মানুষ বন্ধনমুক্ত হইতে পারে না। পরমানন্দ উদ্ভব হয় না। ইহা কেবল শাস্ত্রের উক্তি নহে, ইহা হিন্দুর হাড়ে হাড়ে, মজ্জায় মজ্জায়, বিশ্বাসে বিশ্বাসে প্লাবিত রহিয়াছে। আমি এই শাস্ত্রের কথার এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়া অন্য একটি শাস্ত্রবচন উদ্ধার করিতেছি—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।"

কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না ; প্রত্যুত ঘৃত-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে। প্রারব্ধ কর্ম্মই যদি আদি হইতে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের নিয়ামক হয় এবং ভোগের দ্বারাই ভোগের অবসান ও তৃপ্তি হয়, তবে শাস্ত্রান্তরে কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, এ কথা কেন আসিল ? আর শ্রীকৃষ্ণ কেনই বা এ কথা বলিলেন যে, যেরূপ ধূম সকল অগ্নিকে আচ্ছাদিত করে, যেমন দর্পণ উপরিস্থ মলের দ্বারা আবৃত হয় এবং যেমন জরায়ু নামক গর্ভবেষ্টন-চর্ম্মদ্বারা গর্ভ সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই জ্ঞান কামের দ্বারা আবৃত হয়। জ্ঞান অর্থে এখানে জ্ঞানস্বরূপ জীবাত্মা-বিন্দু বুঝিতে হইবে। পুনরায় কেন বলিলেন যে, এই জ্ঞান কামের দ্বারা আবৃত হয়। ভোগকালেও অনর্থ অনুসন্ধান হেতু ঐ কাম দুঃখের কারণ হয়, এইজন্য কাম জ্ঞানীদিগের নিত্য শত্রু। ইহা কখন তৃপ্ত হয় না এবং ইহা অনলের ন্যায় সন্তাপজনক। বিষয় দর্শন শ্রবণাদি হেতু কামের উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইন্দ্রিয় সকল এবং মন আর বুদ্ধি ঐ কামের আধারস্বরূপ কথিত হইয়াছে। ইহা ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা জ্ঞানকে আবৃত করিয়া দেহীকে বিমোহিত করে। অতএব ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া পাপস্বরূপ কামকে নষ্ট কর, কারণ ঐ কাম আত্মবিষয়ক যে জ্ঞান এবং শাস্ত্রোক্ত যে বিজ্ঞান তদুভয়ের বিনাশক হয়। পুরুষ হইতেছে কামময় এবং এই কামনাই কর্ম্মের উদ্ভব করে। মনুষ্য কায়মনোবাক্যে যে কর্ম্ম করে তাহা ন্যায্য বা বিপরীত হউক এই কামনাই তাহার প্রবর্ত্তক। অতএব পুরুষের উচিত বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কামনাকে সংযত রাখিয়া সাধু কার্য্যে তাহাকে নিয়মিত করিবেক। কর্ম্ম তিন প্রকার— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, যে কর্ম্ম ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যরূপে বিহিত; অভিনিবেশ শূন্য, রাগদ্বেষরাহিত্যে কৃত এবং নিষ্কাম

* বাদা শব্দের অর্থ সুরা, কিন্তু দেওয়ান হাফেজ ইহা প্রেম অর্থে ব্যবহার করিতেন।

কর্ত্তা কর্ত্তৃক কৃত, সেই কর্ম্ম সাত্বিক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষী সাহঙ্কার ব্যক্তি কর্ত্তৃক কৃত, যাহা বহ্বায়াসকর, সেই রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। যাহা ভাবী শুভাশুভ, বিত্ত ক্ষয়, হিংসা, পরপীড়া ও পৌরুষকে অপেক্ষা না করিয়া এবং আপনার সাধন সামর্থ্যকে বিচার না করিয়া মোহপ্রযুক্ত আরব্ধ হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়। যিনি অভিনিবেশ শূন্য, নিরহঙ্কার, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত এবং আরব্ধ কর্ম্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এবম্ভূত অনুষ্ঠান-কর্ত্তা সাত্বিক বলিয়া কথিত হন। যিনি পুত্রাদিলাভার্থী, কর্ম্মফলকামী, লুব্ধ, হিংস্রক অশুচি এবং হর্ষশোকযুক্ত সেই অনুষ্ঠান কর্ত্তা রাজস বলিয়া অভিহিত হন। অনভিহিত, বিবেকশূন্য, উগ্র, শঠ, পরের অপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী সেই অনুষ্ঠান-কর্ত্তা তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ইহাদের গতিও ভিন্ন ভিন্ন। তামস পুরুষের গতি তমসাচ্ছন্ন লোকেই হয়, রাজসের গতি রজঃপ্রধান লোকে হয় এবং সাত্বিকের গতি পুণ্যলোকে হয়। কর্ম্মজন্য জীবের যে লোকেই গতি হউক, তাহা তো তাহাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে না। কর্ম্মই যদি মনুষ্যের বন্ধনের কারণ হয়, তবে কর্ম্মক্ষয় করিতে না পারিলে বন্ধন হইতে মুক্তি নাই। দেখিতে হইবে যে কর্ম্মক্ষয় কিসে হয়। গীতা বলিতেছেন যে—

> যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎকুরুতেঽর্জ্জুন।
> জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি স্তূপাকার কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, আত্মজ্ঞান রূপ অগ্নি সেইরূপ সকল কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। চিত্তশুদ্ধির যত প্রকার শাস্ত্রসম্মত উপায় আছে তাহাদের মধ্যে আত্মজ্ঞানের তুল্য উপায় আর কিছুই নহে। এই আত্মজ্ঞান স্বয়ংই যোগ সংসিদ্ধির ফলকে প্রদান করে। কালে এই অধ্যাত্মজ্ঞানের ফলে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়। এই অধ্যাত্ম জ্ঞান কাহার হয়? যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা আছে, তাহার হয়। আর কাহার, না যিনি ব্রহ্ম পরায়ণ এবং সংযতেন্দ্রিয়। এইরূপ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান দ্বারা পরম শান্তিকে লাভ করেন। এখন কর্ম্ম নাশ বিষয়ে শেষ কথা এই যে,—

> যস্ত্বাত্মরতিরেবস্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
> আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥

যাঁহার আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই যাঁহার সন্তোষ, সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মই থাকে না। কর্ম্ম করিয়াও তিনি কর্ম্ম করেন না। কেন না তাঁহার চক্ষু এই যে দেখিতেছে, কর্ণ শ্রবণ করিতেছে, রসনা বাক্য বলিতেছে, নাসিকা ঘ্রাণ লইতেছে, ত্বক স্পর্শ করিতেছে, মন মনন করিতেছে, ইহারা স্ব স্ব বিষয়রস আকর্ষণ করিয়া অন্তরে ভোক্তা জীবাত্মাকে তাহাতে সিক্ত করিবার জন্য প্রদান করিতেছে। এ দিকে জীবাত্মা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানাগ্নিতে প্রজ্বলিত থাকিয়া অন্তরস্থ প্রীতি-কুসুমে পরমাত্মার পূজা করিয়া পরমানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে, আর যেমন যেমন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণের আহৃত বিষয়বন্ধনোপযোগী সামগ্রী সকল তাহার নিকট উপস্থিত হইতেছে, অমনি সেই জ্ঞানাগ্নিতে তাহা পুড়িয়া ভস্মসাৎ হইয়া যাইতেছে। ইহাই রহস্য, ইহাই সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম-সাধনের পরম কৌশল।

> যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতা
> জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ।

যে ব্যক্তির কর্ম্মসকল ফল কামনা-

বর্জ্জিত হয়, সেই ব্যক্তিই পণ্ডিতপদবাচ্য। কারণ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা তাহার কর্ম্মসকল ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। যাঁহার অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞানাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, তিনিই কামনাবর্জ্জিত হইতে পারিয়াছেন—তিনিই কর্ম্মে আসক্ত নহেন, সুতরাং তাঁহাকে কর্ম্ম বন্ধন করিতে পারে না। যাহা কিছু বাহ্য, যাহা মানুষকে সংসারে বন্ধন করে, তাহাই অধ্রুব, আর যাহা মানুষকে বন্ধন হইতে মুক্ত করে তাহাই ধ্রুব। এখন ইহা আমরা বুঝিয়াই বলিতেছি—

জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যং।
নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবংতৎ॥

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

## মঙ্গল।

( চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি )

পাপ পুণ্যের বিচার ও দণ্ড পুরস্কারের বিচার—এই দুইটি একসূত্রে আবদ্ধ। বস্তুত, ভাল কাজ করিতেছি কি মন্দ কাজ করিতেছি এ কথা না জানিয়া যে ব্যক্তি কোন কাজ করে, তাহার সে কাজে পাপও নাই পুণ্যও নাই। যখন কোন জড় পদার্থের দ্বারা, অজ্ঞাতসারে কোন হিতজনক কিংবা অহিতজনক কার্য্য সম্পাদিত হয়, তখন যেমন তাহার সেই কার্য্যে পাপও নাই পুণ্যও নাই—ইহাও সেই প্রকার। অনিচ্ছাকৃত অপরাধের কোন দণ্ড নাই কেন? তাহার কারণ, ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই তাহা অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয় না। এই জন্যই অপরাধের মোকদ্দামায়, অপরাধীর পূর্ব্ব-সংকল্পকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটা বিশেষ বয়স পর্য্যন্ত বালক-অপরাধীকে লঘু দণ্ড দেওয়া হয় কেন? তাহার কারণ, ভাল মন্দের জ্ঞান ও স্বাধীনতার জ্ঞান না থাকায়, তাহার কাজকে সুকৃতিও বলা যায় না দুষ্কৃতিও বলা যায় না; শুধু সুকৃতি ও দুষ্কৃতিই দণ্ড পুরস্কারের যোগ্য। যদি কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক কোন কাজ করে, অথচ যদি তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক না করে, তাহা হইলে ক্ষতির পরিমাণ-অনুসারে তাহাকে ক্ষতিপূরণের দণ্ড দেওয়া হয় মাত্র; যাহাকে প্রকৃত দণ্ড বলে, সেরূপ দণ্ডে সে দণ্ডিত হয় না।

অবস্থাবিশেষে কোন কাজ পাপ ও কোন কাজ পুণ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। কার্য্যের সেই বিশেষ অবস্থা ঘটিলে, তবেই সেই কাজে পাপ কিংবা পুণ্য প্রকাশ পায়, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড পুরস্কারও আসিয়া পড়ে।

পুণ্য কাজ করিলে, পুরস্কৃত হইবার আমাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে; এবং পাপ কার্য্য করিলে, আমাদিগকে দণ্ড দিবার অন্যের অধিকার আছে;—এমনও বলা যাইতে পারে,—আমাদের নিজেরও অধিকার আছে। কথাটা একটু অদ্ভুত শোনায়,—কিন্তু ইহা আসলে ঠিক। অনেক সময় দেখা যায়, অপরাধীরা নিজেই অপরাধের জন্য উচিত দণ্ড প্রার্থনা করে। পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল কষ্ট—এ কথা যেমন সত্য, পাপের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে—এ কথাটাও তেমনি সত্য।

পাপ পুণ্য, যেন বৈধ ঋণস্বরূপ দণ্ড পুরস্কারের দাবী করে। কিন্তু পুণ্যের সহিত পুরস্কারকে এবং পাপের সহিত দণ্ডকে একীভূত করিলে চলিবে না। তাহা হইলে, কার্য্য ও কারণকে, ক্রিয়া ও পরিণামকে এক করিয়া ফেলা হয়। এমন কি,

যখন দণ্ড পুরস্কারের অস্তিত্ব থাকে না, তখনও পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব থাকে।

দণ্ড পুরস্কার পাপ পুণ্যের ফল—কিন্তু স্বয়ং পাপ পুণ্য নহে। দণ্ড পুরস্কারকে রহিত করিলেও, পাপ পুণ্যকে রহিত করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি পাপ পুণ্যকে উঠাইয়া দেও, তাহা হইলে প্রকৃত দণ্ডও থাকে না, প্রকৃত পুরস্কারও থাকে না। ধন ঐশ্বর্য্য কিংবা অযোগ্য সম্মান—এ সমস্ত শুধু ভৌতিক সুবিধা মাত্র; পুরস্কার জিনিসটা আসলে নৈতিক; পুরস্কারের মূল্য—পুরস্কারের আকারের উপর নির্ভর করে না। প্রাচীন রোমকেরা যে ওক্-গাছের পাতার মুকুটে বীরপুরুষদিগকে ভূষিত করিত, তাহা ইন্দ্রপুরীর সমস্ত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও তাহারা মূল্যবান বলিয়া মনে করিত; কেননা উহা সমস্ত রোমক জাতির প্রদত্ত পুরস্কার-স্বরূপ সম্মান-চিহ্ন। পুরস্কার কি?—না, প্রতিদান। সৎকার্য্যের যে পুরস্কার তাহা সৎকার্য্যের ঋণস্বরূপ; সৎকার্য্য না করিয়া যে পুরস্কার লাভ করা যায় তাহা হয় ভিক্ষা নয় চৌর্য্য। দণ্ড সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অপরাধের সহিত কষ্টের একটা স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। শুধু কষ্টটাই সত্য নহে, এই সম্বন্ধটাও সত্য।

দুইটি কথা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা অবশ্যক, কেন না সে দুইটি কথাই সত্য। প্রথম কথাঃ—যাহা মঙ্গল তাহা স্বতই মঙ্গল, এবং তাহার ফল যাহাই হউকনা, তাহা সংসাধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য; দ্বিতীয় কথাঃ—মঙ্গলের পরিণাম মঙ্গলই হইয়া থাকে। মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন যে সুখ তাহার কোন নৈতিক ভাব নাই, কিন্তু মঙ্গলের ফলস্বরূপ যে সুখ তাহাই নৈতিক জগতের অন্তর্ভূত।

সুখহীন ধর্ম্ম, দুঃখহীন পাপ—একথা পরস্পর-বিরুদ্ধ—এবং ইহা একটা ঘোর বিশৃঙ্খলতা। যদি ধর্ম্ম বলিতে ত্যাগ বুঝায়—অর্থাৎ কষ্ট স্বীকার বুঝায়—তাহা হইলে সেই ত্যাগের কষ্ট সাহসপূর্ব্বক সহ্য করিলে, পরিণামে তাহার পুরস্কার স্বরূপ সেই সুখই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা গোড়ায় বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল;—ইহাই শাশ্বত ন্যায়বিচার। এবং সুখের প্রলোভনে কোন পাপ কর্ম্ম করিলে পরিণামে দুঃখ পাইতে হইবে—ইহাও শাশ্বত ন্যায়বিচার।

এখন দেখা যাউক—ভাল ও মন্দ কার্য্যের সহিত যে সুখ দুঃখের নিয়ম সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহা কিরূপে সংসিদ্ধ হয়। এই পৃথিবীতেই অধিকাংশ স্থলে সেই নিয়মটি কার্য্যে পরিণত হয়। এই পৃথিবীতেই একটা নিয়ম শৃঙ্খলার আধিপত্য দেখা যায়। ইহলোকে কখন কখন এই নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম হইলেও, পাপ পুণ্যের সহিত দণ্ড পুরস্কারের সম্বন্ধ না থাকিলেও, ইহা নিশ্চিত—অখণ্ড মঙ্গলের নিয়ম, পাপ পুণ্যের নিয়ম, কর্ত্তব্যের নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। একথা আমাদের জ্ঞান কখনই অস্বীকার করিতে পারে না। আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস,—যিনি আমাদের অন্তরে নৈতিক শৃঙ্খলার জ্ঞান ও ভাব নিহিত করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং ইহাকে কখনই ব্যর্থ হইতে দিবেন না,—শীঘ্রই হউক, বিলম্বেই হউক, ধর্ম্মের সহিত সুখের সমন্বয় তিনি অবশ্যই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবেন,—কি উপায়ে করিবেন সে তিনিই জানেন। সেই দূর-ভবিষ্যতের রহস্য উদ্‌ঘাটনের এখনও আমাদের সময় হয় নাই। এখন আমরা কেবল নৈতিক সত্যের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য সচেষ্ট হইব—এখন আমাদের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট।

---

## উন্নতির মূলকারণ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে বলিয়াছিলেন যে মনুষ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি চারিটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আমরা যতই আলোচনা করিয়াছি, ততই তাঁহার এই সত্যবাক্যের উপর আস্থাবান হইতেছি। সে চারিটি বিষয় কি, না জন্ম, শিক্ষা, সঙ্গ ও সাধনা। এক দিকে যেমন মনুষ্যত্বের বিকাশ এই চারিটি বিষয় সাপেক্ষ, তেমনি অন্যদিকে আমাদের অবনতিও উহার উপর নির্ভর করে।

১ম, জন্ম। পিতা মাতা ও বংশের গুণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রেতে সঞ্চারিত হয়। আমরাও দেখিয়াছি এবং বিজ্ঞানও সাক্ষ্য প্রদান করে যে পুত্র উত্তরাধিকারীসূত্রে পিতা মাতার গুণ প্রাপ্ত হয়। পিতা ধার্ম্মিক হইলে পুত্র প্রায়ই ধার্ম্মিক হয়। পিতা মাতা নিষ্ঠাবান ও দয়ালু হইলে সন্তান সন্ততিও তৎভাবাপন্ন হয়। অন্যপক্ষে পিতা নৃশংস ও দুষ্টস্বভাব হইলে সন্তান সন্ততি পিতার দোষ প্রাপ্ত হয়। এ নিয়মের যে ব্যভিচার নাই, সে কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। কেন না অনেক সময়ে আমরা দেখিতে পাই সাধু পিতা মাতা হইতে অসৎ পুত্রেরও জন্ম হইয়া বংশকে কলঙ্কিত করিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও সাধু পিতা মাতার অঙ্কে লালিত পালিত হইবার সৌভাগ্য যে সকল পুত্রের ঘটিয়াছে, তাহারা অনন্যসাধারণ অধিকারে অধিকারী। সাধু ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি পুত্র আপনার দায়িত্ব-বোধকে জাগাইয়া রাখিতে পারে, বংশের মুখ সমুজ্জল করিবার ইচ্ছা যদি তাহার অন্তরে জাগরূক থাকে, তবে সে সন্তান প্রকৃত উন্নতিলাভ করিবেই করিবে। কিন্তু যাহারা সাধু পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহাদের নিরাশার কোন কারণ নাই। তাহারা শিক্ষা সঙ্গ ও সাধনার প্রভাবে জন্মগত সৌভাগ্য ও সুবিধাকে অতিক্রম করিতে পারে।

২য়, শিক্ষা। শিক্ষা হইতে আমরা কি না প্রত্যাশা করিতে পারি। অরণ্যবাসী আদিম নিবাসী আর জ্ঞানোন্নত সুসভ্য লোক, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কে বিধান করে, না শিক্ষা। বিদ্যালয়ে জ্ঞান শিক্ষা, পিতা মাতার নিকট ভব্যতাশিক্ষা ও, গুরুর নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা এই ত্রিবিধ শিক্ষা যদি কেহ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে সত্যসত্য দেবভাব অবতীর্ণ হইবেই হইবে। কেবলমাত্র শিক্ষার গুণে মনুষ্যজাতির ভিতরে আকাশ পাতাল প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। সুশিক্ষা মনুষ্যের মুখ উজ্জল করে, জাতির মুখ উজ্জল করে এবং দেশের মুখ উজ্জল করে। আবার অন্য দিকে কুশিক্ষা প্রভাবে মনুষ্য দস্যু তস্কর ও নরহন্তার পদবী প্রাপ্ত হয়।

৩য়, সঙ্গ। হইতে পারে উচ্চ বা সাধু বংশে আমার জন্মগ্রহণ হয় নাই, ধার্ম্মিক পিতা মাতার রক্ত-বিন্দু আমাতে সঞ্চারিত হয় নাই, হইতে পারে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুবিধা আমার জীবনে ঘটে নাই, তাহা বলিয়া সর্ব্ববিধ সৌভাগ্য হইতে কি আমি বঞ্চিত থাকিব, অন্তরের সাধুভাবগুলি কি প্রস্ফুটিত হইবে না। তাহা কখনই হইতে পারে না। আমি যদি সাধু-সঙ্গ লাভ করিতে পারি, তাঁহাদের আদর্শ-জীবন দেখিয়া যদি সুপথে চলিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমার জীবনে দেবভাব বিকশিত হইবেই। সাধুসঙ্গের প্রভাব মনুষ্য জীবনের উপরে বিশেষ-ভাবে কার্য্য করে। আমাদের দেশে তীর্থপর্য্যটনের যে বিধি

আছে উদ্দেশ্য সাধুসঙ্গলাভ তাহার অন্যতম লক্ষ্য। যে জ্ঞান বিদ্যালয়ে লাভ করিবার আমার সুযোগ ঘটে নাই, সে শিক্ষা সে জ্ঞান সাধুর সহবাসে সহজেই লাভ হইতে পারে। সাধুসঙ্গের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। সাধুগণের জীবনের যে এক আকর্ষণী শক্তি আছে,তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া কত লোকে যে প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে। এই যে গৌরাঙ্গদেব, বুদ্ধদেব, নানক প্রভৃতি অনেকানেক ধর্ম্ম-প্রবক্তা তাঁহাদের চরিত্রের কি এক আশ্চর্য্য প্রভাব, কি বিস্ময়জনক আকর্ষণী শক্তি। তাঁহাদিগের কেন্দ্রাভিকর্ষিণী শক্তি প্রভাবে কত লোকের মোহ-মেঘ অপসারিত হইয়াছে, কতলোক চিরজাগরণ লাভ করিতেছে, কত লোক গতিমুক্তির পথ প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার অন্য দিকে কুসঙ্গ প্রভাবে কত যুবার যে সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে।

৪র্থ সাধনা। হয়ত আমার জন্ম উচ্চ ও ধার্ম্মিক বংশে হয় নাই, বিদ্যালয়ে বা গৃহে আমি শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হই নাই, সাধু-সঙ্গ আমার জীবনে ঘটিয়া উঠে নাই, তাই বলিয়া কি সর্ব্ববিধ উন্নতি হইতে আমি চিরবঞ্চিত। তাহা কখনই নহে। যদি আমার সাধনা থাকে, চেষ্টা থাকে, অধ্যবসায় থাকে, ধর্ম্মলাভ ও ঈশ্বর লাভের জন্য পিপাসা থাকে, তবে দুর্দ্দম্য সাধনা-প্রভাবে আমি কি না হইতে পারি। আমি বিশ্ববিজয় করিতে পারি, যদি আমার সাধনা থাকে—উৎসাহ থাকে। উচ্চ বংশে বা সাধু বংশে জন্মিয়া অপরে যে সুবিধা লাভ করিতে সক্ষম হয়, শিক্ষা দ্বারা যে উৎকর্ষ সাধিত হয়, সৎসঙ্গের দ্বারা চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, এ সকলেরই তেজ খর্ব্ব করিয়া সাধনার প্রভাব উর্দ্ধে জ্বলিতে থাকে।

যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম প্রবক্তা কেবল তাঁহারা নিজ নিজ সাধনা অধ্যবসায় ও চেষ্টা প্রভাবে দৈব-বল দৈব-শিক্ষা লাভ করিয়া সমগ্র জন-সমাজকে পরিচালিত করেন এবং তাঁহাদের শিক্ষা ও তাঁহাদের বাণী লোকসমাজ মাথা পাতিয়া গ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের শিক্ষা কোথায় ছিল, যিশুখৃষ্টের শিক্ষা কোথায় ছিল, অধুনাতন সময়ে রামকৃষ্ণের শিক্ষা কোথায় ছিল,কিন্তু তাঁহারা যে শিক্ষা ও দীক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন; তাহার গুরুত্ব অনুভব করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যে ঐকিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত সাধনা, সত্য সত্যই ইহার বল ইহার তেজ সমগ্র মানবসমাজকে চমকিত করে।

সেই জন্যই বলিতে চাই, যদি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবার আমাদের বাসনা থাকে, তাহার উপায় শিক্ষা সঙ্গ ও সাধনা; এবং এই মনুষ্যত্ব লাভের অনন্যসাধারণ সুবিধা ও সুযোগ জন্ম, অর্থাৎ উচ্চবংশে বা ধার্ম্মিক বংশে জন্ম পরিগ্রহণ।

---

## শিক্ষা ও সংস্কার।

প্রকৃত পক্ষে শিক্ষা দেশের মধ্যে বিস্তারিত না হইলে সংস্কারকার্য্য আদৌ চলিতে পারে না। যেমন ভূমিকে সর্ব্বাগ্রে কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলে সে বীজ অঙ্কুরিত হইবেই হইবে, তেমনি জনসমাজের ভিতরে শিক্ষা বিস্তারের সর্ব্বপ্রথমে চেষ্টা করিয়া পরে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিলে সংস্কারকের হতাশ হইবার কোন কারণ থাকে না। আমাদের দেশে

নানা কারণে সংস্কারের আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কারের আবশ্যকতা দিন দিন অনুভূত হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ-শতাব্দীর বহু পূর্ব্ব হইতে সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন, এবং অনেক দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার অভাবে অনেকে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য ধারণ করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। সংস্কারের আবশ্যকতা নিজে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, তাহার গুরুত্ব না বুঝিয়া, যদি সেই সংস্কার আমি আমার জীবনে ও কার্য্যে গ্রহণ করি, তবে তাহা এক ভাবে বলিতে গেলে কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র। সংস্কার শিক্ষার নিত্য-সঙ্গী। সুশিক্ষা-বিহীন সংস্কার কিছুতেই স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। বরং সেইরূপ সংস্কার জনসমাজের ভিতরে অমঙ্গল আনয়ন করে। আমরা এদেশে শিক্ষা বিস্তারের যতই কেন গর্ব্ব করি না, ভারতবর্ষ এখনও প্রকৃত শিক্ষা হইতে বহু দূরে। আমরা সে দিন কোন মাসিক পত্রিকায় (Indian World) দেখিতেছিলাম যে এদেশে প্রতি দশজন পুরুষের ভিতরে কেবলমাত্র একজন, এবং প্রতি ১৪৬ জন স্ত্রীলোকের ভিতরে একজনমাত্র লিখিতে ও পড়িতে পারেন। ইহা শুনিয়া সত্য-সত্যই আমাদের মস্তক লজ্জায় অবনত হয়। যাঁহারা লিখিতে ও পড়িতে জানেন তাঁহাদের মধ্যে কয়জনই বা সংবাদপত্র ক্রয় করিতে বা পড়িতে সক্ষম। উক্ত প্রবন্ধের লেখক (Saint N. Sing) বলেন যে জাপানী কুলীরা প্রতিদিন কার্য্যের ভিতরে সামান্য অবকাশ পাইলেই প্রাত্যহিক সংবাদপত্র পাঠ করিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন আমি জাপানে একজন মাত্র নিরক্ষর জাপানী দেখিয়াছি কি না সন্দেহ। এই যে দেশব্যাপী শিক্ষা ইহাই জাপানের উন্নতির মূল। বাধ্য করিয়া স্ত্রী পুরুষ সকলকে বিনা মূল্যে সুশিক্ষিত করিবার বিধি ব্যবস্থা প্রচলিত না হইলে ভারতের সৌভাগ্য ফিরিবে না। জাপানে এইরূপ অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা সর্ব্বসাধারণ লাভ করিতে বাধ্য। যাঁহারা দেশের ভিতরে মনীষী, তাঁহারা এখন যাহা বলেন বা লিখেন, অন্যান্য সকলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং তদনুসারে কার্য্য করিতে চেষ্টা করে। মনীষীই বল, নেতাই বল, আর দেশসংস্কারকই বল তাঁহাদিগকে অরণ্যে রোদন করিতে হয় না। এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর হইতে অনেক সময়ে যে সকল গুরুগম্ভীর উপদেশ প্রদত্ত হয়, নিতান্ত পরিতাপের সহিত স্বীকার করিতে হইবে, ব্রাহ্মসমাজের নিতান্ত অন্তরঙ্গ লোকের মধ্যেও অনেকের তাহা ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই। কারণ অন্য আর কিছুই নহে, কেবলমাত্র শিক্ষার অল্পতা।

ভারতবর্ষে নেতার অভাব নাই। কি ধর্ম্মরাজ্যে কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদেশে এমন অনেক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা অত্যুজ্জ্বল প্রতিভায় এবং পরিপুষ্ট জ্ঞানে পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য দেশের সুবিজ্ঞ নেতাগণ অপেক্ষা কোন অংশে হীন-বীর্য্য নহেন। কিন্তু সুশিক্ষিত শ্রোতা ও সহচরের অভাবে তাঁহাদের মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেছে না। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় (University) কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য; কিন্তু জাপানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা প্রদানের জন্য। সেখানে অনুত্তীর্ণ ছাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। চারিটি বিষয়ের মধ্যে হয় ত তিনটি বিষয়ে আমি পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলাম, একটি মাত্র বিষয়ে আমি অকৃতকার্য্য হইলাম।

পর বৎসরে আমাকে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার ঐ চারিটি বিষয়েই পরীক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু জাপানের ব্যবস্থা অন্যরূপ। যে বিষয়টিতে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, কেবলমাত্র সেই বিষয়টিতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আমি সর্ব্ববিষয়ে উত্তীর্ণ বলিয়া গণ্য হইব। বাস্তবপক্ষে ঐরূপ ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত না থাকায় অনেকের সর্ব্বনাশ সাধিত হইতেছে, অনেকের প্রতিভা এককালে বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে। রাজকীয়-বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত রাজকীয়-সম্বন্ধবিহীন অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় জাপানে রহিয়াছে। শিল্পবয়ন ও বাণিজ্য-বিদ্যা কত স্থানে অধীত হইতেছে। হায়! আমাদের দেশে ঐরূপ শিক্ষালাভের সুন্দর বিধান না থাকায় কতশত যুবককে দেশ বিদেশে গমন করিতে হইতেছে।

প্রায় ৪৩ বৎসর পূর্ব্বে জাপানের রাজাজ্ঞা এই ভাবে বিঘোষিত হইয়াছিল যে, "এই ভাবে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে যাহাতে জাপানের কোন গ্রামে একটিমাত্র নিরক্ষর পরিবার না থাকে এবং একটি পরিবারের ভিতরে একজনও নিরক্ষর না থাকে।"

কেবলমাত্র সাহিত্য গণিত শিক্ষা নহে জাপানে শিল্পশিক্ষা ব্যায়ামশিক্ষা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষার সুন্দর ব্যবস্থা আছে। জাপানে অশিক্ষিতা স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায়ই সমান; নাই বলিলেই হয়। স্ত্রীশিক্ষা দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে। এমন কি জাপানে স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় (Woman's University) আছে। ফলে জাপানে স্বদেশবাৎসল্য ভাবে ভঙ্গীতে রচনায় কাব্যে সাহিত্যে চারিদিক হইতে উথলিয়া উঠিতেছে।

অবশ্য ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক করিয়াছেন ও অনেক করিতেছেন, এবং সে দিন নিতান্ত দূরে নহে যখন ভারতের সমগ্র নরনারী ইংরাজ শাসনে অন্ততঃ সামান্যরূপ লিখিবার ও পড়িবার শক্তি লাভ করিবে। আমরা সতৃষ্ণ নয়নে সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি যে দিনে সুশিক্ষিত জনসমাজ পাইয়া দেশহিতৈষীর ধর্ম্ম-প্রচারকের ও ধর্ম্ম-সংস্কারকের গুরুতর পরিশ্রম লঘু হইয়া আসিবে এবং সমগ্র জনসমাজকে তাঁহারা স্বল্পায়াসে কর্ত্তব্যের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর করিতে সক্ষম হইবেন।

---

## প্রার্থনা।

আমি কি ভুলিয়া আছি! না তা কভু নয়,
তোমাতেই পরিপূর্ণ সারা এ হৃদয়।
হৃদয় শোণিতে মোর নিঃশ্বাস প্রবাহে
তোমার পরশ শান্তি দিবানিশি বহে।
জাগরণে অচেতনে কার্য্যে বা হেলায়,
তোমারে হৃদয় মাঝে রেখেছি জাগায়।
আমার দুর্ব্বল মন কত শত বার,
আলো না দেখিয়া শুধু দেখে অন্ধকার।
কিন্তু তুমি হে দেবতা জাগ্রত মহান,
তখনি করিছ শান্ত এ অশান্ত প্রাণ,
অতৃপ্তি অভাব নাশি, নাশি মোহ ভয়
তোমারি করিয়া নেছ সারাটি হৃদয়।
তৃপ্তি, সুখ, নতি প্রাণ, কৃতজ্ঞতা ভরে
আপনি লুটিয়া পড়ে ও চরণ পরে।

---

## প্রার্থনা।

আজি দয়া কোরে জাগালে আমারে
জাগিয়া উঠেছি তাই।
বিশ্বের আনন্দ পরশ হিল্লোল
হৃদয় মাঝারে পাই।
কনক কিরণ ঢালিছে তপন,
ফুটেছে কুসুম বিচিত্র বরণ,
সুমঙ্গল গীতি গাহে বিহঙ্গম
কাহার করুণা চাই।
তোমার করুণা জাগিছে অন্তরে,
তোমারে চাহিছে মন।
তুমি আছ দেব কোথা কোন দূরে
তবু এ কি আকর্ষণ!
অসীম অনন্ত সুনীল আকাশে,
সলিলে কুসুমে সুরভি বাতাসে,
স্নেহ প্রীতি প্রেমে, তুমি আছ জেগে,
তুমি ছাড়া কিছু নাই।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী

## অর্জ্জুনের স্তব।

### অর্জ্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ॥
কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ॥
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্॥

গীতা, একাদশ অধ্যায়।

---

## অনুবাদ।

(নব-রত্নমালা হইতে উদ্ধৃত)

তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি জগতে প্রচার,
তব নামে পুলকিত অখিল সংসার,
রক্ষঃকুল শুনি ভয়ে দিগন্তে পলায়
সিদ্ধগণ ভক্তিভরে নমে তব পায়।
কেনই বা না নমিবে, তুমি যে মহান্,
ব্রহ্মার জনক তুমি সর্ব্ব গরীয়ান্।
সুরপতি, জীবগতি, জগত নিবাস,
সদসৎ-পরতর, পূর্ণ অবিনাশ।
তুমিই দেবাধিদেব, পুরুষ পুরাণ,
নিখিল বিশ্বের তুমি পরম নিধান।
সরবজ্ঞ, জানিবার বস্তুও হে তুমি,
অনন্ত-স্বরূপে ব্যাপ্ত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ভূমি।
অনল, অনিল, যম, শশাঙ্ক, বরুণ,
প্রজাপতি পিতামহ, চাহ সকরুণ।
নমি আমি কর জোড়ে, নমি শতবার,
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রভু পদে করি নমস্কার।
সম্মুখে পশ্চাতে, হরি, করি নমস্কার,
সর্ব্বদিকে প্রণিপাত চরণে তোমার।
তুমি হে অনন্ত বীর্য্য, অমিত বিক্রম,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পুরুষ পরম।
হেন বিশ্বরূপ তব মহিমা অপার,
প্রমাদ, প্রণয় বশে না জানিয়া সার।
সখা জ্ঞানে বলিয়াছি আমি কত বার
"ওহে কৃষ্ণ! হে যাদব! সখা হে আমার!"
অবজ্ঞায় পরিহাস করিয়াছি কত,
সমক্ষে পরোক্ষে করি অপরাধ শত,
আহার, বিহার শয্যা, ভোজনে বা কভু,
নিজগুণে ক্ষম তাহা এমিনতি, প্রভু!
লোক-চরাচরে তুমি পিতার সমান,
তুমি হে জগত-বন্দ্য গুরু গরীয়ান,
কেহ না সমান তব অধিক কোথায়,
তোমার মহিমা ভাতি ত্রিভুবনে ভায়।
অতএব নমি, দেব, প্রণত শরীরে,
তোমার প্রসাদ, প্রভু মাগি অশ্রুনীরে।
পিতা পুত্রে ক্ষমে যথা, প্রণয়ী প্রীয়ায়,
সখায় যেমতি সখা, ক্ষম গো আমায়।

# মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র ভারতের যে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমরা যতই আলোচনা করি, স্তম্ভিত হইয়া যাই। অবশ্য রাজা রামমোহন রায় সকলেরই পথ প্রদর্শক। রামমোহন রায়ের মত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বিগত কয়েক শতাব্দীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিদিকে ঘোর নিবিড় অন্ধকার, বেদ-উপনিষৎ বঙ্গদেশ হইতে একপ্রকার বিতাড়িত, চারিদিকে প্রতিকূল অবস্থার সমাবেশ, তাহার ভিতর হইতে রামমোহন চতুষ্পাটীতে বসিয়া নহে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন নিজের চেষ্টায় বেদ-উপনিষদের সন্ধান লইলেন, বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, বিবিধ হিন্দু-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, মুসলমান শাস্ত্র পাঠ করিলেন, অনেকানেক ভাষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন এবং তাহাতেও নিরস্ত না থাকিয়া একেশ্বরবাদ ঘোষণা করিলেন, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার সরস হৃদয় হইতে ব্রহ্মসঙ্গীত যাহা উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে বৈরাগ্যের বীজ শ্রোতার অন্তরে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি যে অঙ্কুর উদ্গত দেখিয়া এখানকার বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লাভ করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মত সাধকের অভাবে তাহা অকালে শুষ্ক হইয়া যাইত। কি আশ্চর্য্য যুগান্তর রামমোহন প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন! বর্ত্তমান সময়ে বসিয়া তাঁহার সৎসাহসের কণামাত্র ধারণা করিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। রাজা রামমোহন না জন্মিলে যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভ্যুত্থান হইত না, একথা যেমন সত্য, ইহা তেমনি সত্য যে দেবেন্দ্রনাথের অভাবে রামমোহন রায়ের প্রবর্ত্তিত বিধান কিছুতেই বিকাশ প্রাপ্ত হইত না; যদি বা বিকাশ পাইত, পূর্ণ এক শতাব্দীর অধিককাল বিলম্ব ঘটিত।

রামমোহনরায়ের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর পুনঃ প্রকাশের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু ও স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর নিকট বিশেষ ঋণী। রামমোহন রায়ের কার্য্যের বিকাশ বহুল পরিমাণে তাঁহার রচিত গ্রন্থে, কিন্তু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকের কার্য্যাবলী যেমন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রে নিনাদিত, তাঁহাদের মহত্ব বিঘোষিত, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনব্যাপী কর্ম্ম সেরূপ কোন সংবাদপত্রে বিঘোষিত নহে। তিনি আত্ম-প্রশংসা কোন কালেই ভাল বাসিতেন না; উহা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত সেরূপ সংবাদপত্রের বিদ্যমানতা ছিল না। মহর্ষি তাঁহার মৃত্যুর কতকাল পূর্ব্বে নিজজীবনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু পাছে আত্মঘোষণা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি অনেক দিন ধরিয়া উহা বাহিরে প্রকাশিত হইতে দেন নাই। সাধারণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে তিনি তাহা সাধারণের ভিতরে বহির করিবার আদেশ দেন। শ্রদ্ধেয় কেশব বাবুর প্রতিভার বিকাশ মহর্ষি হইতে। কেশব বাবু মহর্ষির সহিত মিলিত না হইলে বুঝি বা তাঁহার বিকাশ ধর্ম্মের দিকে জগতের সমক্ষে এত শীঘ্র হইত না। আত্মসম্মানের দিকে মহর্ষির এতই দৃষ্টি ছিল, পরকে তিনি এতই সম্মান দিতেন, যে পাছে ইঙ্গিতে কেশব বাবু বা তাঁহার দলস্থ কাহারও বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে হয়, তাই তিনি আপনার "আত্মজীবনীর" কাহিনী অসময়ে অকালে পরিসমাপ্ত করিলেন। কেশব বাবুর সহিত মিলনের কথা আনন্দের সহিত লিপিবদ্ধ করিলেন, তাঁহার সহিত মতভেদ জনিত পার্থক্যের কথা একেবারেই বলিলেন না। সত্য সত্য সেই মধ্য-বয়সে কিছু মহর্ষির জীবনব্যাপী কার্য্যের অবসান হয় নাই; তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, অথচ সে সকল বিষয়ের কথা বিন্দুমাত্র উল্লেখ না করিয়া তুষ্ণিম্ভাব ধারণ করিলেন। তিনি সকল সম্মান সকল প্রশংসা ঈশ্বরকে প্রদান করিতেন, আত্মপ্রচারদোষে কখনই তিনি কলঙ্কিত নহেন। যেরূপ উৎসাহের সহিত মহর্ষি কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, যে স্থিরতা ধীরতা আত্মসংযম ও অনন্যসাধারণ বৈরাগ্যের সহিত সাধনা করিয়াছেন, যাঁহারা তাহা লক্ষ্য করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জীবিত নহেন। আজকালকার লোক তাঁহার কর্ম্মঠ জীবনের অশেষ কার্য্যের সুনিপুণতা দর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই; যাহা কিছু দেখিয়াছেন তাহাতেই তাঁহারা বিমুগ্ধ। তাঁহারা সাধনারত আত্মরতি স্থবির মহর্ষিকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা যুবক বা প্রৌঢ় মহর্ষির কার্য্যাবলী সন্দর্শন করেন নাই, কিন্তু যাহা কিছু দেখিবার অবকাশ পাইয়াছেন, তাহাতেই স্তম্ভিত।

মহর্ষি নিজ হস্তে যে আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের অমূল্য সম্পত্তি। যাঁহারা অধ্যাত্ম জগতে বিচরণ করিয়া পরলোকের জন্য পাথেয় সংগ্রহ করিতে চান, মহর্ষির জীবন ও তাঁহার রচিত "আত্মজীবনী" তাঁহাদিগকে সে সন্ধান দিবে। আপনার দীক্ষা দিন স্মরণ করিয়া তাহাকে মহিমান্বিত করিতে, বোলপুরে শান্তিনিকেতনের মত মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া নীরবে ধর্ম্মের দিকে সকলকে নিঃশব্দে আহ্বান করিতে কয়েকজন লোকের প্রবৃত্তি জন্মে?

মহর্ষির এক একটি কার্য্য যদি আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, আমরা তাহাতে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইয়া যাইব।

মহর্ষির কার্য্য-জীবনের সমসাময়িক লোক প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। দুই এক জন যাঁহারা জীবিত থাকেন, তাঁহারাও জরাজীর্ণ। মহর্ষির ব্যাকুল জীবনের প্রকৃত চিত্র দেখিবার উপায় অতি অল্পই রহিয়াছে। সেদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহর্ষির কয়েকখানি চিঠি "পত্রাবলী" নাম দিয়া বাহির করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পত্র কয়েকখানিমাত্র হইলেও উহাতে মহর্ষিহৃদয়ের উদারতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

মহর্ষির আত্মজীবনী কেবলমাত্র বঙ্গভাষায় থাকায় ভারতের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী উহার ইংরাজি অনুবাদ দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সি, এস, উহার অপূর্ব্ব অনুবাদ বাহির করিয়াছেন। তাহা আমরা গত বারে উল্লেখ করিয়াছি। সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষিজীবনের অনেকগুলি কথা গ্রন্থ-মুখে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহার সারাংশ নিম্নে দিলাম। বলা বাহুল্য শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র বাবু মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি বলিতেছেন "আমার পিতা ১৮১৭ সালে জন্ম পরিগ্রহ করেন। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রথম শিক্ষা; পরে তিনি হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন। তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথের পুত্র। প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনের পূর্ব্ব হইতে ঈশ্বরের জন্য পিপাসা তাঁহাতে আসিয়া পড়িল। তিনি ১৮৩৯ সালে তত্ত্ববোধিনী-সভা স্থাপন করিলেন; তাহার পরে তাঁহারই উদ্যোগে তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার প্রকাশ; তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ। তিনি আরও কয়েক জনের সঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৪৪ সালে মহর্ষি তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। পর বৎসর বেদাধ্যয়নের জন্য তিনি চারি জন যুবককে কাশীতে প্রেরণ করেন। সুবিখ্যাত পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৪৫ সালে খ্রীষ্টীয় পাদরীগণের সহিত ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ তিনিই নিরূপণ করেন। তিনি মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, ঢাকা, রংপুর, কৃষ্ণনগর, প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করান। আদি-ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া এই সকল শাখা-ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে তাঁহার জীবনের প্রায় বার বৎসর কাটিয়া যায়। ১৮৪৬ অব্দে তাঁহার পিতা দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার শ্রাদ্ধে অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান করেন। দ্বারকানাথের মৃত্যুতে পিতার ঋণজালের পরিমাণ প্রায় এক কোটী টাকা এবং প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ টাকা। তিনি অমানুষিক ধৈর্য্যের সহিত অতি সামান্যমাত্র টাকা নিজ পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সম্পত্তির দ্বারা অনন্যসাধারণ সহিষ্ণুতা ও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা পিতার প্রভূত ঋণ পরিশোধ করেন। ইহাতেই তাঁহার নাম সত্যের জন্য সুবিখ্যাত হইয়া উঠে।

মহর্ষির পিতা, মৃত্যুর পূর্ব্বে অনেককে অনেক টাকা দিবার জন্য অঙ্গীকার করিয়া যান, তাহা অপরিশোধিত অবস্থায় ছিল। মহর্ষি পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে কেবল মাত্র কলিকাতা দাতব্য-সভাতেই সুদ ছাড়া এক লক্ষ টাকা প্রদান করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে মহর্ষি দেশবিদেশ প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থান লাহোর, মূলতান, অমৃতসর, রেঙ্গুনে গমন করিয়া, যেখানে সম্ভব, ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৫৬ সালে সর্ব্বপ্রথমে হিমালয়ে গমন করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিমলার নিকটস্থ স্থানে যাপন করেন। সেখানে কেবলই পাঠ ও ধ্যান-ধারণায় তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। সিপাহি-মিউটিনির অব্যবহিত পরেই তিনি সমুন্নত আত্মা লইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণে মন প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। "ব্যাখ্যান" এই সময়েই তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়কন্দর হইতে বিনির্গত হইয়া শ্রোতৃবৃন্দকে বিমোহিত করিতে থাকে। আমি (সত্যেন্দ্র বাবু) তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতাম। আমার পিতার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় বলিতে গেলে ১৮৫৯ হইতে। এই সময়ে কেশব বাবু আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হয়েন। আমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া পিতার সমীপে লইয়া যাই। ১৮৬২ সালে কেশব বাবুর পত্নী আমাদের বাটীতে আসিয়া কিছুদিনের জন্য অবস্থান করেন। কেশব বাবুর সহিত মিলিত হইয়া মহর্ষি ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। কেশব বাবু ইংরাজিতে এবং পিতা বঙ্গভাষায় বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬২ সালে কেশব বাবু আচার্য্য পদে বরিত হয়েন এবং আমার পিতা প্রধান আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হয়েন। কিন্তু কেশব বাবুর সহিত এই যে মিলন, তাহা স্থায়ী হয় নাই। আমার পিতা উপনিষদের দারুণ পক্ষপাতী, সামাজিক সংস্কার ও জাতিভেদ উচ্ছিন্ন করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতবর্ষই সকল প্রকার পবিত্রতার আকর বলিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল। ভারতবর্ষের ধর্ম্মগ্রন্থই তিনি পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিতেন। মধ্যবর্ত্তীতাবাদ ও গুরু-বাদ তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না। আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক, ইহাই তিনি শিক্ষা দিতেন। সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে তিনি ধীরতার সহিত অগ্রসর হইবার পক্ষপাতী ছিলেন। যিশুখৃষ্টের মধ্যবর্ত্তিতার ও ঈশ্বরত্বের তিনি বিরোধী ছিলেন। কিন্তু কেশব বাবুর মতামত অন্যরূপ ছিল। তিনি আমূল সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। সামাজিক সংস্কার অর্থাৎ সঙ্কর বিবাহ বিধবা বিবাহ, উপবীত ত্যাগ যখন অতিমাত্রায় দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, আমার পিতা তাহাতে সঙ্কুচিত হইলেন। আমার পিতার আদর্শ জাতীয়ভাব, কিন্তু কেশবের আদর্শ বিশ্বজনীন ভাব। কেশব বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে আলোক অধিকমাত্রায় বাইবেল হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি এবং তাঁহার দলস্থ অনেকে পরে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন, মিসনরিরা এইরূপ আশা পোষণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ভাবে কেশব বাবু পরিপুষ্ট। এই সকল কারণে আমার পিতার সহিত কেশব বাবুর বিচ্ছেদ

ঘটিল। ১৮৬৫র ফেব্রুয়ারি মাসে উভয়ে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। কেশব বাবু তাঁহার ব্রাহ্মসমাজের নাম ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজ দিলেন এবং এ সমাজের নাম আদি-ব্রাহ্মসমাজ হইল। আমার পিতার কার্য্যপ্রণালী সংশোধনের দিকে—আমূল পরিবর্ত্তনের দিকে ছিল না। ১৮৬৯ সালে ভারতবর্ষীয়-ব্রহ্মমন্দির বিনির্ম্মিত হইল। কেশব বাবুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটিলেও আমার পিতার প্রতি কেশব বাবুর ভক্তি ও শ্রদ্ধা কোন কালেই অবসন্ন হয় নাই।

কেশববাবুর সহিত বিচ্ছেদের পর হইতে আমার পিতার দৈহিক শক্তি বয়োধর্ম্মে হ্রাস হইতে লাগিল। অন্যান্য সুশিক্ষিত আচার্য্যেরা ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমার পিতা সকল বিষয়ে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ঈশ্বরের আদেশে নির্জ্জন সাধনে তিনি তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তিনি কয়েক বৎসর হিমালয়ে ও চুচুঁড়ায় ক্ষেপণ করিলেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময় কলিকাতায় অতিবাহিত হয়। তিনি ঋষি-জীবন অতিবাহিত করিলেন। ১৯০২ সাল হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভঙ্গ হইল। আমার ভগিনী সুকুমারী দেবীর বিবাহ অপৌত্তলিকভাবে সর্ব্ব প্রথমে ১৮৬১ সালে তিনিই সুসম্পন্ন করেন। তিনি অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান পদ্ধতি নিজে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইয়া সকলের নিকট হইতে শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ১৯০৫। ১৯এ জানুয়ারী তারিখে বেলা ১টা ৫৫ মিনিটের সময় স্বর্গধামে গমন করিয়াছেন"।

---

## সংগ্রহ।

### বিষ্ণুসংহিতা।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণের মহাপাতকীর মৃত্যুদণ্ড করিবে। ব্রাহ্মণকে শারীরিক দণ্ড না দিয়া দেহে চিহ্ন দিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। যাহারা কূট শাসন করে, যাহারা জাল করে, যাহারা বিষপান করায়, গৃহে অগ্নি দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, নরহত্যা করে, অধিক পরিমাণ ধান্য অপহরণ করে, সুবর্ণরজত অধিকমাত্রায় চুরি করে, যাহারা নীচ হইয়াও রাজ্য কামনা করে, যাহারা সেতু ভগ্ন করে, যাহারা দস্যুগণকে স্থান ও আহার প্রদান করে, যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য বা ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। * * গর্হিত মাংসবিক্রেতা, হস্তী অশ্ব ও উষ্ট্র-হন্তার একটি হস্ত ও একটি পদ ছেদন করিবে। গ্রাম্য পশুঘাতীর অর্থদণ্ড করিবে এবং পশুঘাতী পশুস্বামীর হত-পশুর মূল্য দিবে। পক্ষীঘাতী ও মৎস্য-ঘাতীরও অর্থদণ্ড করিবে। ফলোন্মুখ ও পুষ্পোন্মুখ বৃক্ষ ছেদন করিলে এবং মালতী মাধবী প্রভৃতি গুল্মলতা ছেদনে দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। প্রহারার্থ হস্ত বা পদ উদ্যত করিলে এবং বিনা রক্তপাতে দুঃখ উৎপাদন করিলে তাহারও দণ্ড আছে। উভয়নেত্রভেদী ব্যক্তিকে রাজা যাবজ্জীবন বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিবেন না। যে সকল ব্যক্তি প্রহারকাতর ব্যক্তির আহ্বানে সেই দিকে গমন না করে, অথবা যাহারা সে স্থান হইতে সরিয়া পড়ে তাহাদের প্রত্যেকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। গো অশ্ব, উষ্ট্র ও হস্তী অপহরণ করিলে রাজা চোরের এক হস্ত ও এক পদ ছেদন করিবেন। সূত্র কার্পাস গোময়, গুড়, দধি. তক্র, তৃণ, লবণ, মৃত্তিকা, পক্ষী, মৎস্য, ঘৃত, তৈল, মাংস, মধু, বংশপাত্র বা লৌহ ভাণ্ড অপহরণ করিলে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যের তিন গুণ অর্থদণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তু সকল অধিকারীকে ফিরাইয়া দেয়, রাজা তাহার ব্যবস্থা করিয়া পশ্চাৎ অপরাধীকে দণ্ড দিবেন। যাহাদিগকে মান্য দেওয়া উচিত, তাহাদিগকে মান্য না দিলে তাহার দণ্ড আছে। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত, তাহাকে আসন না দিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ ও ভোজন করা-ইলে তাহারও দণ্ড আছে। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াও ভোজনে যায় না, সে নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে দ্বিগুণ অন্ন ও তদ্ব্যতীত রাজদ্বারে অর্থদণ্ড দিবে। যে কম ওজন দেয় বা তদ্রূপ তুলাদণ্ড ব্যবহার করে, যে দেশান্তরগত পণ্য অধিক মূল্যে বিক্রয় করে, ক্রেতা ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে বিক্রেয় দ্রব্য তাহাকে প্রদান না করে তাহাকে দণ্ড দিবে। ক্রেতা ক্রীতদ্রব্য গ্রহণ না করিলে যদি তাহা বিনষ্ট হয়, তবে সে ক্ষতি ক্রেতারই হইবে। রাজনিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার দণ্ড আছে। নৌ-শুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি স্থলজ শুল্ক গ্রহণ করিতে পারিবে না। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, যতি, গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও তীর্থযাত্রীর নিকট নৌ-শুল্ক গ্রহণ করিলে তাহার দণ্ড হইবে। ঠিকা চাকর নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে চাকরী পরিত্যাগ করিলে সে দণ্ডিত হইবে। নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না করিয়া প্রভু বিনা দোষে ভৃত্যকে ত্যাগ করিলে, স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন দিবেন এবং রাজাও ঐরূপ স্বামীকে দণ্ড দিবেন। যে ব্যক্তি প্রকাশ্যভাবে পরদ্রব্য ( চোরাই হউক বা যাহাই হউক ) ক্রয় করিবে তাহাতে ক্রেতার দোষ নাই। তবে চুরি ধরা পড়িলে দ্রব্যস্বামী তাহা পাইবেন, ক্রেতার কিছুই হইবে না। যদি অপ্রকাশ্যভাবে হীনমূল্যে তৃতীয় ব্যক্তি তাহা ক্রয় করে, তবে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই চৌরবৎদণ্ড। গচ্ছিত দ্রব্য অপহরণ করিলে তাহার চৌরবৎ দণ্ড। যে ব্যক্তি সীমা-চিহ্ন বিলুপ্ত করে, সে দণ্ডিত হইবে। রাজা মিথ্যা সাক্ষীর সর্ব্বস্ব হরণ করি-বেন। উৎকোচজীবীরও ঐরূপ করিবেন। আয়ুর্ব্বেদ অনভিজ্ঞ যদি মিথ্যা চিকিৎসা করেন, তাহারও দণ্ড আছে। যদি কেহ মূল্য দিয়া কোন বস্তু ভোগ করে তবে কে তাহারই। যে দ্রব্য পিতা যথাবিধ ভোগ করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে পুত্রকে কিছু বলিতে পারিবে না। যে ভূমি যথাবিধি তিনপুরুষ ভোগদখল করিয়া আসিতেছে, লেখা অর্থাৎ দলিল না থাকিলেও চতুর্থ-পুরুষ সেই ভূমি প্রাপ্ত হইবে। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী, হস্তী, হিংসা করিতে উদ্যত দেখিলে তাহাদিগকে বধ করিলে দোষ নাই; গুরু বালক, বৃদ্ধ, শাস্ত্রবেত্তা

ব্রাহ্মণ আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে, কেন না আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। (১) খড়্গাঘাত, (২) বিষ-প্রয়োগ, (৩) গৃহে অগ্নিদান, (৪) শাপদান, (৫) অভিচার, (৬, রাজসমক্ষে মিথ্যা কুৎসা, (৭) ভার্য্যাপহরণ করিতে যাহারা উদ্যত, এই সপ্তবিধ লোকই আততায়ী। অন্য অপরাধ, শাস্ত্রে যাহার বিধান নাই, রাজা ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাহার দণ্ড প্রদান করিবেন। যে রাজ-কর্ম্মচারী দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদান করে, এবং যে অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড দেয়, তাহাকে দণ্ডনীয় বা দণ্ডিত ব্যক্তির দ্বিগুণ শাস্তি হইবে। যাহার নগরে চোর নাই, পরস্ত্রীগামী পুরুষ নাই, দুর্ব্বাক্যকারী লোক নাই, স্তেয়াদি কার্য্যে সাহসিক দুষ্টলোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোকে গমন করেন।

উপরে কয়েকটি মাত্র অপরাধের দণ্ড লিখিত হইল। অবশ্য ব্রাহ্মণের শাস্তি সম্বন্ধে তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উহা নিতান্তই স্বাভাবিক। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রাহ্মণ জাতি স্বতই নিষ্ঠাবান, তাহাদের ভিতরে প্রাচীন সময়ে দুর্নীতির ভাব ও অপরাধ সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল। তাহা সত্বেও কোন্ কোন্ অবস্থায় ব্রাহ্মণ বধ্য ও দেশ হইতে নির্ব্বাসনযোগ্য, উপরে তাহার পরিচয় দিলাম। এতদ্ভিন্ন অপরাপর অপরাধের দণ্ডের মাত্রা কিরূপ, তাহা যাঁহারা জানিতে চান, বিষ্ণু- সংহি-তায় পরিচয় পাইবেন। ইংরাজের প্রথম আমলে যখন কোন ইংরাজ দেশীয়দিগের উপরে ঘোর অপরাধে লিপ্ত হইত, তাহার বিশেষ দণ্ড হইত না। ইংরাজ- বণিক-সম্প্রদায় তাহাকে নিজ হইতে খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইয়া দিতেন।

প্রাচীন হিন্দুরাজ্যে দেওয়ানি, ফৌজদারি, তামাদি চুক্তি আইন বয় স্বত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরূপ আইন প্রচ-লিত ছিল, বর্ত্তমান প্রস্তাব হইতে পাঠকগণ তাহার কতকটা আভাস পাইবেন।

---

## নানা কথা।

**নিরামিষ ভোজন।**—মুক্তি-ফৌজের স্যোসেল গেজেট নামক পত্রিকায় প্রকাশ যে যাহারা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী, তাহাদের মধ্যে নিরামিষ-ভোজন প্রবর্ত্তন করায় আশাতীত ফল পাওয়া গিয়াছে। পরীক্ষায়, জানা গিয়াছে যাহারা মাংসভোজী তাহাদের প্রবৃত্তি মদ্যপানের দিকে। ফল ও নিরামিষ আহার প্রদান করিলে মদ্যপায়ীর মদিরার প্রতি বিতৃষ্ণা আপনা হইতে অতি সত্বরই আইসে। বিজ্ঞানমূলক ধর্ম্ম পত্রিকা, অক্টো-বর সংখ্যা।

**অভিমত।**—ডাক্তার H. C. Menkel সাহেব যিনি মসৌরী সেনিটেরিয়মের অধ্যক্ষ হইতেছেন, তিনি বলেন যে মাংসাহার ও মদিরাপানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ রহিয়াছে, আমি স্বাস্থ্যনিবাসে থাকিয়া তাহার প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। যেরূপ আহারে রক্তে ও পাকস্থলীতে উত্তেজনা আসিতে পারে, এইরূপ খাদ্যে মদিরার জন্য পিপাসা স্বাভাবিক বর্দ্ধিত হয়। মাংসাহারেই এইরূপ উত্তেজনা বড়ই বৃদ্ধি পায়। তাঁহার এই অভি-জ্ঞতার ফল উপরোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

**মদিরা-বিরতি।**—ইংলণ্ডের বারমিংহাম নগরে Good Templars lodge নামক মদিরা নিবারণী সভা, জোসেফ মেলিন্স কর্ত্তৃক ১৮৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানা স্থানে ইহার প্রায় চারি সহস্র শাখা আছে। সভ্য সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। প্রতি সপ্তাহে ঐ সকল সভার অধিবেশন হয়। ইহাদের কার্য্যকলাপ কেবলমাত্র বক্তৃতাতেই অবসান হয় না। সভ্যগণ প্রতি গৃহস্থের বাটীতে গিয়া মদিরা হইতে বিরতির জন্য সকলকে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের উৎসাহ ও অধ্যবসায় ফলে যে সকল নরনারী সর্ব্ববিধ মাদক সেবন হইতে বিরত হইবার প্রতিজ্ঞা লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যুবকের সংখ্যা প্রায় ষোল লক্ষ ও অপরিণত বয়স্কের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। নৌসেনা ও অপরাপর সেনাদলের মধ্যে এইরূপ অনেকগুলি lodge সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং দিন দিন সুফল প্রদান করিতেছে।

---

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रयं सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्यं साधनञ्च तदुपासनमेव।"
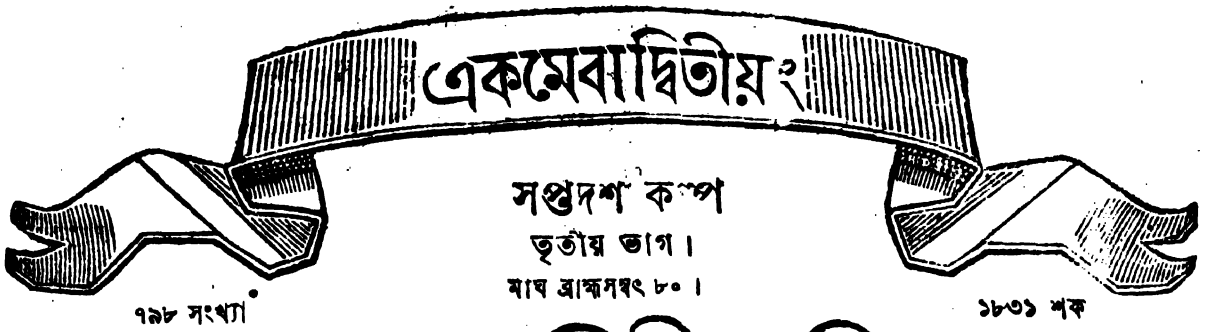
## শান্তিনিকেতনের ঊনবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব।

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির পদ্মগুলিকে দিকে দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই বিশ্ব উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা কর্‌লে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই! কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফল-ভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে—সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে, কিসের জন্যে? না যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধর্‌চে—সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরচ্চে না—সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্‌ঘাটন করে দেখি

তবে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্চে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফল্‌চে; এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফল্‌তেই চল্‌বে।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন লোকই বা জান্‌ত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘট্‌ল এবং আজ্‌কেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেল্‌তে পারেনি সেই একটি দিনের মধ্যেই এ'কে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তারপরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল প্রসব করচে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘট্‌চে এবং মিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব কোথাও থাকচে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তটিকে কখন্ লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না-দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিনকার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে উঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেল্‌তে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ তুমি আমাতে প্রকাশিত হও। তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখ্‌তে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্ব্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

> যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
> ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে,

এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পান তখন তিনি আর গোপনে থাক্‌তে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর পর্দ্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্চে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা অহংকেই বড় করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহঙ্কার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহংয়ের দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পল্‌তের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব্ব করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পল্‌তের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পল্‌তে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাক্‌তে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখ্‌তে পায়। সে ত কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম্ম নিত্য হয়ে ওঠে—তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে' আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তর-কঠিন আচ্ছাদন হতে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুলচে।

তিনি আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের

সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জ্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে জায়গায় বড় এসে দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না—এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্চে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগসাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাক্‌লে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জান্‌ব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান কর্‌ব—পরস্পরকে খর্ব্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলাঠেলি করতে থাক্‌ব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতংরূপে বিরাজ কর্‌চেন তাঁকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধ ভাবে জাগিয়ে রাখ্‌বার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্চে অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতেছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতি-

দিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্ম্মল করে দিচ্চে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্চে—তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্চে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীরতর হয়ে উঠচে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্চে—এবং যে জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দ ধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তরধারায় দিক্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্চে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুন্‌তে পাচ্চে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্যময় সৃষ্টির কাজ চল্‌চে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্চে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্ম্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করচে—কেবলি বল্‌চে তিনি আমার প্রাণের আরাম, আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্চে না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করচে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্চে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দমুহূর্ত্ত এখানকার সূর্য্যোদয়কে, সূর্য্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুল্‌চে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি কর্‌তে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বস্‌লেন—সেই দিনটি আর মর্‌লনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আট্‌কা পড়ে গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুল্‌তে লাগল—যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্ম্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর

প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মান্‌তে চায় না তখন সেই অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্ব্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য, একটি পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার কর্‌চে না? নিশ্চয়ই কর্‌চে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত ঊষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায় কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সম্মুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুন্‌তে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুল্‌বে না? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফির্‌বে, পাষাণ হৃদয়ও গল্‌বে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্য্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ কর্‌চে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি যা আলো হয়ে আমাদের সাম্‌নে নানা রঙের ছবি আঁক্‌চে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান কর্‌চে, যা বল্‌চে "আমি জল," বলে, আমাদের স্নান করাচ্চে, যা বল্‌চে আমি স্থল, বলে আমাদের কোলে

করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জান্‌তে পারি—তখন তার ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশী করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্চে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখ্‌তুম, কানে শুন্‌তুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে। সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখিতে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাক্‌লে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্ম্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে; সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্ম্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্ম্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকবে!

---

## ভূকম্পন।

ঝড়বৃষ্টি এবং বৈদ্যুতাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাতে আমাদের যে ক্ষতি করে, ভূমিকম্পে তাহা অপেক্ষা বড় অল্প ক্ষতি হয় না। বড় বড় ঝড়ের আগমন বার্ত্তা আজকাল বৈজ্ঞানিক উপায়ে অন্ততঃ কিছু পূর্ব্বে জানা যায়। সুতরাং একটু সতর্ক হইবার অবকাশ থাকে। কিন্তু ভূমিকম্পের আগমন একেবারে আকস্মিক। ইহাতে মেঘাড়ম্বর বা ঘনঘটা নাই, গর্জ্জন বর্ষণ নাই। যখন সকলে নিশ্চিন্ত, হয় তো গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন, সেই সময়ে হঠাৎ ভূমিকম্প উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়। ইহার স্থানাস্থান বা কালাকাল নাই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ ভূমিকম্পবহুল স্থানগুলির নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং চন্দ্র-সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কের আকর্ষণের সহিত ভূমিকম্পের দূর সম্বন্ধের কল্পনাও করিয়াছেন, কিন্তু প্রায়ই নির্দ্দিষ্ট স্থান কাল অনুসারে ভূমিকম্প হয় না। মানচিত্রের যে সকল অংশে ভূমিকম্পের সম্ভাবনা-জ্ঞাপক কালো রেখা অঙ্কিত নাই, সেই সকল স্থানও এখন ভূমিকম্পের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতেছে না!

বহুদিন হইল আমার এক বৃদ্ধা ধাত্রীর নিকট গল্প শুনিয়াছিলাম, চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সূর্য্যের উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনাগুলি স্বর্গের ব্যাপার। স্বর্গের সহিত হিন্দু-শাস্ত্রের সম্বন্ধটা খুব ঘনিষ্ঠ। কাজেই শাস্ত্রকারগণ গ্রহণাদির কাল অনায়াসেই নিরূপণ করিতে পারেন। ভূমিকম্পের উৎপত্তি পাতালে। সুতরাং খৃষ্টান্ মুসলমান্ প্রভৃতি যে সকল জাতি মৃতদেহ মাটিতে পুঁতিয়া পাতালের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে, ভূমিকম্পের রহস্য আবিষ্কার করার অধিকার কেবল তাহাদেরি আছে। বৃদ্ধা কথাগুলি যে ভাবে বলুক না কেন, এখন দেখিতেছি তাহার কথার সার্থকতা আছে। আমাদের দেশের প্রাচীন পণ্ডিতগণ চন্দ্রসূর্য্য এবং গ্রহ উপগ্রহাদির গতিবিধি অতি সূক্ষ্মভাবেই গণনা করিতে পারিতেন। বলা বাহুল্য তাঁহারা আধুনিক জ্যোতিষী-দিগের ন্যায় বড় বড় দূরবীন্ বা পর্য্যবেক্ষ-ণের উপযোগী অপর কোন যন্ত্র ব্যবহার-করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা যে সকল অত্যাশ্চর্য্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অদ্ভুত। ভূমিকম্প কেন তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই জানি না। কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ব্যাপারটির আলোচনা করিলে হয় তো তাঁহারা অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিতেন। এখন যাঁহারা ভূকম্পন সম্বন্ধীয় গবেষণা করিয়া ইহার কালাকাল নির্ণয়ের উদ্যোগ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই পাতালের সহিত সম্বন্ধ আছে,—প্রায় সকলেই খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী।

আজকাল ভূমিকম্প সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে, কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও তাহার লেশমাত্র ছিল না। সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো মাল্‌টা পূর্ব্ববঙ্গ এবং ধর্ম্মশাল প্রভৃতি স্থানের বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির পর, যেন বিষয়টি বৈজ্ঞানিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এখন নানা দেশের বড় বড় সহর মাত্রেই ভূকম্পনবীক্ষণ যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুযোগ্য বৈজ্ঞানিকগণ সেই সকল স্থানে বসিয়া হাজার হাজার মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের ভূমিকম্পের পরিচয় গ্রহণ করিতেছেন। এই সকল পর্য্যবেক্ষণের ফলে, ভূকম্পন সম্বন্ধে যে সকল বৈজ্ঞানিক

কুসংস্কার ছিল তাহা একে একে দূর হইয়া যাইতেছে, এবং যে সকল স্থানে সত্যই প্রবল ভূমিকম্পের আশঙ্কা আছে, তাহাও জানা যাইতেছে। এই নূতন আবিষ্কার-গুলিকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল সহরকে ভূমি-কম্পের অধিকারভুক্ত বলিয়া স্থির করি-তেছেন, এখন নূতন পদ্ধতিতে সেই সকল স্থানে গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। পূর্ব্বে বড় বড় ভূমিকম্পে যে প্রকার লোকক্ষয় হইত, সম্ভবতঃ এখন নিশ্চয়ই আর সে প্রকার হইবে না। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভূমিকম্পকে আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের কোটায় ফেলিতেন। বোধ হয় এইজন্যই তাঁহারা ইহার বিশেষ আলোচনা হইতে বিরত ছিলেন। ভূকম্পনবীক্ষণ ( Seismograph ) যন্ত্রের উদ্ভাবনের পর এই কুসংস্কারও দূর হইয়া গিয়াছে। বায়ুর প্রবাহ, মেঘের উৎ-পত্তি যেমন সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপার, বৈজ্ঞানিকগণ ভূকম্পনকেও ঠিক সেইরূপই দেখিতেছেন। হিসাবে দেখা যায়, প্রতি-বৎসর পৃথিবী প্রায় ছয়শতবার কাঁপিয়া উঠে। কাজেই এত বৃহৎ এবং সুলভ প্রাকৃতিক ব্যাপারকে এখন আর উপেক্ষা করা চলিতেছে না। এই জন্য ভূকম্পন সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাকে অধুনিক বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত করিবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জগ-তের সর্ব্বাংশেই দেখা যাইতেছে। কেবল পর্য্যবেক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহ দ্বারা ঝড় বৃষ্টির উৎপত্তি নিবৃত্তির কালের অনেক রহস্য ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং সেই পদ্ধতিক্রমে যে ভূমিকম্পের কালা-কাল এবং স্থানাস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যাইবে না, একথা কেহই বলিতে পারেন না।

সম্প্রতি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ( Atto Macioni ) ভূমিকম্পের কালনিরূপণের জন্য যে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। অধ্যাপকটি নিতান্ত অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নহেন। নানা বৈজ্ঞা-নিক গবেষণার জন্য পণ্ডিতমহলে তাঁহার বেশ সুনাম আছে। সুতরাং তাঁহার আ-শ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অনায়াসেই বলা যায়, ভূকম্পের আগমনবার্ত্তা জানা বোধ হয় এখন আর কঠিন হইবে না।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যাপকটি কেবল পরিবীক্ষণ দ্বারা ভূকম্পনের আগমন সংবাদ জানিবার কৌশলটি জানিতে পারিয়াছিলেন। আমা-দের ভারতবর্ষ ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি আকস্মিক প্রাকৃতিক উৎপাতের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। আকাশ বেশ মেঘনির্মুক্ত, হঠাৎ পশ্চিমে একখণ্ড মেঘ উদিত হইয়া প্রকাণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সূচনা করিয়া দিল। এ প্রকার ঘটনা অপর দেশে দুর্লভ। যাঁহারা প্রকৃ-তির এইসকল লীলা একটু মন দিয়া পর্য্য-বেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখি-য়াছেন, চঞ্চল হইবার পূর্ব্বেই প্রকৃতি যেন তাহার স্বাভাবিক ভাব ত্যাগ করিয়া অস-ম্ভব গম্ভীর হইয়া পড়ে। বৃহৎ ঝড়ের পূর্ব্বিকার এইপ্রকার অস্বাভাবিক শান্ত-ভাব অতি সুস্পষ্ট বুঝা যায়। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণীগণ, ঝড়বৃষ্টির সময় মানুষের ন্যায় নিরাপদস্থান সহজে খুঁজিয়া লইতে পারে না। কাজেই প্রকৃতির পরি-বর্ত্তনগুলির ফলাফল বুঝিয়া লইয়া তাহা-দিগকে চলাফেরা করিতে হয়। এই জন্য আকস্মিক প্রাকৃতিক উপদ্রবের সম্ভাবনা ইহারা নানা প্রকার লক্ষণ দেখিয়া অনা-য়াসে বুঝিয়া লইতে পারে। দৈনিক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়া যখন আসন্ন ঝড় বা বৃষ্টির সম্ভাবনা আমরা ঠিক করিয়া উঠিতে

পারি না, পক্ষিগণ তাহা অনায়াসে বুঝিয়া নিজেদের বাসার দিকে ছুটিতে আরম্ভ করে।

অধ্যাপক ম্যাকিয়নি বলিতেছেন, কেবল ঝড়বৃষ্টি নয়, ভূমিকম্পেরও আগমনের পূর্ব্বে এমন কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়ে যাহা আমরা বুঝিতে পারি না; কিন্তু পশুপক্ষীরা অনায়াসে বুঝিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে থাকে। ম্যাকিয়নি সাহেব প্রথমে এইগুলির বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

বড় ভূমিকম্পের আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে প্রায়ই কতকগুলি মৃদুকম্পন দেখা দেয়। ইতর প্রাণিগণ তাহাদের তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়গুলি দ্বারা সেগুলিকে অনুভব করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করে, এই কথাই প্রথমে ম্যাকিয়নি সাহেবের মনে হইয়াছিল। কিন্তু ভূমিকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করায় তাঁহাকে ঐ অনুমান ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যন্ত্রে মৃদু ভূকম্পনের সুস্পষ্ট রেখাপাত হইতেছে, অথচ পশুপক্ষিগণ নির্ভীক মনে বিচরণ করিতেছে, এপ্রকার দৃশ্য তিনি একাধিক বার সুস্পষ্ট দেখিয়াছিলেন। কাজেই ভূকম্পনের পূর্ব্বলক্ষণ আবিষ্কারের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রবল ভূমিকম্পের অনেক পূর্ব্বে যে সকল মৃদুকম্পন সুরু হয়, তাহা ভূস্তর এবং ভূপ্রোথিত শিলাগুলির মধ্যে এক সংঘর্ষণ উপস্থিত করে। ঘর্ষণ হইলেই তাপ ও বিদ্যুতের উৎপত্তি অনিবার্য্য। কাজেই ভূমিকম্পের প্রবল আক্রমণের পূর্ব্বে ভূতল বিদ্যুৎ-যুক্ত হওয়া কোনক্রমেই বিচিত্র নয়। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া মনে করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ পশুপক্ষিগণ ভূকম্পনের পূর্ব্বক্ষণে ঐ স্তরের ঘর্ষণজাত বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয় সতর্ক হইয়া পড়ে।

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগকে বিদ্যুতের যুগ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। অতি সামান্য বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানিয়া তাহার কার্য্যাদি পরীক্ষা করিবার অনুরূপ নানাপ্রকার যন্ত্র এখন অতি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারেও সজ্জিত পাওয়া যায়। সুতরাং ভূকম্পনের পূর্ব্বকার মৃদুকম্পন দ্বারা যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, তাহার অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ম্যাকিয়নি সাহেবকে কোন নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে হয় নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তারহীন টেলিগ্রাফ (Wireless Telegraphy) যন্ত্রে যেমন বহুদূরের বৈদ্যুতিক সঙ্কেত গ্রহণ করা যায়, সেইপ্রকার কোন এক উপায়ে নিশ্চয়ই ভূকম্পনের পূর্ব্বকার বিদ্যুতের পরিচয় পাওয়া যাইবে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, তারহীন টেলিগ্রাফ্ যন্ত্রের আকার প্রকার যতই জটিল হউক না কেন, যে মূল ব্যাপারটি লইয়া উহা গঠিত তাহা অতি সরল। সে সংবাদ প্রেরণ করে, সঙ্কেত অনুসারে বিদ্যুৎ নিঃসরণ (Discharge) করাই তাহার কাজ। সাধারণ রুমক্রফস্ কয়েলের (Ruhmkorffs coil) মত কোন যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্য করা হইয়া থাকে। সর্ব্বব্যাপী ঈথরে তরঙ্গ তুলিতে তুলিতে যখন সেই নিঃসরণগুলি বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ছুটিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে যন্ত্রের ফাঁদে ফেলিয়া সঙ্কেত আদায় করা সংবাদ গ্রাহকের এক মাত্র কাজ। সংবাদ-গ্রাহক যন্ত্রের মূল ব্যাপারটিও অতি সহজ। যন্ত্রটি (Coherer) কতকগুলি লোহার গুঁড়ায় পূর্ণ রাখা হয়, এবং ব্যাটারির তারের দুই প্রান্ত সেই গুঁড়ার সহিত সংযুক্ত থাকে। সাধারণতঃ লোহার

গুঁড়ার ভিতর দিয়া ব্যাটারির বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পায় না। কিন্তু প্রেরকের যন্ত্র হইতে যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটিয়া আসে, তাহা গুঁড়ায় ঠেকিলেই ব্যাটারির বিদ্যুৎ লৌহচূর্ণের ভিতর দিয়া চলিতে স্থরু করে, এবং তরঙ্গের আগমন বন্ধ হইলে প্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। এই প্রকারে প্রেরকের যন্ত্র দ্বারা গ্রাহকের কলে যে সকল ক্ষণিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহার দ্বারাই প্রেরকের সঙ্কেতগুলিকে বুঝিয়া লওয়া হইয়া থাকে। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের পূর্ব্বকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব বুঝিবার জন্য ঐপ্রকার একটা কল (Coherer) পাতিয়া রাখিয়াছিলেন। বার্ত্তাবহ যন্ত্রের বিদ্যুৎ ভূস্তর দিয়াই সঞ্চলন করে। এই জন্য যন্ত্রটিকে মৃত্তিকা সংলগ্ন রাখা হইয়াছিল। ছোট বড় নানা ভূমিকম্পের লক্ষণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে দেখা গেল, কিন্তু ম্যাকিয়নির কলে তাহার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। ইহাতে তিনি হতাশ হন নাই। যাহাতে অতি মৃদু বিদ্যুতের লক্ষণ ধরা যায়, এপ্রকার একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং ভূমিকম্পের পূর্ব্বকার বিদ্যুৎ পৌঁছিলে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে, সেপ্রকার এক ব্যবস্থাও কলে রাখিয়াছিলেন।

বহুদিন কলের ঘণ্টার বিদ্যুতের সাড়া পাওয়া যায় নাই। ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রেও কোন মৃদু-কম্পনের রেখাপাত হয় নাই। ইহার পর গত ১১ই এপ্রিল তারিখে সহসা ঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সাধারণ ভূকম্পন-বীক্ষণ যন্ত্রে মৃদু কম্পনের চিহ্ন প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণটি অধ্যাপক ম্যাকিয়নি স্বয়ং সিয়ানা নগরের (Sienna) এক বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে পাঠ করিয়াছিলেন, সুতরাং উহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। কাজেই বলিতে হয়, ভূমিকম্পের কাল এখন হইতে আর অজ্ঞাত থাকিবে না। অন্ততঃ কয়েক মিনিট পূর্ব্বে যন্ত্র সাহায্যে ভূমিকম্পের আগমন সংবাদ জানিয়া আমরা সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিব।

জ্ঞানের সীমা নাই। সুতরাং এই ক্ষুদ্র প্রারম্ভ হইতে আমরা ভূকম্পন সম্বন্ধে যে আরো অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। ভারতের পূর্ব্ব সীমাস্থ আসাম প্রভৃতি স্থানগুলি ভূমিকম্পবহুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতিদিনই উহাদের কোন না কোন অংশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সুতরাং এইপ্রকার স্থানে ম্যাকিয়নি সাহেবের প্রদর্শিত পন্থায় পরীক্ষা আরম্ভ করিলে, সুফল প্রাপ্তির খুবই সম্ভাবনা। ভগবান মঙ্গলময়, তাঁহার প্রতি কার্য্যই মঙ্গলকে সার্থক করিবার জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া কার্য্য এবং মঙ্গলের যোগসাধন হইতেছে তাহা আমরা সহজে বুঝি না। ইহা স্থির করা সত্যই সাধনার বিষয়। গত ১৮৯৬ সালের যে বৃহৎ ভূমিকম্প আসাম প্রদেশ ও পূর্ব্ববঙ্গকে কাঁপাইয়াছিল, তাহা আধুনিক বৃহৎ ভূমিকম্পগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ইহার উৎপত্তি-তত্ত্ব আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে; এবং এইপ্রকার একটা বৃহৎ বিপ্লব দ্বারা প্রকৃতির কোন্ মঙ্গল কার্য্যটি সুসাধিত হইল, তাহাও অদ্যাপি কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ম্যাকিয়নি ভূমিকম্পের গবেষণা সম্বন্ধে যে নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছেন, হয় তো তাহাই কোন একদিন এই সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিবে।

---

## সত্য, সুন্দর, মঙ্গল,

### মঙ্গল।

(চতুর্থ উপদেশের অনুবৃত্তি)

নৈতিক ব্যাপারের আর একটি উপাদান হৃদয়ের ভাব।

এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিবৃত করিয়া আমরা এই জটিল নৈতিক ব্যাপারের বিশ্লেষণ শেষ করিব। এই হৃদয়ের ভাব; সমস্ত নৈতিক ব্যাপারের অনুসঙ্গী, এমন কি, প্রতিধ্বনি বলিলেও হয়। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য যোগ রহিয়াছে, হৃদয়ের ভাব সেই যোগের অনুভূতি মানব-আত্মায় আনিয়া দেয়। পাপ পুণ্যের নিয়মকে এই হৃদয়ের ভাবই সাক্ষাৎভাবে ও জ্বলন্তভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করে। এই হৃদয়ের ভাবই সমাজ-প্রতিষ্ঠিত দণ্ড-পুরস্কারের প্রমাণ-স্বরূপ। ইহাই ঐশ্বরিক দণ্ড-পুরস্কারের আভ্যন্তরিক আদর্শ। পরলোকের ভাব—স্বর্গের ভাব আমাদের হৃদয়েতেই প্রতিষ্ঠিত। স্বর্গ-কল্পনা করিবার সময় আমরা যেন আমাদের হৃদয়কেই স্বর্গে স্থাপিত করি।

কোন সৎকার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া (সেই সৎকার্য্যের কর্ত্তা আমিই হই কিংবা অন্যই হউক) আমার অন্তরে একটি সুখ অনুভব না করিয়া থাকিতে পারি না। সুন্দর পদার্থ দেখিয়া যেরূপ সুখ হয়, ইহা কতকটা সেই প্রকারের সুখ। আবার কোন কুকার্য্য দেখিলে, আমাদের মনে বিপরীত ভাবের উদয় হয়—কোন কুৎসিৎ বস্তু দেখিলে যে ভাব হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ ভাব। সাধারণতঃ আমরা যাহাকে প্রীতিজনক অপ্রীতিজনক অনুভূতি বলি, ইহা তাহা হইতে খুবই ভিন্ন।

কোন ভাল কার্য্য করিয়া আমাদের মনে যে সন্তোষ জন্মে, উহা অন্য কোন সন্তোষের মত নহে। ইহা স্বার্থ কিংবা গর্ব্বের উল্লাস নহে। ইহা ধর্ম্মজনিত বিমল আত্ম-প্রসাদ। কোন কুকার্য্য করিলে আমাদের পীড়িত অন্তরাত্মা একটা ব্যথা অনুভব করে; আমাদের দারুণ অনুশোচনা উপস্থিত হয়।

অন্যের কৃত সৎকার্য্য দেখিলেও আমাদের আত্মা অমৃতরসে অভিষিক্ত হয়। অন্যের যাহা কিছু মহৎ—যাহা কিছু উত্তম—তাহার সহিত আমাদের হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়,—তাহার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি হয়। স্বার্থের দ্বারা বিচলিত না হইলে, আমরা স্বভাবতই,—যে ভাল কাজ করে, তাহার স্থানে আপনাকে স্থাপন করি; সে, যে ভাবে উত্তেজিত, আমরাও কতকটা সেই ভাব অনুভব করি।

মন্দ কার্য্য দেখিলে সেইরূপ আমাদের মনে বিরাগ ও ঘৃণা উপস্থিত হয়। যিনি মানব-প্রকৃতির স্রষ্টা, তিনি আমাদের মঙ্গল অনুষ্ঠানে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই এই সকল ভাব আমাদের অন্তরে নিহিত করিয়াছেন। এই সকল ভাব ধর্ম্মের পত্তনভূমি না হইলেও, উহারা যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের পরম সহায়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধর্ম্ম ও সুখের মধ্যে যে সামঞ্জস্য আছে, উহারাই তাহার কল্যাণকর সাক্ষী।

নীতি সম্বন্ধীয় সমস্ত তথ্য আমরা যথাযথরূপে বিবৃত করিলাম। যাহা কিছু প্রকৃত তথ্যের বাহিরে—তৎসমস্ত শশ-বিষাণ সদৃশ নিতান্তই অলীক। সেই সব তথ্যের মধ্যে প্রভেদ নির্ণীত না হইলে সমস্তই বিশৃঙ্খলা।

আমরা এই নৈতিকতত্ত্বের আলোচনায়

সহজ জ্ঞান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি। কারণ, সহজজ্ঞানকে অবিশ্বাস করা প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য নহে, তাহাকে ব্যাখ্যা করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এবং সেই জন্যই সহজ জ্ঞানকে গোড়ায় মানিয়া লইতে হয়। প্রথমে আমারা স্থূলভাবে নৈতিক ব্যাপারের বর্ণনা করিয়াছি। পরে, নীতির উপাদান সকল বিশ্লেষণ করিয়া প্রত্যেকের বিশেষ লক্ষণ কি, তাহাও দেখাইয়াছি।

সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করিয়া আমরা একটি সর্ব্বাদিম তথ্যে উপনীত হইয়াছি—সে তথ্যটি নিজের উপরেই নির্ভর করে—সে তথ্যটি কি ? না মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের বিচারক্রিয়া। আমরা এই তথ্যের নিকট অন্যান্য তথ্যকে বলিদান দিই নাই। আমরা শুধু বলিয়াছি, কালের হিসাবে ও গুরুত্বের হিসাবে এইটিই সর্ব্বপ্রথম।

সত্য সুন্দর সম্বন্ধীয় বিচারক্রিয়ার সহিত মঙ্গল সম্বন্ধীয় বিচারক্রিয়ার একটা গভীর সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আমরা তাই দেখিতে পাই,—নীতি, দর্শন, ও সৌন্দর্য্যতত্ত্ব ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগ আছে। মূলে, মঙ্গলের সহিত সত্যের মিল থাকিলেও সত্যের সহিত মঙ্গলের পার্থক্য এইটুকু যে—মঙ্গল ব্যবহারিক সত্য। সৎকার্য্য অবশ্য-কর্ত্তব্য। সৎকার্য্য ও অবশ্যকর্ত্তব্যতা—এই দুইটি ভাব অবিভাজ্য হইলেও সর্ব্বতোভাবে এক নহে। কেন না, অবশ্য-কর্ত্তব্যতা মঙ্গলের উপর প্রতিষ্ঠিত। উহাদের মধ্যে এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ থাকাতেই মঙ্গল হইতেই অবশ্যকর্ত্তব্যতা, বিশ্বজনীন ভাব ও স্ব-সম্পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

যাহা মঙ্গল তাহাই অবশ্য-কর্ত্তব্য—ইহাই নৈতিক নিয়ম। ইহাই সমস্ত নীতির ভিত্তিভূমি। এই জন্য আমরা স্বার্থের নীতি ও ভাবের নীতিকে প্রকৃত নীতি হইতে পৃথক্ করিয়াছি। আমরা সকল তথ্যই মানিয়া লইয়াছি, কিন্তু এক শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করি নাই।

মানুষের জ্ঞানে যেরূপ নৈতিক নিয়ম, মানুষের কাজে সেইরূপ স্বাধীনতা। স্বাধীনতাকে অবশ্যকর্ত্তব্যতা হইতে সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করা যায়; শুধু তাহা নহে, উহাই স্বাধীনতার একটি অকাট্য প্রমাণ।

মানুষ স্বাধীন জীব হইয়াও কর্ত্তব্যের অধীন;—ইহাতেই মানুষ নীতিমান্ পুরুষ। পুরুষ—এই ধারণাটির মধ্যে অনেকগুলি নৈতিক ভাবের সমাবেশ আছে। তাহার মধ্যে অধিকারের ভাব একটি। পুরুষেরই অধিকার থাকিতে পারে।

এই সকল ধারণার মধ্যে, পাপ পুণ্যের ধারণাকেও ধরিতে হইবে।

অন্য ধারণাগুলি এই পাপপুণ্যের ধারণা হইতে যেন 'মন্‌জুরী' প্রাপ্ত হয়।

পাপপুণ্য বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাল মন্দের ভেদ, অবশ্যকর্ত্তব্যতা, স্বাধীনতা—এই সমস্ত বুঝাইয়া যায় এবং উহা হইতেই দণ্ড-পুরস্কারের ধারণাটিও উৎপন্ন হয়।

মঙ্গল যদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয় তবেই উহা অটল ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। তাই, মঙ্গলের প্রকৃতি জ্ঞানমূলক এই কথা আমরা বারম্বার বলিয়াছি, অথচ উহার মধ্যে যে ভাবের উপাদান আছে তাহাকেও আমরা অগ্রাহ্য করি নাই।

আমাদের প্রত্যেক নৈতিক বিচারক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই সব বিচারক্রিয়ার সহিত হৃদয় সর্ব্বতোভাবে সায় দেয়। যে কার্য্য আমরা ভাল বলিয়া বিবেচনা করি, সে

কার্য্যে আমাদের সুখানুভব হয়; কোন একটা কর্ত্তব্যকাজ সাধন করিয়াছি এবং তাহা স্বাধীনভাবে সাধন করিয়াছি মনে করিলে আমাদের মনে একপ্রকার অপূর্ব্ব সন্তোষ জন্মে।

(ক্রমশঃ)

---

## প্রার্থনা।

তোমারে হৃদয়ে আমি বুঝিব কেমনে,
কি করে রাখিব তোমা নয়নে বচনে ?
জীবনের মাঝে মোর সকল সময়ে,
কি করে থাকিবে তুমি বিরাজিত হয়ে ?
যে দিকে দেখিব চাহি জগৎ সংসারে,
যেন সেই দিকে পাই দেখিতে তোমারে।
প্রকৃতির চারু দৃশ্যে নয়ন জুড়ায়,
অমনি হৃদয় যেন দেখিবারে পায়,
সব শোভা সব দৃশ্য আছ পূর্ণ করি।
পূর্ণিমার শশী সম, অন্ধকার হরি
আলো করি এ আমার হৃদয় গগন,
ছড়াইয়া কত সুধা মুগ্ধ করি মন।
শান্ত স্নিগ্ধ প্রীতি পূর্ণ হয় এ হৃদয়,
তোমার প্রকাশ যবে হেরি বিশ্বময়।

---

## প্রার্থনা।

আমি পারি প্রাণ ভরে ডাকিতে তোমায়
এই শক্তি দাও দয়া করি।
কার্য্যে বা বসিয়া থাকি আলসে হেলায়
তবু যেন ওই নাম স্মরি।
যেন দেখি তোমারেই সমস্ত সংসারে।
বিশ্বরূপে ভরিবে হৃদয়।
এ জীবন মন প্রাণ রাখ পূর্ণ করে
ওহে পিতা প্রভু দয়াময়।
তোমার মঙ্গল নামে দূরে যায় চলে
অমঙ্গল বাধা ভয় রাশি,
দুঃখ মেঘ কেটে যায়, সুখের হিল্লোলে
দীপ্ত রবি উঠে পরকাশি।
এক মাত্র হে দেবতা হৃদয়ে আমার
পাতিয়াছি তোমার আসন,
ও মঙ্গলরূপে পূর্ণ কর এ সংসার
তোমাতেই তৃপ্ত হোক মন।

শ্রী সরোজকুমারী দেবী.

---

## সংগ্রহ।

লেখ্য।—লেখ্য অর্থাৎ দলিল তিন প্রকার। রাজসাক্ষিক সসাক্ষিক, ও অসাক্ষিক। যাহাতে রাজকর্ম্মচারির কোনরূপ স্বাক্ষর আছে তাহা রাজসাক্ষিক; যাহাতে সাক্ষীর নাম স্বাক্ষর আছে, তাহা সসাক্ষিক; আর যাহা কেবল নিজহস্তে লিখিত তাহা অসাক্ষিক। যে লেখ্য বলপূর্ব্বক সাধিত তাহা অপ্রমাণ; যাহা ছল দ্বারা সাধিত তাহাও অপ্রমাণ; দূষিতকর্ম্মরত ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকিলেও তাহাও অপ্রমাণ। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মাদ, ভীত ও তাড়িত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট দলিল অপ্রমাণ। কেহ কোন দলিল লিখিয়া দিয়া পরে অস্বীকার করিলে বা মৃত হইলে অক্ষরাদি মিলাইয়া তাহা সপ্রমাণ করিবে।

সাক্ষী।—রাজা, বেদবিৎ, প্রব্রজিত, ধূর্ত্ত, তস্কর, পরাধীন, স্ত্রীলোক, বালক, দস্যু, অতিবৃদ্ধ, উন্মত্ত, সুরাপায়ী, অভিশপ্ত, পতিত, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত, ব্যসনান্বিত ও অনুরাগান্ধ ব্যক্তি সাক্ষী হইবে না। যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষীকে প্রথম জিজ্ঞাসা করিবে। কার্য্যবশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা, সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিবে। সাক্ষী মৃত হইলে বা বিদেশে গেলে, যাহারা তাহার বক্তব্য অবগত আছে, তাহারাই সাক্ষীস্থানীয়। সাক্ষীরা সত্যদ্বারা পূত হয়েন। সূর্য্যোদয় হইলে সাক্ষীগণকে আহ্বান করিয়া শপথ করাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। ব্রাহ্মণকে "বল" এই বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। "সত্য বল" এই বলিয়া ক্ষত্রিয়কে জিজ্ঞাসা করিবে। গো বীজ সুবর্ণ দ্বারা বৈশ্যকে এবং মহাপাতক দ্বারা শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিবে। এবং সাক্ষীগণকে শুনাইবে মহাপাতকী এবং উপপাতকী যে লোকে গমন করে, মিথ্যা সাক্ষীরাও সেই স্থানে গমন করে। জন্মমৃত্যুর মধ্যে যে কিছু পুণ্য কৃত হইয়াছে, মিথ্যা সাক্ষী দিলে সবই বিনষ্ট হয়।

সত্যোনাদিত স্তপতি সত্যেন ভাতি চন্দ্রমাঃ,
সত্যেন বাতি পবনঃ সত্যেন ভূর্দ্ধারয়তি,
সত্যোনাপস্তিষ্ঠতি, সত্যোনাগ্নিস্তিষ্ঠতি, খাঞ্চ সত্যেন।
সত্যেন দেবাঃ, সত্যেন যজ্ঞাঃ,
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলায়া ধৃতং।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে।

সত্যের বলেই সূর্য্য উদিত হইতেছে, চন্দ্রমা দীপ্তি পাইতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পৃথিবী ধৃত হইয়া রহিয়াছে, জল রহিয়াছে, অগ্নি জ্বলিতেছে, আকাশ রহিয়াছে, দেবগণ রহিয়াছেন, যজ্ঞ চলিতেছে। এক দিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য, পরিমাপক-যন্ত্রে ধৃত হইলে সত্যই গুরুভার হয়। যে সাক্ষী জানিয়াও চুপ করিয়া থাকে, তাহার পাপ ও দণ্ড কূট-সাক্ষীর তুল্য। যাহার সাক্ষী সত্য বলিবে, বিচারে তাহারই জয়। সাক্ষী দ্বৈধ হইলে যে দিকে অধিক সাক্ষী, তাহারই জয়। উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন সাক্ষীই গ্রাহ্য।

বিষ্ণুসংহিতা।

## স্ত্রীজাতির সম্মান।

সোমঃ শৌচং দদৌ তাসাং গন্ধর্ব্বাশ্চ শুভাং গিরং
পাবকঃ সর্ব্বমেধ্যত্বং মেধ্যা বৈ যোষিতো হ্যতঃ

স্ত্রীজাতিকে চন্দ্র শৌচ প্রদান করিয়াছেন, গন্ধর্ব্ব মধুর বাক্য দিয়াছেন, পাবক সমস্ত বস্তু অপেক্ষা পবিত্র করিয়াছেন, অতএব স্ত্রীগণ পবিত্র।

আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, কার্য্যদক্ষ, বীরপুত্র-প্রসবিনী প্রিয়-বাদিনী স্ত্রী থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলে, রাজা ঐ স্ত্রীকে স্বামীধনের এক তৃতীয়াংশ দেওয়াইবেন। ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা, জ্ঞাতি, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ—বস্ত্র ও অলঙ্কার দ্বারা স্ত্রীগণকে পরিতুষ্ট রাখিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

---

## নানা কথা।

**আন্তরিকতা।**—আমরা যখনই যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, যদি প্রকৃত আন্তরিকতা থাকে—প্রাণগত চেষ্টা থাকে, তবে সে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইবেই হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে আমরা অনেক সময়ে গুরুতর ও হিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই বটে, কিন্তু আন্তরিকতা অভাবে সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হই না। ইউরোপ খণ্ডে যে সকল হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখি, অকালে তাহার বিনাশ নাই। প্রকৃত স্বার্থত্যাগের সহিত সমস্ত জীবন সমর্পণ করিয়া তাঁহারা হিতকর অনুষ্ঠান গুলিকে সফলতার দিকে লইয়া যান। মুক্তিফৌজের নেতাগণের ভিতরে কি দুর্দ্ধর্ষ অধ্যবসায় কার্য্য করিতেছে। তাঁহারা আপনাদের আত্মত্যাগের ফলে যে কত লোককে আকৃষ্ট করিতেছেন, তাহা আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সে দিন জার্ম্মেনির অন্তর্গত বার্লিন নগরের ষ্টেট-থিয়েটারের একেক সুবিখ্যাতা অভিনেত্রী ঘটনাক্রমে মুক্তি-ফৌজের একেক ধর্ম্মযাজকের বক্তৃতা পাঠে এবং তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যকলাপে এতই বিমুগ্ধ হইয়া যান, যে তিনি স্বীয় ব্যবসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যে আপনার জীবনকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইঁহার নাম হেডউইগ ওয়াঙ্গেল। তাঁহার জীবনের এই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে জর্ম্মানের নরনারী স্তম্ভিত। হায়, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে প্রকৃত আন্তরিকতা কবে আবির্ভূত হইবে যে আমরা ধন্য হইব।

**সভা।**—একেশ্বরবাদীগণের সভা বিগত ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে লাহোরে হইয়াছিল। প্রোফেসার শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম, এ, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য শ্রীযুক্ত লালা কাশীরাম ও অম্বিকাচরণ মজুমদার এই সভার অধিবেশন উপলক্ষে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেন।

**রোমান-কাথোলিক।**—১৩ই নবেম্বরর খ্রীষ্টিয়ান লাইফ পত্রিকা বলেন, যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়, খৃষ্টীয় অন্যান্য সম্প্রদায় অপেক্ষা নিতান্ত লোক-বহুল; কেন না তাহাদের সংখ্যা প্রায় বিশ কোটি। পত্রিকা লেখক বলেন যে প্রাগুক্ত দলের প্রতি তিন জনের ভিতরে দুইজন আদৌ লেখা পড়া জানেন না। যেখানে শিক্ষার বিস্তার নাই, সেখানে মতভেদের সম্ভাবনা কোথায়।

**নূতন মাসিক পত্র।**— "মন্দির" নামক মাসিক পত্রের ১ম সংখ্যা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। বিষয় নির্ব্বাচন মন্দ নহে। ইহার ভাষাও সুমার্জ্জিত। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা, ১৩ নং বলরামঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতায় প্রাপ্তব্য।

**সমালোচনা।**—লব্ধ-প্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সিংহের বিরচিত "আমি" ও "জীবনী" নামক নবপ্রকাশিত দুইখানি পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। হেমেন্দ্রবাবু ইতিপূর্ব্বে "প্রেম" লিখিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার বহুকালের যোগ। "জীবন" পুস্তকে তিনি বুদ্ধদেব ঈশা মহম্মদ ও প্রাচীন ঋষিগণের বৈরাগ্য ভাব আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই বলিয়াছেন প্রেম, যোগ, মিলনই জীবন, তাহার বিপরীতই মৃত্যু। "আমি" পুস্তকে তিনি আমিত্বের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছেন। পুস্তকখানি গবেষণা পূর্ণ। কবিত্ব ও চিন্তার সুন্দর সমাবেশ। পুস্তক দুইখানির প্রাপ্তি স্থান ৩৬ নং শ্যামবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা, মূল্য যথা-ক্রমে ১৲ ও ৷৷৹ আনা।

---

## আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৮০, কার্ত্তিক।

### আদি ব্রাহ্মসমাজ।

| | | |
|---|---|---|
| আয় | ... | ২৩৯৮৶৹ |
| পূর্ব্বকার স্থিত | ... | ৩০৮৬ ৴৬ |
| সমষ্টি | ... | ৩৩২৫৮৶৶৬ |
| ব্যয় | ... | ৯৩ ৶৹ |
| স্থিত | | ৩২৩২৮ ৬ |

জায়।

সম্পাদক মহাশয়ের বাটীতে গচ্ছিত
আদি ব্রাহ্মসমাজের মূলধন বাবত
সাতকেতা গবর্ণমেণ্ট কাগজ
২৬০০৲

সমাজের ক্যাশে মজুত
৬৩২৮৬

৩২৩২৮৬

আয়।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ... | ২০০৲ |

মাসিক দান।

৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের এষ্টেটের ম্যানেজিংএজেণ্ট মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত

২০০৲

২০০৲

| | | |
|---|---|---|
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ১৬।০ |
| পুস্তকালয় | ... | ৮৶৹ |
| যন্ত্রালয় | ... | ১৯৲ |
| ব্রঃ সং স্বঃ গ্রঃ প্রঃ মূলধন | | ৩৮০ |
| সমষ্টি | ... | ২৩৯৮৶৹ |

ব্যয়।

| | | |
|---|---|---|
| ব্রাহ্মসমাজ | ... | ৯০৮৴৯ |
| তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা | ... | ৫ |
| যন্ত্রালয় | ... | ২। ৬ |
| সমষ্টি | ... | ৯৩৶৹ |

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

---

# বিজ্ঞাপন।

## অশীতিতম সাম্বৎসরিক

### ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১১ই মাঘ সোমবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকার সময় আদিব্রাহ্মসমাজ গৃহে ব্রহ্মোপাসনা হইবে। অতএ ঐ দিবস যথা সময়ে উক্ত গৃহে সকলের উপ-স্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।
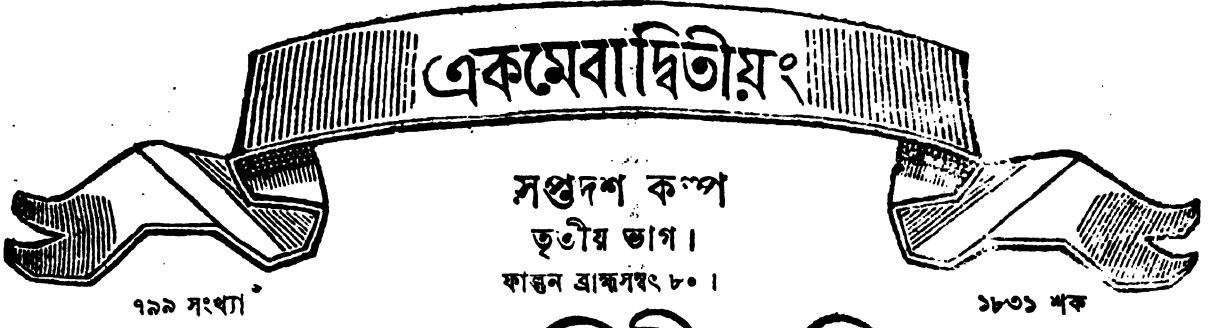
সপ্তদশ কল্প
তৃতীয় ভাগ।
ফাল্গুন ব্রাহ্মসম্বৎ ৮০।
৭৯৯ সংখ্যা ১৮৩১ শক

# তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ब्रह्म वा एकमिदमग्र आसीन्नान्यत् किञ्चनासीत्तदिदं सर्व्वमसृजत्। तदेव नित्यं ज्ञानमनन्तं शिवं स्वतन्त्रन्निरवयवमेकमेवाद्वितीयम्
सर्व्वव्यापि सर्व्वनियन्तृ सर्व्वाश्रय सर्व्ववित् सर्व्वशक्तिमद्ध्रुवं पूर्णमप्रतिममिति। एकस्य तस्यैवोपासनया
पारत्रिकमैहिकञ्च शुभम्भवति। तस्मिन् प्रीतिस्तस्य प्रियकार्य्य साधनञ्च तदुपासनमेव।"


## অশীতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব।

১১ই মাঘের পবিত্র প্রাতঃকালে আদি-ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় তল লোকে পরিপূর্ণ হইলে শঙ্খধ্বনি হইয়া কার্য্য আরম্ভ হইল। উপাসনা প্রারম্ভে ব্রাহ্মসমাজ গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে দণ্ডায়মান হইবা মাত্র নিম্ন লিখিত বন্দনাটি গীত হইতে লাগিল, সকলে স্তব্ধ পুলকে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

তুমি আমাদের পিতা,
তোমায় পিতা বলে যেন জানি,
তোমায় নত হয়ে যেন মানি,
তুমি কোরোনা কোরোনা রোষ।
হে পিতা হে দেব দুর করে দাও
যত পাপ যত দোষ—
যাহা ভালো তাই দাও আমাদের
যাহাতে তোমার তোষ।
তোমা হতে সব সুখ হে পিতা,
তোমা হতে সব ভালো,
তোমাতেই সব সুখ হে পিতা
তোমাতেই সব ভালো।
তুমিই ভালো হে তুমিই ভালো
সকল ভালোর সার—
তোমারে নমস্কার হে পিতা
তোমারে নমস্কার।

---

সঙ্গীত।
মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালি।

তিমির দুয়ার খোলো!
এস, এস নীরব চরণে,
জননী আমার দাঁড়াও
এই নবীন অরুণ কিরণে।
পুণ্য-পরশ-পুলকে
সব আলস যাক্ দূরে!
গগনে বাজুক বীণা
জগৎ-জাগানো সুরে!
জননী জীবন জুড়াও
তব প্রসাদ-সুধা সমীরণে।
জননি, আমার দাঁড়াও
মম জ্যোতি-বিভাসিত নয়নে।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী বেদীর আসন গ্রহণ করিলেন এবং শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয় নিম্ন লিখিত রূপে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"উৎসব-বিকাশের মধ্যে সেই পরিপূর্ণ আনন্দকে উপভোগ করিবার জন্য এই মধুর প্রভাতে আমরা এই ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়াছি। বৎসরে একদিনই উৎসব হয়, সংগ্রহ এক সময়েই হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার ভোগ সমস্ত বৎসর ধরিয়া। জন্ম একদিনই হয় কিন্তু তাহার সাধনা সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া। জীবন-পথ দীর্ঘ, এই দীর্ঘ জীবন পথে আমরা কি পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় লক্ষ্যহীন হইয়া বিচরণ করিব? কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় স্থিতি, কোথায় যাইতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ কোথায়? তাহার নির্দেশ আদর্শে। সে আদর্শ কি, না পরিপূর্ণ আনন্দ। "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসম্বিশন্তি।" আনন্দময় পরমপুরুষ হইতে জীব সকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দেই স্থিতি এবং আনন্দেই অভিগমন করে। পুষ্প যে উদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়া তত্রাগত লোকচক্ষুকে আনন্দ বিতরণ করে, তাহা অপূর্ণ আনন্দ, নিবিড় রজনীতে আকাশে বিকসিত হইয়া নক্ষত্ররাজি যখন পৃথিবীর মানবকে আলিঙ্গন দিয়া প্রফুল্লিত করে, তাহা অপূর্ণ আনন্দ, অনন্ত আকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া উজ্জ্বল করপ্রভাবে সূর্য্য যখন প্রাণদানে সৌর প্রাণীপুঞ্জকে সঞ্জীবিত করে, তাহাও অপূর্ণ আনন্দ—তাহা আনন্দকণা। বিশ্বমহিমার সকল বৈচিত্র্য হইতেই আমরা আনন্দ পাই, কিন্তু তাহা সেই পরিপূর্ণ আনন্দেরই কণা মাত্র। কোন ব্যষ্টিতে সে আনন্দের পূর্ণতা নাই, কোন সমষ্টিতে সে আনন্দের পূর্ণতা নাই। পূর্ণ আনন্দ যদি চাও তবে এই ব্যষ্টির মধ্যে যিনি পূর্ণ, সমষ্টির মধ্যে যিনি পূর্ণ এবং এই সমস্ত ব্যষ্টি সমষ্টির অতীত হইয়াও যিনি অন্তর্যামী রূপে থাকিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ বিধান করিতেছেন, সৌন্দর্য্য বিধান করিতেছেন, তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা কর—সেই অমৃত পুরুষকে জ্ঞাননেত্রে দেখিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও। তিনিই আমাদিগের আদর্শ। তাঁহাকে কেবল আনন্দস্বরূপ বলিলেই তাঁহার সকল ভাব বলা হয় না। তিনি আনন্দরূপ, তিনি মঙ্গলরূপ, তিনি শান্তিরূপ। সকল বৈচিত্র্য যেখানে এক হইয়া যায়, সকল ভেদ যেখানে ভগ্ন হয়, সকল সৌন্দর্য্য যেখানে একই শোভা ধারণ করে, সকল মঙ্গল যেখানে পর্য্যবসিত হয়, সকল শান্তিই যেখানে অনন্ত গাম্ভীর্য্য লাভ করে, সেই একই এই উৎসবের উৎসাহ দাতা পরিপূর্ণ আনন্দ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিরা যেখানে তপস্যা করিতেন, তাঁহাদের সেই তপোবনের অন্তর্বাহ্য ভেদ করিয়া যে এক তৃপ্তিকর আনন্দধারা উৎসারিত হইত তাহাকে তো অরণ্যবিহারী সমীরণ বা কুসুমজ্যোৎস্না প্রসূত বলিতে পারিব না। তাহা সেই তপস্বীর তপস্যালব্ধ ব্রহ্মজ্যোতিরই ধারা, যাহাতে কানন প্রস্ফুটিত হইয়া শান্তিবায়ু প্রবাহিত করিত, আনন্দপ্রস্রবণ নিঃসারিত করিত। তাহাই তপস্বীর গৃহদ্বারকে নির্ব্বিঘ্ন করিত। হিংসা, ভয়, ব্যাধি সে তপোবনের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিত না, আর সেই তপঃপরায়ণ মহর্ষি নির্ভয়ে নির্ব্বিঘ্নে পরিপূর্ণ আনন্দময়ে চিত্ত সমাধান করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতেন। ঋষিপত্নী আরণ্য ফলে অতিথি সৎকার করিতেন নির্ভয়ে, নির্ভয়ে ঋষিপুত্র বেদাধ্যয়নে নিরত থাকিত। হিংস্র সিংহ ব্যাঘ্র দুরন্ত স্বভাব পরিহার করিয়া কোন্ গভীর তৃপ্তিতে আত্মহারা হইয়া সংযত ভাবে আশ্রমদ্বারে পড়িয়া থাকিত। আনন্দই তাহার মূল, যে আনন্দ

গভীর ধ্যানরত মহাপুরুষের আত্মা হইতে বহির্গত হইত। সেই আনন্দই আজ আমরা ভোগ করিব, এই উৎসব প্রভাতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৎসর এবং সমস্ত জীবন। তাঁহাই আমাদের গৃহের শ্রী হইবে, হৃদয়ের পবিত্রতা হইবে, এবং ভোগের অন্ন হইবে। আমাদের সঞ্চয়ের বস্তু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং এবং শান্তং শিবমদ্বৈতং। যে পরম মঙ্গলালয় ব্রহ্ম আমাদের আত্মার আত্মারূপে বিরাজমান, জ্ঞানে তাঁহাকে দেখিয়া প্রীতিদ্বারা তাঁহার পূজা করিব এবং তাঁহারি অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া জীবন পথে বিচরণ করিব, ইহাই আমাদের ব্রত। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে, গৃহ তপোবন হয়, প্রবৃত্তি শান্ত হয়, প্রীতি প্রস্ফুটিত হয়, শত্রু মিত্র হয়, এবং আনন্দ কল্যাণে সংসার শান্তির আগার হয়। অনন্ত-জ্ঞান পরমেশ্বর আমাদের সকল অজ্ঞান কলুষ বিনষ্ট করিতে অন্তরে অন্তরে দীপ্যমান রহিয়াছেন, এই পূজা-মন্দির পূর্ণ করিয়া পবিত্ররূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তিনি স্বয়ংই আমাদের অনন্ত জীবন পথের নেতা ও আদর্শ। তাঁহাকে জ্ঞান-নেত্রে দর্শন করিয়া এই প্রভাতের উৎসব-সময়ে এস ভাই, সকলে মিলে প্রীতি-পুষ্পে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।"

অনন্তর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু যে সারগর্ভ উৎকৃষ্ট বক্তৃতা প্রদান করেন তাই এই

"প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে—এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়—দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্ত্তা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্চে না প্রভাত এই কথাই বল্‌চে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আন্‌তে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে কোথাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে,—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্ত্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল,—সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সামনে বীণা-

বাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে দাঁড়িয়েছে! এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—সদ্যো জাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনি নবীন হয়ে ওঠে—এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কি? এর মানে হচ্চে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মত আস্‌চে যাচ্চে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা, তারা মরীচিকার মত—জ্যোতির্ম্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আস্‌তে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুল্‌তে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠ্‌ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি ধাক্কা খাওয়া, কেবলি অন্তহীন পথ, কেবলি লক্ষহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জমতে জমতে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ করে ফেল্‌ত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মূর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্ম্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌তে চাইবে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মত এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরে সুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেম্‌নি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই,—সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর—নিত্য রাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এম্‌নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্‌তে পাই যে কোলাহল যতই বিষম হোক্‌না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিষটা হচ্চে শান্তম্। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে

একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্চেন শিবম্। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্বুদ যখন কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট্ পালট্ হয়ে যাক্ না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে—কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্, অন্তে শিবম্ এবং অন্তরে শিবম্।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতে আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্ত্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুন্‌তে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়—চরম হচ্চেন অদ্বৈতম্। আমরা চোকের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্র টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্, অন্তে অদ্বৈতম্ অন্তরে অদ্বৈতম্।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুন্‌তে পেয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টি করচেন, নিখিল জগৎ এই মাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ বহন করচে না, জগৎকে কেবলি সৃষ্টি করা হচ্চে—যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতে ঘুচ্‌চে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ব্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হতে হবে—আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে

নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না—আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনো মতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিচ্ছেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্ব্বে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্ব্বলতা। এই জন্যেই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্রগুলি কেমন? না গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্ না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্ছেন;—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে—কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই;—তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুলতে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের

স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্ছে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যতদূরই যাক্ না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে—কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘট্‌বে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে:—

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকে নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূলগানটি উপযুক্ত মত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখ্‌তে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিন্‌তে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুল্‌তে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—ভোগবিলাস ঐশ্বর্য্য উপকরণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্ছে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম্ম, অর্জ্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন। কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়—এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চলবে না—আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছন, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বল্‌চেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দ-সমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চলচে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্য্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটাই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তার লীলা চল্‌চে—তার পরে কর্ম্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দ সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্চে যথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও। প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠ্‌ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তবু বলচি এ পথ তোমার না হোক্! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক্ যেখানে জগতের ছোট বড় সকলেই এসে মিলেছে; তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জ্জন করে তাকে সার্থক কর—যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাক্‌বে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক্! ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আস্‌বে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই রকম ঘট্‌চে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না,

তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে,—আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না—তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেলতে খেলতে মার কাছে বার বার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসারের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়;—সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখ যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার, দুর্য্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;—দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে—একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখতে দেখতে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে—ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস—জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, ইতিহাস বল, সমাজতন্ত্র বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ—তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে—সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্ম্মকে নির্ম্মলরূপে সত্য করে তোলো।

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্‌তে, দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বলতে শিখেছ, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেন না, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাস্‌চে; নীলাকাশের নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার

দানসাগর ব্রত পালন করচে ; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্‌ছে ; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসে নি ; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌চে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি ! তবে জগতে জরা কোথায় ? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চির-নবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবাল ফুটে ফুটে উঠ্‌চে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরা-জীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক্‌; চির-নবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক্‌, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কর। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময় ! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগ-তের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠ্‌চে, সেই মিল-নেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যপ্ত হয়েছে ! এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন ! এই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন—চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা—সংসারের সমস্ত পর্দ্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহঙ্কারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চির-দিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সত্য হোক্ তোমার জীবন, তোমার জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্ !

দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচ্চে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকে-দিগন্তে দীপ জ্বলচে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে—আজ তোমার কিসের সঙ্কোচ—আজ তুমি নিজেকে জান—সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ—তোমারি আত্মার এই মহোৎসব সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে থেকোনা—যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মত উঞ্ছবৃত্তি কোরো না !

হে অন্তরতর, আমাকে বড় করে জানা-বার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে

ঘুচিয়ে দাও—তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও! আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্ম্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্ব্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনই যেতে দেবেনা— ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আস্তেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধূলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়—অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হাল্কা হয়, ধূলার চিহ্ন থাকে না,— একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও —তখন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও— নির্ম্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি,—মনে গর্ব্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্ছি; কিন্তু প্রেমের টান ত ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব্ব নিয়ে ত আত্মার ক্ষুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝ্‌তে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্ব্বলতা— তখন গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই—তখনি তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না—সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের ঝঙ্কারে,—বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক্, শান্তের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক্—সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্, ভূর্ভুবস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ, বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

পরে এই কয়েকটি সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

ভৈরোঁ—তেওরা।

আলোয় আলোকময় করে হে  
এলে আলোর আলো।  
আমার নয়ন হতে  
আঁধার মিলালো মিলালো।  
সকল আকাশ সকল ধরা,  
আনন্দে হাসিতে ভরা

যে দিক পানে নয়ন মেলি
ভালো সবি ভালো।
তোমার আলো গাছের পাতায়
নাচিয়ে তোলে প্রাণ।
তোমার আলো পাখীর বাসায়
জাগিয়ে তোলে গান।
তোমার আলো ভালোবেসে
পড়েছে মোর গায়ে এসে,
হৃদয়ে মোর নির্ম্মল হাত বুলালো বুলালো।

টৌড়ী-ভৈরবী—দাদ্‌রা।

নিশার স্বপন ছুটলরে এই ছুটলরে।
টুট্‌ল বাঁধন টুট্‌লরে।
রইল না আর আড়াল প্রাণে,
বেরিয়ে এলেম জগত পানে,
হৃদয় শতদলের সকল দলগুলি
এই ফুটলরে এই ফুটলরে।
দুয়ার আমার ভেঙে শেষে
দাঁড়ালে যেই আপনি এসে,
নয়ন জলে ভেসে হৃদয় চরণতলে লুট্‌লরে।
আকাশ হতে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো;
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠ্‌লরে এই উঠ্‌লরে।

টৌড়ী—ঝম্পক।

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন!
আবার চোখে নামে আবরণ।
আবার এ যে নানা কথাই জমে,
চিত্ত আবার নানাদিকে ভ্রমে,
দাহ আবার বেড়ে উঠে ক্রমে,
আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।
তব নীরব বাণী হৃদয় তলে,
ডুবে না যেন লোকের কোলাহলে;
সবার মাঝে আমার সাথে থাক,
আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাক,
নিয়ত মোর চেতনা পরে রাখ
আলোকে ভরা উদার ত্রিভুবন॥

মিশ্র বিভাস—ঠুংরী।

এই ত তোমার প্রেম ওগো হৃদয় হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে সোনার বরণ।
এই যে মধুর আলস ভরে
মেঘ ভেসে যায় আকাশ পরে
এই যে বাতাস দেহে করে অমৃত ক্ষরণ।
প্রভাত আলোর ধারায় আমার নয়ন ভেসেছে
এই তোমারি প্রেমের বাণী প্রাণে এসেছে।
তোমারি মুখ ঐ নুয়েছে
মুখে আমার চোখ থুয়েছে
আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে তোমারি চরণ॥

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তেওরা।

জয় তব বিচিত্র আনন্দ,
হে কবি, জয় তোমার করুণা
জয় তব ভীষণ সব কলুষ নাশন রুদ্রতা,
জয় অমৃত তব, জয় মৃত্যু তব,
জয় শোক তব, জয় সান্ত্বনা।
জয় পূর্ণ জাগ্রত জ্যোতি তব,
জয় তিমির নিবিড় নিশীথিনী,
জয় দায়িনী, জয় প্রেম মধুময় মিলন তব,
জয় অসহ বিচ্ছেদ বেদনা॥

জৌনপুরী টোড়ী—একতালা।

কে সে পরম সুন্দর যাঁহারি লাবণ্যে পূর্ণ
অনন্ত অম্বর।
আনন্দ-ঝঙ্কারে যাঁর মনের বিচিত্র তার
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে বাজে নিরন্তর।
সে সঙ্গীত হলে লীন মনোবীণা স্পন্দহীন,
তিলেক বিচ্ছেদে তাঁর ব্যাকুল অন্তর।
রূপ তাঁর সর্ব্বস্থানে, রস তাঁর বহে প্রাণে,
প্রেম তাঁর কোলে টানে বিশ্বচরাচর॥

বাংলা—তেওরা।

প্রভাতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দ গান গারে হৃদয়, আনন্দ গান গারে।
নীল আকাশের নীরব কথা,

শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক্ আজি তোমার
বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে,
যোগ দেরে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা'রে!

ইহার মধ্যে কয়েকটি সঙ্গীত মহর্ষিদেবের প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর একাকী গান করিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করেন।

---

রাত্রিকাল।

উপাসনা আরম্ভ হইবার এক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইয়া মহর্ষিদেবের বাটীর সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। উপরে নীচে বিন্দুমাত্র স্থান অবশিষ্ট রহিল না। লোক সংখ্যা প্রায় দুই সহস্র হইবে। ঠিক ৬টার সময় সঙ্গীত হইয়া উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় বেদীর আসন গ্রহণ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় এই ভাবে সকলকে উদ্বোধিত করিলেন।

"এই উৎসব রজনীতে ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধন বচনে যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিতে এবং সংশয়-তিমির তিরোহিত করিতে ইচ্ছা করি। যেন আমাদিগের চিত্ত উৎসবের বাহ্য-সম্পদে মোহিত না হইয়া ইহার মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করে, ইহার সত্য-সৌন্দর্য্যে সমাহিত হয়। সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত শরীরের অবসাদ এখনো বিদূরিত হয় নাই, এখনো কামনার আকর্ষণ হইতে চক্ষুশ্রোত্রের লোলুপ দৃষ্টি প্রত্যক্মুখী হয় নাই, কিন্তু সান্ধ্যগগণে প্রকৃতির দিগন্তব্যাপী উলুরব বরণডালা হস্তে করিয়া প্রকৃতির নিয়ন্তা দেশাতীত—কালাতীত মহেশ্বরের আরতি করিতে উত্থিত হইয়াছে —এখনি আমাদের বিবেককে জাগ্রত করিতে হইবে।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুত ইতি
তদ্যথাহির্নির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা
শয়িতৈবমেবেদং শেতে।
অথায়মশরীরোঽমৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব।"

যখন হৃদ্গত সমস্ত কামনা দূরীভূত হয় তখন এই মরণশীল জীব অমর হয় এবং এই স্থানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যেমন সর্পের ত্বক সর্পাশ্রয় বল্মীকে অনাত্মভাবে পতিত থাকে, সেইরূপ দেহমুক্ত পুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত এই শরীরও নিশ্চেষ্টভাবে শয়ন করিয়া থাকে। এই প্রাণ অর্থাৎ আত্মা অশরীর ও অমৃত। ইনি অতি বৃহৎ এবং তেজ মাত্রই। এই কথা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য জনককে পুনরায় বলিলেন—রাজন্! আত্মকাম ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি যে মোক্ষলাভ করেন তদ্বিষয়ে অপর মন্ত্রও উক্ত হইয়াছে শ্রবণ করুণ—

অনুপন্থা বিততঃ পুরাণো মাংস্পৃষ্টোঽনুবিত্তো
ময়ৈব তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ স্বর্গং
লোকমিত ঊর্দ্ধং বিমুক্তাঃ।"

এই মোক্ষপথ সূক্ষ্ম অর্থাৎ অতীব দুর্বিজ্ঞেয় বিধায় অণু অথচ ইহা বিস্তীর্ণ ও পুরাণ। ইহা আমাকে স্পর্শ করিয়াছে অর্থাৎ আমি এই পথ লাভ করিয়াছি। এবং মৎকর্ত্তৃক ইহা অনুবিত্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমি এই পথের ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহাও লাভ করিয়াছি। এই ব্রহ্মবিদ্যামার্গ দ্বারা অপর ধীর ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সকলও এই জীবদ্দশাতেই বিমুক্ত হইয়া দেহপাতের পর

স্বর্গলোক অর্থাৎ মুক্তিধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

"এবঃ পন্থা ব্রহ্মণা হ্যনুবিত্তস্তেনৈতি
ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ তৈজসশ্চ।"

এই ব্রহ্মপথ নিষ্কাম ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত পুরুষই লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবিৎ, পুণ্যকৃৎ ও তৈজস পুরুষই এ পথে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন।

এই মহাবাক্য জাগ্রত যাজ্ঞবল্ক্যের মুখোচ্চারিত সত্যবাণী। যদি আমাদের নিজের নিজের জ্ঞান-চক্ষু এখনো উন্মেষিত না হইয়া থাকে, যদি আমাদের নিজের নিজের বিবেক এখনো জাগ্রত না হইয়া থাকে, তবে এস ভাই আমরা এই উপনিষদ্ বাক্যে, এই আপ্তবাক্যে শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা হৃদয়ের অতি রমনীয় সম্পদ, শ্রদ্ধাই জ্ঞানের প্রসূতি, জ্ঞানই মুক্তির সোপান, মুক্তিই জীবের লক্ষ্য। যাঁহার লক্ষ্য মুক্তি, ব্রহ্মোপাসনাই তাঁহার তপস্যা। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই তপস্যাই অরণ্য হইতে গৃহে আনিয়া গৃহকে পবিত্র করিয়াছেন, সমাজকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, ধর্ম্মপিপাসুর প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। ব্রহ্মোৎসব আনন্দকুসুমকে বিকসিত করিয়া দেয়, ব্রহ্মোৎসব ঈশ্বরের মহিমাকে জাগ্রত করিয়া দেয়। যাঁহার মহিমা বসন্তের গন্ধবহ অনীল-সঞ্চারে প্রকাশিত হয়, যাঁহার মহিমা মেঘ বিদ্যুৎ বজ্ররবে, যাঁহার মহিমা চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রি-শিখরে এবং যাঁহার মহিমা অনন্ত আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রপুঞ্জে, এই উৎসব রজনীতে তাঁহারই অব্যক্ত অনন্ত মহিমা আমাদের হৃদয় মনকে অনন্ত অসীম আনন্দে নিমজ্জিত করিতে চাহিতেছে এবং তাহারই মধ্য হইতে যে মধুময় নিঃশব্দ অমৃতবাণী অমৃতে যাইবার জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, আমরা যেন সে আহ্বানে বধিরকর্ণ না হই। এমন শুভদিন, এমন পুণ্য মুহূর্ত্ত আমরা সর্ব্বদা প্রাপ্ত হই না। অতএব হে অমৃতের প্রিয়পুত্র সকল, হে জাগ্রত জীবন্ত মনুষ্য সকল, এস ভাই, এই পুণ্যমুহূর্ত্তে সেই মহা মহিমান্বিত অমৃত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া এবং তাঁহাতেই আমাদের অন্তর্বাহ্য সকলই বিসর্জ্জন দিয়া জীবনকে মধুময় করি"।

উপাসনান্তে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার ওজস্বিনী ভাষায় যে গবেষণা ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ বক্তৃতা করেন তাহাতে সকলে স্তব্ধ হইয়া যান। এই যে বিপুল জনতা, তাহার মধ্যে যে শান্তভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল, তাহাতে সকলে যে বিমল তৃপ্তি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্থানাভাবে রবীন্দ্র বাবুর হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত হইল না, আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

পরে কয়েকটি নূতন সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীরাগ—তেওরা।

কার্ মিলন চাও বিরহী।
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ—
ভব অরণ্যে কুটিল জটিল গহনে,
শান্তি সুখ হীন ওরে মন।
দেখ দেখরে চিত্ত কমলে
চরণ পদ্ম রাজে হায়
অমৃত জ্যোতি কিবা সুন্দর, ওরে মন।

ভীমপলশ্রী—সুরফাকতা।

দাঁড়াও মন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
আনন্দ সভা ভবনে আজ।
বিপুল মহিমাময় গগনে মহাসনে
বিরাজ করে বিশ্বরাজ।

সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধর মালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে
গাহিছে শুন গান।
এই বিশ্ব মহোৎসব দেখি
মগন হল সুখে কবি
চিত্ত ভুলি গেল সব কাজ॥

মিশ্র ইমন—তেওরা।

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে
বাজিবে হিয়া মাঝে।
বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে নানা সাজে।
নয়ন দুটি মেলিলে কবে পরাণ হবে খুসি,
যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি।
রয়েছ তুমি এ কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে॥

মিশ্র কেদারা—কাওয়ালি।

জানি জানি কোন্ আদি কাল হতে,
ভাসালে আমারে জগতের স্রোতে,
সহসা হে প্রিয় কত গৃহে পথে,
রেখে গেছ প্রাণে কত হরষণ।
কত বার তুমি মেঘের আড়ালে,
অমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।
সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে,
কত কালে কালে কত লোকে লোকে,
কত নব নব আলোকে আলোকে,
অরূপের কত রূপ দরশন।
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে,
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে,
কত দুখে সুখে, কত প্রেমে গানে,
অমৃতের কত রস বরষণ॥

শ্যাম—একতালা।

নয়ান ভাসিল জলে। শূন্য হিয়া তলে
ঘনাইল নিবিড় সজল ঘন প্রসাদ পবনে
জাগিল রজনী হরষে হরষে রে।
তাপ হরণ তৃষিত শরণ জয় তাঁর দয়া গাওরে
জাগরে আনন্দে চিত চাতক জাগো
মৃদু মৃদু মধু মধু প্রেম বরষে বরষে রে॥

কাফি-সিন্ধু—একতালা।

যদি তোমার দেখা না পাই প্রভু
এবার এ জীবনে,
তবে তোমায় আমি পাইনি
যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
এ সংসারের হাটে
আমার যতই দিবস কাটে,
আমার যতই দুহাত ভরে উঠে ধনে,
তবু কিছুই আমি পাইনি
যেন সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যদি আলস ভরে আমি বসি পথের পরে,
যদি ধূলায় শয়ন পাতি সযতনে,
যেন সকল পথই বাকি আছে
সে কথা রয় মনে;
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।
যতই উঠে হাসি ঘরে যতই বাজে বাঁশী,
ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
সে কথা রয় মনে
যেন ভুলে না যাই বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে॥

বাহার-বাগেশ্রী—তেওরা।

আমার মিলন লাগি তুমি আস্‌ছ কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য্য তোমায়
রাখ্‌বে কোথায় ঢেকে।

কত কালের সকাল সাঁঝে
তোমার চরণ ধ্বনি বাজে
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে।
ওগো পথিক আজ্‌কে আমার
সকল পরাণ ব্যেপে
থেকে থেকে হরষ যেন
উঠ্‌ছে কেঁপে কেঁপে।
যেন সময় এসেছে আজ
ফুরালো মোর যা ছিল কাজ
বাতাস আসে হে মহারাজ
তোমার গন্ধ মেখে॥

দেশ—তেওরা।

জাগ জাগরে জাগ সঙ্গীত,
চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত,
নিবিড়নন্দিত প্রেম-কম্পিত
হৃদয়-কুঞ্জ-বিতানে।
মুক্ত বন্ধন সপ্ত সুর তব করুক বিশ্ব বিহার,
সূর্য্য-শশি-নক্ষত্রলোকে করুক হর্ষ প্রচার,
তানে তানে প্রাণেপ্রাণে গাঁথ নন্দন হার,
পূর্ণ কররে গগন অঙ্গন তাঁর বন্দন গানে॥

বেহাগ—ধামার।

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে
জাগরে অন্তর জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধ প্রাণে
নিমেষ হারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা নীরব তারা
নীরব গীত রসে হ'ল হারা;
জাগে বসুন্ধরা অম্বর জাগেরে
জাগেরে সুন্দর সাথে॥

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

মহারাজ, একি সাজে এলে হৃদয়পুর-মাঝে,
চরণতলে কোটি শশি সূর্য্য মরে লাজে।
গর্ব্ব সব টুটিয়া মূর্চ্ছি পড়ে লুটিয়া,
সকল মম দেহ মন বীণা সম বাজে।
একি পুলক বেদনা বহিছে মধুবায়ে,
কাননে যত পুষ্প ছিল মিলিল তব পায়ে।
পলক নাহি নয়নে, হেরিনা কিছু ভুবনে,
নিরখি শুধু অন্তরে সুন্দর বিরাজে।

মিশ্র সিন্ধু—একতালা।

যা হারিয়ে যায়, তাই আগ্‌লে বসে
রইব কত আর!
আর পারিনে রাত জাগ্‌তে হে নাথ
ভাবতে অনিবার।
আছি রাত্রিদিবস ধরে
দুয়ার আমার বন্ধ করে,
আস্‌তে যে চায় সন্দেহে তায়
তাড়াই বারম্বার।
তাই ত কারো হয় না আসা
আমার একা ঘরে
আনন্দময় ভুবন তোমার
বাইরে খেলা করে।
তুমিও বুঝি পথ নাহি পাও,
এসে এসে ফিরিয়া যাও,
রাখতে যা চাই রয় না তাও
ধূলায় একাকার।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী।
সময় যেন হয়রে এবার
ঢেউ খাওয়া সব চুকিয়ে দেবার
সুধায় এবার তলিয়ে গিয়ে
অমর হয়ে রব মরি।
যে গান কানে যায় না শোনা
সে গান যেথায় নিত্য বাজে
প্রাণের বীণা নিয়ে যাব
সেই অতলের সভা মাঝে।

চির দিনের সুরটি বেঁধে
শেষ গানে তার কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে
নীরব বীণা দিব ধরি ॥

কীর্ত্তনের সুর—ঠুংরী।

ঐ আসন তলের মাটির পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
কেন আমায় মান দিয়ে আর দূরে রাখো
চির জনম এমন করে ভুলিও নাক,
অসম্মানে আন টেনে পায়ে তব ;
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব।
আমি তোমার যাত্রিদলের রব পিছে,
স্থান দিওহে আমায় তুমি সবার নীচে।
প্রসাদ লাগি কতই লোকে আসে ধেয়ে,
আমি কিছু চাইব না ত রইব চেয়ে।
সবার শেষে যা বাকি রয় তাহাই লব।
তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব ॥

---

## এক।

এক কারে কয়
যে একের যোগ কভু ছিন্ন নাহি হয়।
যে চেতনা পরশিলে মর্ম্মগ্রন্থি যায় খুলে
বিচিত্র রচনা মাঝে যোগের উদয়
এক তারে কয়।
পাইবারে যেই যোগ প্রকাশিত এই লোক
মর্ম্মের আনন্দ যেথা একই সুরে বয়
এক তারে কয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

---

## প্রার্থনা।

সাথে সাথে থাক তুমি নিখিল নির্ভর
দিবসের আলো নিভে যায়,
চারিদিকে অন্ধকার হয় গাঢ়তর
থাক তুমি ঘিরিয়া আমায়।
দীনবন্ধু তুমি বিনে কে দেখিবে আর,
কে দিবে তাপিতে শান্তি, সুধা সান্ত্বনায়।

মানব জীবন ক্ষুদ্র দুদিনে ফুরায়
ক্ষুদ্র ঢেউ নদীতে যেমন,
পৃথিবীর খেলা ধুলা ধুলিতে মিশায়,
হর্ষ জ্যোতি বিষাদে মগন।
আজ যাহা আছে কাল শুষ্ক ধূলি সার
হে অনন্ত থাক নিত্য হৃদয়ে আমার।

চাহিনা বারেক দৃষ্টি, সান্ত্বনার বাণী,
থাক সদা হৃদয় আসনে,
ভক্তের হৃদয়ে যথা দিবস যামিনী
থাকিতে তেমনি সর্ব্বক্ষণে।
চির পরিচিত প্রিয় অসীম মহান
নহে ক্ষণ তরে, এসো পূর্ণ কর প্রাণ।

এসোনা দেখাতে ভয় হে রাজা আমার,
এস মোর জুড়াও হৃদয়,
তোমার শান্তির স্পর্শ সুধা সান্ত্বনায়
জুড়াইবে ক্ষত সমুদয়।
হও মোর দুঃখে দুঃখী, দোষ ক্ষমা করি,
পতিত পাবন এসো পতিতে উদ্ধারি।

আমি চাই সর্ব্বকাজে সকল সময়ে
তুমি জাগ হৃদয় কমলে,
পাপ প্রলোভন আসে ছলিতে হৃদয়ে
তাহে যেন হৃদয় না টলে,
তুমি হও ধ্রুবতারা পথ দেখাইয়া,
আলো ও আঁধারে থাক, জুড়াও এ হিয়া।

নাহি শত্রু হেন কেহ যারে করি ভয়
তুমি যদি কর আশীর্ব্বাদ,
দুঃখেতে কাতর নই, অশ্রু ব্যথা ময়
নহে যদি থাক সাথে সাথ।
মরণে নাহিক ভয়, আর কারে ভয়,
হইব বিজয়ী লয়ে ও নাম অভয়।

নিশি দিন জেগে থাক নয়নে আমার
স্বপনে বা ঘুমে জাগরণে,
ঢালো জ্যোতি আলো করি ঘন অন্ধকার
লও টানি উর্দ্ধে ও গগনে।
ধরনীর কালো ছায়া, স্বর্গ সুপ্রভাতে
যাবে দূরে যদি তুমি থাক সাথে সাথে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

---

## নানা কথা।

**মহর্ষিদেবের শ্রাদ্ধ-বাসর।** বিগত ৬ইমাঘ বুধবার বৈকালে মহর্ষিদেবের বাটীর প্রাঙ্গনে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য তিন ব্রাহ্মসমাজ হইতেই বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় ও শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহর্ষিদেবের আদর্শজীবনের গুণাবলী ও তাঁহার বিশেষত্ব কীর্ত্তন করিলে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক সুদীর্ঘ ও চিন্তাপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন। ভবিষ্যতে তাহা এই পত্রিকায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

এতদুপলক্ষে যে দুইটি নূতন সঙ্গীত রচিত ও গীত হইয়াছিল তাহা এই—

পূরবী—একতালা।

নিভৃত প্রাণের দেবতা
যেখানে জাগেন একা,
ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার
আজ লব তাঁর দেখা।
সারাদিন শুধু বাহিরে
ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে।
সন্ধ্যাবেলার আরতি
হয়নি আমার শেখা।
তব জীবনের আলোতে
জীবন-প্রদীপ জ্বালি'
হে পূজারি, আজ নিভৃতে
সাজাব আমার থালি।
যেথা নিখিলের সাধনা
পূজালোক করে রচনা
আমিও সেথায় ধরিব
একটি জ্যোতির রেখা॥

বাউলের সুর—কাহারবা।

কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস,
ওগো! সাধক, ওগো পথিক, ওগো
প্রেমিক, তুমি ধরায় আস।
এই অকূল সংসারে
দুঃখ আঘাত তোমার প্রাণে
বীণা ঝঙ্কারে,
ঘোর বিপদ মাঝে
তুমি কোন্ জননীর মুখের হাসি
দেখিয়া হাস।
তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে উদাস হয়ে
বেড়াও কে জানে।
এমন, ব্যাকুল কোরে
ওগো, কে তোমারে কাঁদায় যারে
ভালবাস॥

---

## সমালোচনা।

**গীতলিপি।** এই বৎসরের মাঘোৎসবে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে কয়েকটি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন এবং যাহা উৎসবে গীত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশের স্বরলিপি আদি-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রকাশিত হইয়াছে। উহা ব্রাহ্মসাধারণের নিকট মূল্যবান সম্পত্তি। প্রাপ্তিস্থান আদি-ব্রাহ্মসমাজ, মূল্য ।৵০ মাত্র।

---

## প্রাপ্তি স্বীকার।

### আনুষ্ঠানিক দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী | ১০৲ |
| শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ বন্দোপাধ্যায় | ২৲ |

### এককালীন দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীযুক্ত সীতানাথ বক্সী | ৫৲ |

### মাঘোৎসবে দান।

| | |
|---|---|
| শ্রীমতী হেমোদিনী দাসী | ২৲ |
| শ্রীযুক্ত তুলসীদাস দত্ত | ২৲ |
| শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত | ২৲ |

---

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

অশীতিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সায়ংকালীন বক্তৃতা।

"প্রত্যেক জাতিই আপনার সভ্যতার ভিতর দিয়ে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে প্রার্থনা করচে। গাছের শিকড় থেকে আর ডালপালা পর্য্যন্ত সমস্তেরই যেমন একমাত্র চেষ্টা এই যে, যেন তার ফলের মধ্যে তার সকলের চেয়ে ভাল বীজটি জন্মায়; অর্থাৎ তার শক্তির যতদূর পরিণতি হওয়া সম্ভব তার বীজে যেন তারই আবির্ভাব হয়; তেমনি মানুষের সমাজও এমন মানুষকে চাচ্চে যার মধ্যে সে আপনার শক্তির চরম পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারে।

এই শক্তির চরম পরিণতিটি যে কি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বল্‌তে যে কাকে বোঝায় তার কল্পনা প্রত্যেক জাতির বিশেষ ক্ষমতা অনুসারে উজ্জ্বল অথবা অপরিস্ফুট। কেউ বা বাহুবলকে, কেউ বুদ্ধিচাতুরীকে, কেউ চারিত্রনীতিকেই মানুষের শ্রেষ্ঠতার মুখ্য উপাদান বলে গণ্য করেছে এবং সেই দিকেই অগ্রসর হবার জন্যে নিজের সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা শাস্ত্র শাসনকে নিযুক্ত করচে।

ভারতবর্ষও একদিন মানুষের পূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করবার জন্যে সাধনা করেছিল। ভারতবর্ষ মনের মধ্যে আপনার শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবিটি দেখেছিল। সে শুধু মনের মধ্যেই কি। বাহিরে যদি মানুষের আদর্শ একেবারেই দেখা না যায় তাহলে মনের মধ্যেও তার প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত গুণী জ্ঞানী শূর বীর রাজা মহারাজার মধ্যে এমন কোন্ মানুষদের দেখেছিল যাঁদের নরশ্রেষ্ঠ বলে বরণ করে নিয়েছিল? তাঁরা কে?

> সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ
> কৃতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ
> তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
> যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিশন্তি।

তাঁরা ঋষি। সেই ঋষি কারা? না যাঁরা পরমাত্মাকে জ্ঞানের মধ্যে পেয়ে জ্ঞানতৃপ্ত, আত্মার মধ্যে মিলিত দেখে কৃতাত্মা, হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করে বীতরাগ, সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে দর্শন করে প্রশান্ত; সেই ঋষি তাঁরা যাঁরা পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র হতেই প্রাপ্ত হয়ে ধীর হয়েছেন, সকলের সঙ্গেই

যুক্ত হয়েছেন, সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেছেন।

ভারতবর্ষ আপনার সমস্ত সাধনার দ্বারা এই ঋষিদের চেয়েছিল। এই ঋষিরা ধনী নন, ভোগী নন, প্রতাপশালী নন, তাঁরা ধীর, তাঁরা যুক্তাত্মা।

এর থেকেই দেখা যাচ্চে পরমাত্মার যোগে সকলের সঙ্গে যোগ উপলব্ধি করা, সকলের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করা এইটে-কেই ভারতবর্ষ মনুষ্যত্বের চরম সার্থকতা বলে গণ্য করেছিল। ধনী হয়ে, প্রবল হয়ে, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই চারিদিকের সকলের চেয়ে উচ্চে খাড়া করে তোলাকেই ভারতবর্ষ সকলের চেয়ে গৌরবের বিষয় বলে মনে করে নি।

মানুষ বিনাশ করতে পারে, কেড়ে নিতে পারে, অর্জ্জন করতে পারে, সঞ্চয় করতে পারে, আবিষ্কার করতে পারে কিন্তু এই জন্যেই যে মানুষ বড় তা নয়—মানুষের মহত্ত্ব হচ্চে মানুষ সকলকেই আপন করতে পারে; মানুষের জ্ঞান সব জায়গায় পৌঁছয় না, তার শক্তি সব জায়গায় নাগাল পায় না, কেবল তার আত্মার অধিকারের সীমা নেই—মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পরিপূর্ণ বোধশক্তির দ্বারা এই কথা বল্‌তে পেরেছেন যে ছোট হোক্ বড় হোক্, উচ্চ হোক নীচ হোক্ শত্রু হোক্ মিত্র হোক্ সকলেই আমার আপন।

মানুষের যারা শ্রেষ্ঠ তাঁরা এমন জায়গায় সকলের সঙ্গে সমান হয়ে দাঁড়ান যেখানে সর্ব্বব্যাপীর সঙ্গে তাঁদের আত্মার যোগ স্থাপন হয়। যেখানে মানুষ সকলকে ঠেলেঠুলে নিজে বড় হয়ে উঠতে চায় সেখানেই তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। সেই জন্যেই যাঁরা মানবজন্মের সফলতা লাভ করেছেন উপনিষৎ তাঁদের ধীর বলেছেন, যুক্তাত্মা বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই শান্ত, তাঁরা সকলের সঙ্গে মিলে আছেন বলেই সেই পরম একের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছেদ নেই, তাঁরা যুক্তাত্মা।

খৃষ্টের উপদেশ-বাণীর মধ্যেও এই কথাটির আভাস আছে। তিনি বলেছেন সূচীর ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেমন উট প্রবেশ করতে পারে না, ধনীর পক্ষে মুক্তি-লাভও তেমনি দুঃসাধ্য।

তার মানে হচ্চে এই যে, ধন বল, মান বল যা কিছু আমরা জমিয়ে তুলি তার দ্বারা আমরা সতন্ত্র হয়ে উঠি, তার দ্বারা সকলের সঙ্গে আমাদের যোগ নষ্ট হয়। তাকেই বিশেষ ভাবে আগ্‌লাতে সাম্‌লাতে গিয়ে সকলকে দূরে ঠেকিয়ে রাখি। সঞ্চয় যতই বাড়তে থাকে ততই সকলের চেয়ে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে গর্ব্ব হয়—সেই গর্ব্বের টানে এই স্বাতন্ত্র্যকে কেবলি বাড়িয়ে নিয়ে চল্‌তে চেষ্টা হয়,—এর আর সীমা নেই—আরো বড়, আরো বড়, আরো বেশি, আরো বেশি। এমনি করে মানুষ সকলের সঙ্গে যোগ হারাবার দিকেই চল্‌তে থাকে, তার সর্ব্বত্র প্রবেশের অধিকার কেবল নষ্ট হয়। উট যেমন সূচের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না সেও তেমনি কেবলি স্থূল হয়ে উঠে নিখিলের কোনো পথ দিয়েই গল্‌তে পারে না, সে আপনার বড়ত্বের মধ্যেই বন্দী। সে ব্যক্তি মুক্ত স্বরূপকে কেমন করে পাবে যিনি এমন প্রশস্ততম জায়গায় থাকেন যেখানে জগতের ছোটো-বড় সকলেরই সমান স্থান।

সেই জন্যে আমাদের দেশে এই একটি অত্যন্ত বড় কথা বলা হয়েছে যে, তাঁকে পেতে হলে সকলকেই পেতে হবে। সমস্তকে ত্যাগ করাই তাঁকে পাওয়ার পন্থা নয়।

য়ুরোপের কোনো কোনো আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে উপনিষদের কাছেই বিশেষ ভাবে ঋণী, তাঁরা সেই ঋণকে অস্বীকার করেই বলে থাকেন—ভারতবর্ষের ব্রহ্ম একটি অবিচ্ছিন্ন (abstract) পদার্থ। অর্থাৎ জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকে ত্যাগ করে বাদ দিয়েই সেই অনন্ত স্বরূপ—অর্থাৎ এক কথায় তিনি কোনোখানেই নেই, আছেন কেবল তত্ত্বজ্ঞানে।

এ রকম কোনো দার্শনিক মতবাদ ভারতবর্ষে আছে কিনা সে কথা আলোচনা করতে চাই নে কিন্তু এটি ভারতবর্ষের আসল কথা নয়। বিশ্বজগতের সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনন্ত স্বরূপকে উপলব্ধি করার সাধনা ভারতবর্ষে এতদূরে গেছে যে অন্য দেশের তত্ত্বজ্ঞানীরা সাহস করে ততদূরে যেতে পারেন না।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ—জগতে যেখানে যা কিছু আছে সমস্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে আচ্ছন্ন করে দেখবে এই ত আমাদের প্রতি উপদেশ।

> যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপসু
> যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
> য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
> তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

একেই কি বলে বিশ্ব থেকে বাদ দিয়ে তাঁকে দেখা? তিনি যেমন অগ্নিতেও আছেন তেমনি জলেও আছেন, অগ্নিও জলের কোনো বিরোধ তাঁর মধ্যে নেই—ধান, গম, যব প্রভৃতি যে সমস্ত ওষধি কেবল কয়েক মাসের মত পৃথিবীর উপর এসে আবার স্বপ্নের মত মিলিয়ে যায় তার মধ্যেও সেই নিত্য সত্য যেমন আছেন আবার যে বনস্পতি অমরতার প্রতিমাস্বরূপ সহস্র বৎসর ধরে পৃথিবীকে ফল ও ছায়া দান করচে তার মধ্যেও তিনি তেমনিই আছেন। শুধু আছেন এইটুকুকে জানা নয়—নমোনমঃ।—তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার—সর্ব্বত্রই তাঁকে নমস্কার।

আবার আমাদের ধ্যানের মন্ত্রেরও সেই একই লক্ষ্য—তাঁকে সমস্তর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা, ভূলোকের সঙ্গে নক্ষত্রলোকের, বাহিরের সঙ্গে অন্তরের।

আমাদের দেশে বুদ্ধ এসেও বলে গিয়েছেন যা কিছু ঊর্দ্ধে আছে অধোতে আছে দূরে আছে নিকটে আছে, গোচরে আছে অগোচরে আছে সমস্তের প্রতিই বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে; যখন দাঁড়িয়ে আছ বা চল্‌চ, বসে আছ বা শুয়ে আছ, যে পর্য্যন্ত না নিদ্রা আসে সে পর্য্যন্ত এই প্রকার স্মৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকাকেই বলে ব্রহ্মবিহার।

অর্থাৎ ব্রহ্মের যে ভাব সেই ভাবটির মধ্যে প্রবেশ করাই হচ্চে ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মের সেই ভাবটি কি?

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সর্ব্বানুভূ হয়ে আছেন তিনিই ব্রহ্ম। সর্ব্বানুভূ, অর্থাৎ সমস্তই তিনিই অনুভব করচেন এই তাঁর ভাব। তিনি যে কেবল সমস্তর মধ্যে ব্যাপ্ত তা নয়, সমস্তই তাঁর অনুভূতির মধ্যে। শিশুকে মা যে বেষ্টন করে থাকেন সে কেবল তাঁর বাহু দিয়ে তাঁর শরীর দিয়ে নয়. তাঁর অনুভূতি দিয়ে। সেইটিই হচ্চে মাতার ভাব, সেই তাঁর মাতৃত্ব। শিশুকে মা আদ্যোপান্ত অত্যন্ত প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। তেমনি সেই অমৃতময় পুরুষের অনুভূতি সমস্ত আকাশকে পূর্ণ করে, সমস্ত জগৎকে সর্ব্বত্র নিরতিশয় আচ্ছন্ন করে

আছে। সমস্ত শরীরে মনে আমরা তাঁর অনুভূতির মধ্যে মগ্ন হয়ে রয়েছি। অনুভূতি, অনুভূতি—তাঁর অনুভূতির ভিতর দিয়ে বহু যোজন ক্রোশ দূর হতে সূর্য্য পৃথিবীকে টানচে, তাঁরই অনুভূতির মধ্য দিয়ে আলোকতরঙ্গ লোক হতে লোকান্তরে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। আকাশে কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কালে কোথাও তার বিরাম নেই।

শুধু আকাশে নয়—যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ—এই আত্মাতেও তিনি সর্ব্বানুভূ। যে আকাশ ব্যাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ—যে আত্মা সমাপ্তির রাজ্য সেখানেও তিনি সর্ব্বানুভূ।

তাহলেই দেখা যাচ্চে যদি সেই সর্ব্বানুভূকে পেতে চাই তাহলে অনুভূতির সঙ্গে অনুভূতি মেলাতে হবে। বস্তুত মানুষের যতই উন্নতি হচ্চে ততই তার এই অনুভূতির বিস্তার ঘট্‌চে। তার কাব্য-দর্শন বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ধর্ম্ম সমস্তই কেবল মানুষের অনুভূতিকে বৃহৎ হতে বৃহত্তর করে তুল্‌চে। এমনি করে অনুভূ হয়েই মানুষ বড় হয়ে উঠ্‌চে প্রভু হয়ে নয়। মানুষ যতই অনুভূ হবে প্রভুত্বের বাসনা ততই তার খর্ব্ব হতে থাকবে। জায়গা জুড়ে থেকে মানুষ অধিকার করে না, বাহিরের ব্যবহারের দ্বারাও মানুষের অধিকার নয়—যে পর্য্যন্ত মানুষের অনুভূতি সেই পর্য্যন্তই সে সত্য, সেই পর্য্যন্তই তার অধিকার।

ভারতবর্ষ এই সাধনার পরেই সকলের চেয়ে বেশি জোর দিয়েছিল এই বিশ্ববোধ, সর্ব্বানুভূতি। গায়ত্রীমন্ত্রে এই বোধকেই ভারতবর্ষ প্রত্যহ ধ্যানের দ্বারা চর্চ্চা করেছে, এই বোধের উদ্বোধনের জন্যেই উপনিষৎ সর্ব্বভূতকে আত্মায় ও আত্মাকে সর্ব্বভূতে উপলব্ধি করে ঘৃণা পরিহারের উপদেশ দিয়েছেন এবং বুদ্ধদেব এই বোধকেই সম্পূর্ণ করবার জন্যে সেই প্রণালী অবলম্বন করতে বলেছেন যাতে মানুষের মন অহিংসা থেকে দয়ায়, দয়া থেকে মৈত্রীতে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়ে যায়।

এই যে সমস্তকে পাওয়া, সমস্তকে অনুভব করা, এর একটি মূল্য দিতে হয়। কিছু না দিয়ে পাওয়া যায় না। এই সকলের চেয়ে বড় পাওয়ার মূল্য কি। আপনাকে দেওয়া। আপনাকে দিলে তবে সমস্তকে পাওয়া যায়। আপনার গৌরবই তাই—আপনাকে ত্যাগ করলে সমস্তকে লাভ করা যায়, এইটেই তার মূল্য, এইজন্যই সে আছে।

তাই উপনিষদে একটি সঙ্কেত আছে—ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, ত্যাগের দ্বারাই লাভ কর, ভোগ কর—মা গৃধঃ, লোভ কোরো না।

বুদ্ধদেবের যে শিক্ষা সেও বাসনা বর্জ্জনের শিক্ষা; গীতাতেও বল্‌চে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে নিরাসক্ত হয়ে কাজ করবে। এই সকল উপদেশ হতেই অনেকে মনে করেন ভারতবর্ষ জগৎকে মিথ্যা বলে কল্পনা করে বলেই এই প্রকার উদাসীনতার প্রচার করেছে। কিন্তু কথাটা ঠিক এর উল্টো।

যে লোক আপনাকেই বড় করে চায় সে আর-সমস্তকেই খাটো করে। যার মনে বাসনা আছে সে কেবল সেই বাসনার বিষয়েই বদ্ধ, বাকি সমস্তের প্রতিই উদাসীন। উদাসীন শুধু নয়, হয় ত নিষ্ঠুর। এর কারণ এই, প্রভুত্বে কেবল তারই রুচি যে ব্যক্তি সমগ্রের চেয়ে আপনাকে সত্যতম বলে জানে, বাসনার বিষয়ে তারই রুচি যার কাছে সেই বিষয়টি সত্য আর

সমস্তই মায়া। এই সকল লোকেরা হচ্ছে যথার্থ মায়াবাদী।

মানুষ নিজেকে যতই ব্যাপ্ত করতে থাকে ততই তার অহঙ্কার এবং বাসনার বন্ধন কেটে যায়। মানুষ যখন নিজেকে একেবারে একলা বলে না জানে, যখন সে, বাপ মা ভাই বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে উপলব্ধি করে তখনই সে সভ্যতার প্রথম সোপানে পা ফেলে—তখনই সে বড় হতে সুরু করে। কিন্তু সেই বড় হবার মূল্যটি কি? নিজের প্রবৃত্তিকে বাসনাকে, অহঙ্কারকে খর্ব্ব করা। এ না হলে পরিবারের মধ্যে তার আত্মোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না;—গৃহের সকলেরই কাছে আপনাকে ত্যাগ করলে তবেই যথার্থ গৃহী হতে পারা যায়।

এমনি করে গৃহী হবার জন্যে, সামাজিক হবার জন্যে স্বাদেশিক হবার জন্যে মানুষকে শিশুকাল থেকে কি সাধনাই না করতে হয়। তার যে সকল প্রবৃত্তি নিজেকে বড় করে' পরকে আঘাত করে তাকে কেবলি খর্ব্ব কর্ত্তে হয়—তার যে সকল হৃদয়বৃত্তি সকলের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে চায় তাকেই উৎসাহ দ্বারা এবং চর্চ্চার দ্বারা কেবল বাড়িয়ে তুল্‌তে হয়। পরিবারবোধের চেয়ে সমাজবোধে, সমাজবোধের চেয়ে স্বদেশবোধে মানুষ একদিকে যতই বড় হয় অন্যদিকে ততই তাকে আত্মবিলোপ সাধন করতে হয়—ততই তার শিক্ষা কঠিন হয়ে ওঠে, ততই তাকে বৃহৎ ত্যাগের জন্যে প্রস্তুত হতে হয়—একেই ত বলে বীতরাগ হওয়া! এই জন্যেই মহত্ত্বের সাধনা মাত্রই মানুষকে বলে, ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, বলে, মা গৃধঃ। এইরূপে নিজের ঐক্যবোধের ক্ষেত্রকে ক্রমশ বড় করে তোলবার চেষ্টা, এই হচ্চে মনুষ্যত্বের চেষ্টা।—আমরা আজ দেখ্‌তে পাচ্চি পাশ্চাত্যদেশে এই চেষ্টা সাম্রাজ্যিকতা-বোধে গিয়ে পৌঁচেছে। এক জাতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সমস্ত রাজ্য আছে তাদের সমস্তকে এক সাম্রাজ্যসূত্রে গেঁথে বৃহৎভাবে প্রবল হয়ে ওঠবার একটা ইচ্ছা সেখানে জাগ্রত হয়েছে। এই বোধকে সাধারণের মধ্যে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্যে বহুতর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হচ্চে, বিদ্যালয়ে নাট্যশালায় গানে কাব্যে উপন্যাসে ভূগোলে ইতিহাসে সর্ব্বত্রই এই সাধনা ফুটে উঠেছে।

সাম্রাজ্যিকতা-বোধকে য়ুরোপ যেমন পরম মঙ্গল বলে মনে করচে এবং সে জন্যে বিচিত্রভাবে সচেষ্ট হয়ে উঠেছে—বিশ্ববোধকেই ভারতবর্ষ মানবাত্মার পক্ষে তেমনি চরম পদার্থ বলে জ্ঞান করেছিল এবং এইটিকে উদ্বোধিত করবার জন্যে নানা দিকেই তার চেষ্টাকে চালনা করেছে। শিক্ষায় দীক্ষায় আহারে বিহারে সকল দিকেই সে তার এই অভিপ্রায় বিস্তার করেছে। এই হচ্চে সাত্ত্বিকতার অর্থাৎ চৈতন্যময়তার সাধনা। তুচ্ছ বৃহৎ সকল ব্যাপারেই প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করে সংযমের দ্বারা চৈতন্যকে নির্ম্মল উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা। কেবল জীবের প্রতি অহিংসামাত্র নয়, নানা উপলক্ষ্যে পশুপক্ষী, এমন কি, গাছপালার প্রতিও সেবাধর্ম্মের চর্চ্চা করা—অন্নজল নদী পর্ব্বতের প্রতিও হৃদয়ের একটি সম্বন্ধ-সূত্র প্রসারিত করা; ধর্ম্মের যোগ যে সকলের সঙ্গেই এই সত্যটিকে নানা ধ্যানের দ্বারা, স্মরণের দ্বারা, কর্ম্মের দ্বারা মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে দেওয়া। বিশ্ববোধ ব্যাপারটি যত বড় তার চৈতন্যও তত বড় হওয়া চাই, এই জন্যই গৃহীর ভোগে এবং যো-

গীর ত্যাগে সর্ব্বত্রই এমনতর সাত্ত্বিক সাধনা।

ভারতবর্ষের কাছে অনন্ত সকল ব্যবহারের অতীত শূন্য পদার্থ নয়, কেবল তত্ত্বকথা নয়, অনন্ত তার কাছে করতলন্যস্ত আমলকের মত স্পষ্ট বলেই'ত জলে স্থলে আকাশে অন্নে পানে বাক্যে মনে সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই এই অনন্তকে সর্ব্বসাধারণের প্রত্যক্ষ বোধের মধ্যে সুপরিস্ফুট করে তোলবার জন্যে ভারতবর্ষ এত বিচিত্র ব্যবস্থা করেছে এবং এই জন্যেই ভারতবর্ষ ঐশ্বর্য্য বা স্বদেশ বা স্বাজাতিকতার মধ্যেই মানুষের বোধশক্তিকে আবদ্ধ করে তাকেই একান্ত ও অত্যুগ্র করে তোলবার দিকে লক্ষ্য করেনি।

এই যে বাধাহীন চৈতন্যময় বিশ্ববোধটি ভারতবর্ষে অত্যন্ত সত্য হয়ে উঠেছিল এই কথাটি আজ আমরা যেন সম্পূর্ণ গৌরবের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে স্মরণ করি। এই কথাটি স্মরণ করে আমাদের বক্ষ যেন প্রশস্ত হয়, আমাদের চিত্ত যেন আশান্বিত হয়ে ওঠে। যে বোধ সকলের চেয়ে বড় সেই বিশ্ববোধ, যে লাভ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মলাভ কাল্পনিকতা নয়, তারি সাধনা প্রচার করিবার জন্যে এদেশে মহাপুরুষেরা জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং ব্রহ্মকেই সমস্তের মধ্যে উপলব্ধি করাটাকে তাঁরা এমন একটি অত্যন্ত নিশ্চিত পদার্থ বলে জেনেছেন যে জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন—

ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, ন চেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাৎ অমৃতা ভবন্তি—

এঁকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল—এঁকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ; ভূতে ভূতে সকলের মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করে ধীরেরা অমৃতত্ব লাভ করেন।

ভারতবর্ষের এই মহৎ সাধনার উত্তরাধিকার যা আমরা লাভ করেছি তাকে আমরা অন্য দেশের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে ছোট করে মিথ্যা করে তুলতে পারব না। এই মহৎ সত্যটিকেই নানাদিক দিয়ে উজ্জ্বল করে তোলবার ভার আমাদের দেশের উপরেই আছে। আমাদের দেশের এই তপস্যাটিকেই বড় রকম করে সার্থক করবার দিন আজ আমাদের এসেছে;—জিগীষা নয়, জিঘাংসা নয়, প্রভুত্ব নয়, প্রবলতা নয়, বর্ণের সঙ্গে বর্ণের, ধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মের, সমাজের সঙ্গে সমাজের, স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ভেদ বিরোধ বিচ্ছেদ নয়; ছোট বড় আত্মপর সকলের মধ্যেই উদারভাবে প্রবেশের যে সাধনা, সেই সাধনাকেই আমরা আনন্দের সঙ্গে বরণ করব। আজ আমাদের দেশে কত ভিন্ন জাতি, কত ভিন্ন ধর্ম্ম, কত ভিন্ন সম্প্রদায় তাহা কে গণনা করবে—এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের কথায় কথায় পদে পদে যে ভেদ, এবং আহারে বিহারে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশ পায় জগতের অন্য কোথাও তার আর তুলনা পাওয়া যায় না। এতে করে আমরা হারাচ্চি তাঁকে যিনি সকলকে নিয়েই এক হয়ে আছেন; যিনি তাঁর প্রকাশকে বিচিত্র করেছেন কিন্তু বিরুদ্ধ করেননি।—তাঁকে হারানো মানেই হচ্চে মঙ্গলকে হারানো শক্তিকে হারাণ সামঞ্জস্যকে হারাণ এবং সত্যকে হারানো। তাই আজ আমাদের মধ্যে দুর্গতির সীমা পরিসীমা নেই, যা ভালো তা কেবলি বাধা পায়, পদেপদেই খণ্ডিত হতে থাকে, তার ক্রিয়া সর্ব্বত্র ছড়াতে পারনা—

সদনুষ্ঠান একজন মানুষের আশ্রয়ে মাথা তোলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়, কালে কালে পুরুষে পুরুষে তার অনুবৃত্তি থাকে না—দেশে যেটুকু কল্যাণের উদ্ভব হয় তা কেবলি পদ্মপত্রে শিশির বিন্দুর মত টলমল করতে থাকে; তার কারণ আর কিছুই নয় আমরা খাওয়া শোওয়া ওঠা বসায় যে সাত্ত্বিকতার সাধনা বিস্তার করেছিলুম তাই আজ লক্ষ্যহীন প্রাণহীন হয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে; তার যা উদ্দেশ্য ছিল ঠিক তারই বিপরীত কাজ করছে—যে বিশ্ববোধকে সে অবারিত করবে তাকেই সে সকলের চেয়ে আবরিত করচে—দুই পা অন্তর এক-একটি প্রভেদকে সে সৃষ্টি করে তুলচে এবং মানব ঘৃণার কাঁটাগাছ দিয়ে অতি নিবিড় করে তার বেড়া নির্ম্মাণ করচে। এমনি করেই ভূমাকে আমরা হারালুম, মনুষ্যত্বকে তার বৃহৎক্ষেত্রে দাঁড় করাতে আর পারলুম না, নিরর্থক কতকগুলি আচার মেনে চলাই আমাদের কর্ম্ম হয়ে দাঁড়াল শক্তিকে বিচিত্র পথে উদারভাবে প্রসারিত করা হল না, চিত্তের গতিবিধির পথ সঙ্কীর্ণ হয়ে এল, আমাদের আশা ছোট হয়ে গেল, ভরসা রইল না, পরস্পরের পাশে এসে দাঁড়াবার কোনো টান নেই, কেবলি তফাতে তফাতে সরে যাবার দিকেই তাড়না, কেবলই টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেওয়া, কেবলি ভেঙে ভেঙে পড়া—শ্রদ্ধা নেই, সাধনা নেই, শক্তি নেই, আনন্দ নেই। যে মাছ সমুদ্রের সে যদি অন্ধকার গুহার ক্ষুদ্র বদ্ধ জলের মধ্যে গিয়ে পড়ে তবে সে যেমন ক্রমে অন্ধ হয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে, তেমনি আমাদের যে আত্মার স্বাভাবিক বিহারক্ষেত্র হচ্চে বিশ্ব, আনন্দলোক হচ্চেন ভূমা, তাকে এই সমস্ত শত-খণ্ডিত খাওয়া-ছোঁওয়ার ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে প্রতিদিন তার বুদ্ধিকে অন্ধ, হৃদয়কে বন্দী এবং শক্তিকে পঙ্গু করে ফেলা হচ্চে। নিতান্ত প্রত্যক্ষ এই মহতী বিনষ্টি হতে কে আমাদের বাঁচাবে? আমাদের সত্য করে তুলবে কিসে? এর যে যথার্থ উত্তর সে আমাদের দেশেই আছে। ইহ চেৎ অবেদীৎ অথ সত্যমস্তি, নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—ইঁহাকে যদি জানা গেল তবেই সত্য হওয়া গেল, ইঁহাকে যদি না জানা গেল তবেই মহাবিনাশ। এঁকে কেমন করে জান্‌তে হবে? না, ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য—প্রত্যেকের মধ্যে সকলেরই মধ্যে তাঁকে চিন্তা করে তাঁকে দর্শন করে। গৃহেই বল, সমাজেই বল, রাষ্ট্রেই বল, যে পরিমাণে সকলের মধ্যে আমরা সেই সর্ব্বানুভূকে উপলব্ধি করি সেই পরিমাণেই সত্য হই, যে পরিমাণে না করি সেই পরিমাণেই আমাদের বিনাশ। এই জন্য সকল দেশেই সর্ব্বত্রই মানুষ জেনে এবং না জেনে এই সাধনাই করচে, সে বিশ্বানুভূতির মধ্যেই আত্মার সত্য উপলব্ধি খুঁজ্‌চে, সকলের মধ্যে দিয়ে সেই এককেই সে চাচ্চে, কেননা সেই একই অমৃত—সেই একের থেকে বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু।

কিন্তু আমার মনে কোনো নৈরাশ্য নেই। আমি জানি অভাব যেখানে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়ে মূর্ত্তি ধারণ করে সেখানেই তার প্রতিকারের শক্তি সম্পূর্ণ বেগে প্রবল হয়ে ওঠে। আজ যে সকল দেশ স্বজাতি স্বরাজ্য সাম্রাজ্য প্রভৃতি নিয়ে অত্যন্ত ব্যাপৃত হয়ে আছে তারাও বিশ্বের ভিতর দিয়ে সেই পরম একের সন্ধানে সজ্ঞানে প্রবৃত্ত নেই, তারাও সেই একের বোধকে এক জায়গায় এসে আঘাত করচে কিন্তু তবু তারা বৃহতের অভিমুখে আছে—একটা বিশেষ সীমার মধ্যে ঐক্যবোধকে তারা

প্রশস্ত করে নিয়েছে,সেইজন্যে জ্ঞানে ভাবে কর্ম্মে এখনো তারা ব্যাপ্ত হচ্চে, তাদের শক্তি এখনো কোথাও তেমন করে অভিহত হয়নি—তারা চলেছে তারা বদ্ধ হয়নি। কিন্তু সেই জন্যেই তাদের পক্ষে সুস্পষ্ট করে বোঝা শক্ত পরম পাওয়াটি কি? তারা মনে করচে তারা যা নিয়ে আছে তাই বুঝি চরম—এর পরে বুঝি আর কিছু নেই—যদি থাকে মানুষের তাতে প্রয়োজন নেই। তারা মনে করে মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা বুঝি ভোট্ দেবার অধিকারের উপর নির্ভর করচে—আজকালকার দিনে উন্নতি বল্‌তে লোকে যা বোঝে তাই বুঝি মানুষের চরম অবলম্বন।

কিন্তু বিধাতা এই ভারতবর্ষেই সমস্যাকে সব চেয়ে ঘনীভূত করে তুলেছেন, সেই জন্যে আমাদেরই এই সমস্যার আসল উত্তরটি দিতে হবে—এবং এর উত্তর আমাদের দেশের বাণীতে যেমন অত্যন্ত স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি,
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।

যিনি সমস্ত ভূতকে পরমাত্মার মধ্যেই দেখেন এবং পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দেখেন তিনি আর কাউকেই ঘৃণা করেন না।

সর্ব্বব্যাপী স ভগবান তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। সেই ভগবান সর্ব্বব্যাপী এই জন্যে তিনিই হচ্চেন সর্ব্বগত মঙ্গল। বিভাগের দ্বারা, বিরোধের দ্বারা যতই তাঁকে খণ্ডিত করে জানব ততই সেই সর্ব্বগত মঙ্গলকে বাধা দেব।

একদিন ভারতবর্ষের বাণীতে মানুষের সকলের চেয়ে বড় সমস্যার যে উত্তর দেওয়া হয়েছে, আজ ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সেই উত্তরটি দিতে হবে। আজ আমাদের দেশে নানা জাতি এসেছে, বিপরীত দিক্ থেকে নানা বিরুদ্ধ শক্তি এসে পড়েছে, মতের অনৈক্য, আচারের পার্থক্য, স্বার্থের সংঘাত ঘনীভূত হয়ে উঠেছে—আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের বাণীকে আজই সত্য করে তোলবার সময় এসেছে। যতক্ষণ তা না করব ততক্ষণ বারবার কেবলি আঘাত পেতে থাক্‌ব,—কেবলি অপমান কেবলি ব্যর্থতা ঘট্‌তে থাকবে, বিধাতা একদিনের জন্যেও আমাদের আরামে বিশ্রাম করতে দেবেন না।

আমরা মানুষের সমস্ত বিচ্ছিন্নতা মিটিয়ে দিয়ে তাকে যে এক করে জানবার সাধনা করব তার কারণ এ নয় যে, সেই উপায়ে আমরা প্রবল হব, আমাদের বাণিজ্য ছড়িয়ে পড়বে, আমাদের স্বজাতি সকল জাতির চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌বে কিন্তু তার একটি মাত্র কারণ এই যে সকল মানুষের ভিতর দিয়ে আমাদের আত্মা সেই ভূমার মধ্যে সত্য হয়ে উঠ্‌বে যিনি "সর্ব্বগতঃ শিবঃ," যিনি সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ" যিনি "সর্ব্বানুভূঃ।" তাঁকেই চাই, তিনিই আরম্ভে, তিনিই শেষে। যদি বল এমন করে দেখ্‌লে আমাদের উন্নতি হবেনা তাহলে আমি বলব আমাদের বিনতিই ভাল—যদি বল এই সাধনায় আমাদের স্বজাতীয়তা দৃঢ় হয়ে উঠ্‌বে না, তাহলে আমি বল্‌ব স্বজাতি-অভিমানের অতি নিষ্ঠুর মোহ কাটিয়ে ওঠাই যে মানুষের পক্ষে শ্রেয় এই শিক্ষা দেবার জন্যেই ভারতবর্ষ চিরদিন প্রস্তুত হয়েছে। ভারতবর্ষ এই কথাই বলেছে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্—সমস্ত উদ্ধত সভ্যতার সভাদ্বারে দাঁড়িয়ে আবার একবার ভারতবর্ষকে বল্‌তে হবে যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন

কুর্য্যাম্। প্রবলরা দুর্ব্বল বলে অবজ্ঞা করবে ধনীরা তাকে দরিদ্র বলে উপহাস করবে কিন্তু তবু তাকে এই কথা বল্‌তে হবে, যেনাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্। এই কথা বলবার শক্তি আমাদের কণ্ঠে তিনিই দিন, য একঃ যিনি এক, অবর্ণঃ, যাঁর বর্ণ নেই,—বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ, যিনি সমস্তের আরম্ভে এবং সমস্তের শেষে—সনোবুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু—তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করুন, শুভবুদ্ধির দ্বারা দূর নিকট আত্মপর সকলের সঙ্গে যুক্ত করুন।

হে সর্ব্বানুভূ, তোমার যে অমৃতময় অনন্ত অনুভূতির দ্বারা বিশ্বচরাচরের যা কিছু সমস্তকেই তুমি নিবিড় করে বেষ্টন করে ধরেছ, সেই তোমার অনুভূতিকে এই ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আকাশের তলে দাঁড়িয়ে একদিন এখানকার ঋষি তাঁর নিজের নির্ম্মল চেতনার মধ্যে যে কি আশ্চর্য্য গভীররূপে উপলব্ধি করেছেন তা মনে করলে আমার হৃদয় পুলকিত হয়—মনে হয় যেন তাঁদের সেই উপলব্ধি এদেশের এই বাধাহীন নীলাকাশে এই কুহেলিকাহীন উদার আলোকে আজও সঞ্চারিত হচ্চে—মনে হয় যেন এই আকাশের মধ্যে আজও হৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করে নিস্তব্ধ করে ধরলে তাদের সেই বৈদ্যুতময় চেতনার অভিঘাত আমাদের চিত্তকে বিশ্বস্পন্দনের সমান ছন্দে তরঙ্গিত করে তুল্‌বে। কি আশ্চর্য্য পরিপূর্ণতার মূর্ত্তিতে তুমি তাঁদের কাছে দেখা দিয়েছিলে—এমন পূর্ণতা যে কিছুতে তাঁদের লোভ ছিল না। যতই তাঁরা ত্যাগ করেছেন ততই তুমি পূর্ণ করেছ এইজন্যে ত্যাগকেই তাঁরা ভোগ বলেছেন। তাঁদের দৃষ্টি এমন চৈতন্যময় হয়ে উঠেছিল যে, লেশমাত্র শূন্যকে কোথাও তাঁরা দেখ্‌তে পাননি—মৃত্যুকেও বিচ্ছেদরূপে তাঁরা স্বীকার করেন নি—এইজন্যে অমৃতকে যেমন তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন, তেমনি মৃত্যুকেও তাঁরা তোমার ছায়া বলেছেন। যস্যচ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ—এই জন্যে তাঁরা বলেছেন, প্রাণো মৃত্যুঃপ্রাণ স্তক্মা—প্রাণই মৃত্যু, প্রাণই বেদনা। এইজন্যেই তাঁরা ভক্তির সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে বলেছেন—নমস্তে অস্ত আয়তে, নমো অস্তু পরায়তে—যে প্রাণ আস্‌চ তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ চলে যাচ্চ তোমাকে নমস্কার। প্রাণে হ ভূতং ভব্যং চ—যা চলে গেছে তাও প্রাণেই আছে, যা ভবিষ্যতে আস্‌বে তাও প্রাণের মধ্যেই রয়েছে। তাঁরা অতি সহজেই এই কথাটি বুঝেছিলেন যে যোগের বিচ্ছেদ কোনোখানেই নেই। প্রাণের যোগ যদি জগতের কোনো এক জায়গাতেও বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে জগতে কোথাও একটি প্রাণীও বাঁচতে পারে না। সেই বিরাট প্রাণ সমুদ্রই তুমি—যদিদং কিঞ্চ প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—এই যা কিছু সমস্তই সেই প্রাণ হতে নিঃসৃত হচ্চে এবং প্রাণের মধ্যেই কম্পিত হচ্চে। নিজের প্রাণকে তাঁরা অনন্তের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি সেই জন্যেই প্রাণকে তাঁরা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত দেখে বলেছেন—প্রাণো বিরাট্—সেই প্রাণকেই তাঁরা সূর্য্যচন্দ্রের মধ্যে অনুসরণ করে বলেছেন, প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা। নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে—যে প্রাণ ক্রন্দন করচ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ গর্জ্জন করচ সেই তোমাকে নমস্কার—নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে—যে প্রাণ বিদ্যুতে জ্বলে উঠ্‌চ সেই তোমাকে নমস্কার, যে প্রাণ বর্ষণে গলে পড়্‌চ সেই তোমাকে

নমস্কার—প্রাণ, প্রাণ, প্রাণ, সমস্ত প্রাণময়—কোথাও তার রন্ধ্র নেই, অন্ত নেই। এমনতর অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্যে তোমার যে সাধকেরা একদিন বাস করেছেন তাঁরা এই ভারতবর্ষেই বিচরণ করেছেন—তাঁরা এই আকাশের দিকেই চোখ তুলে একদিন এমন নিঃসংশয় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠেছিলেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ—কেই বা শরীর-চেষ্টা করত কেই বা জীবন-ধারণ করত যদি এই আকাশে আনন্দ না থাকতেন। যাঁরা নিজের বোধের মধ্যে সমস্ত আকাশকেই আনন্দময় বলে জেনেছিলেন তাঁদের পদধূলি এই ভারতবর্ষের মাটির মধ্যে রয়েছে—সেই পবিত্র ধূলিকে মাথায় নিয়ে হে সর্ব্বব্যাপী পরমানন্দ তোমাকে সর্ব্বত্র স্বীকার করবার শক্তি আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত হোক্—যাক্ সমস্ত বাধাবন্ধ ভেঙে যাক্—দেশের মধ্যে এই আনন্দবোধের বন্যা এসে পড়ুক—সেই আনন্দের বেগে মানুষের সমস্ত ঘরগড়া ব্যবধান চূর্ণ হয়ে যাক্, শত্রুমিত্র মিলে যাক্, স্বদেশ বিদেশ এক হোক্। হে আনন্দময় আমরা দীন নই, দরিদ্র নই—তোমার অমৃতময় অনুভূতির দ্বারা আমরা আকাশে এবং আত্মায়, অন্তরে বাহিরে পরিবেষ্টিত এই অনুভূতি আমাদের দিনে দিনে জাগ্রত হয়ে উঠুক্ তাহলেই আমাদের ত্যাগই ভোগ হবে, অভাবও ঐশ্বর্য্যময় হবে, দিন পূর্ণ হবে, রাত পূর্ণ হবে, নিকট পূর্ণ হবে, দূর পূর্ণ হবে, পৃথিবীর ধূলি পূর্ণ হবে, আকাশের নক্ষত্রলোক পূর্ণ হবে। যাঁরা তোমাকে নিখিল আকাশে পরিপূর্ণভাবে দেখেছেন তাঁরা ত কেবল তোমাকে জ্ঞানময় বলে দেখেননি। কোন্ প্রেমের সুগন্ধ বসন্ত বাতাসে তাঁদের হৃদয়ের মধ্যে এই বার্ত্তা সঞ্চারিত করেছে যে, তোমার যে বিশ্বব্যাপী অনুভূতি তা রসময় অনুভূতি—বলেছেন রসো বৈ সঃ—সেই জন্যই জগৎজুড়ে এত রূপ, এত রং, এত গন্ধ, এত গান, এত সখ্য, এত স্নেহ, এত প্রেম,—এতস্যৈবানন্দস্যান্যানিভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি—তোমার এই অখণ্ড পরমানন্দ রসকেই আমরা সমস্ত জীবজন্তু দিকে দিকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মাত্রায় মাত্রায় কণায় কণায় পাচ্চি—দিনে রাত্রে ঋতুতে ঋতুতে, অন্নেজলে, ফুলেফলে, দেহেমনে, অন্তরেবাহিরে, বিচিত্র করে ভোগ করছি। হে অনির্ব্বচনীয় অনন্ত, তোমাকে রসময় বলে দেখ্‌লে সমস্ত চিত্ত একেবারে সকলের নীচে নত হয়ে পড়ে, বলে, দাও দাও, আমাকে তোমার ধূলার মধ্যে তৃণের মধ্যে চড়িয়ে দাও—দাও আমাকে রিক্ত করে কাঙাল করে, তার পরে দাও আমাকে রসে ভরে দাও, চাই না ধন, চাই না মান, চাই না কারো চেয়ে কিছুমাত্র বড় হতে; তোমার যে রস হাট-বাজারে কেনবার নয়—রাজভাণ্ডারে কুলুপ দিয়ে রাখবার নয়, যা আপনার অন্তহীন প্রাচুর্য্যে আপনাকে আর ধরে রাখ্‌তে পারচে না, চারিদিকে ছড়াছড়ি যাচ্চে—তোমার যে রসে মাটির উপর ঘাস সবুজ হয়ে আছে, বনের মধ্যে ফুল সুন্দর হয়ে আছে, যে রসে সকল দুঃখ, সকল বিরোধ, সকল কাড়াকাড়ির মধ্যেও আজও মানুষের ঘরে ঘরে ভালবাসার অজস্র অমৃতধারা কিছুতেই শুকিয়ে যাচ্চে না ফুরিয়ে যাচ্চে না—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হয়ে উঠে পিতায়-মাতায়, স্বামীস্ত্রীতে, পুত্রেকন্যায়, বন্ধু-বান্ধবে নানা দিকে নানা শাখায় বয়ে যাচ্চে, সেই তোমার নিখিল রসের নিবিড় সমষ্টি-রূপ যে অমৃত তারি একটু কণা আমার হৃদয়ের মাঝখানটিতে একবার ছুঁইয়ে দাও

—তার পর থেকে আমি দিনরাত্রি তোমার সবুজ ঘাসপাতার সঙ্গে আমার প্রাণকে সরল করে মিলিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকি—যারা তোমারই সেই তোমার-সকলের মাঝখানেই গরীব হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে খুসি হয়ে যে জায়গাটিতে কারো লোভ নেই সেই খানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তোমার প্রেমমুখশ্রীর চিরপ্রসন্ন আলোকে পরিপূর্ণ হয়ে থাকি! হে প্রভু, কবে তুমি আমাকে সম্পূর্ণ করে সত্য করে জানিয়ে দেবে যে, রিক্ততার প্রার্থনাই তোমার কাছে চরম প্রার্থনা—আমার সমস্তই নাও, সমস্তই ঘুচিয়ে দাও, তাহলেই তোমার সমস্তই পাব, মানবজীবনে সকলের এই শেষ কথাটি ততক্ষণ বলবার সাহস হবে না যতক্ষণ অন্তরের ভিতর থেকে বল্‌তে না পারব, রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি—তিনিই রস, যা কিছু আনন্দ সে এই রসকে পেয়েই।

---

## মানুষের সংহারকার্য্য।

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে মানুষ যে দিন উচ্চতর বুদ্ধির অধিকারী হইয়া অল্পবুদ্ধি প্রাণীর উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সে দিন হইতে যে কেবল দুর্ব্বল জীবের সহিতই মানুষের বৈর চলিতেছে, তাহা নয়। প্রকৃতির সহিতও মানুষের এক নীরব সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে কোটি কোটি নিরীহ জীব প্রাণদান করিয়াছে। তা'ছাড়া পৃথিবীর নানা অংশের বনভূমিগুলি তৃণহীন শুষ্কমরুতে পরিণত হইয়া এবং নির্ম্মলসলিলা নদীগুলি কলুষিত ও পঙ্কিল হইয়া প্রকৃতির স্নেহভরা পবিত্র শ্যামলকান্তিকে ক্রমেই কর্কশ করিয়া তুলিতেছে।

পরিবর্ত্তন লইয়াই প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিরাম নাই। ধরাবক্ষে যখন মানুষ স্থান পায় নাই তখন-ইহা চলিত এবং এখনো চলিতেছে। এ সবই সত্য! সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্থান আপনা হইতেই উচু নীচু হইয়া দেশের ঋতুর পরিবর্ত্তন করিতেছে। পশু পক্ষী লতা গুল্ম পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া টি'কিয়া থাকিতে গিয়া নিজেদের দেহের কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, হয় তো তাহাদিগকে দেশত্যাগ করিয়া অপর কোনও সুবিধাজনক স্থান খুঁজিয়া লইতে হইতেছে। এ সবগুলিও সত্য! কিন্তু প্রকৃতির সেচ্ছাকৃত এই শ্রেণীর পরিবর্ত্তনে কোন অমঙ্গল লক্ষণ দেখা যায় না। মানুষ নিজের জ্ঞানগরিমায় মুগ্ধ হইয়া প্রকৃতির পটে যে তুলিকাপাত করে, তাহাই সেই শান্ত ছবিকে ক্রমে কর্কশ করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে পৃথিবীর যে অমঙ্গল হইবে তাহার ফল অতি ভয়ানক।

প্রকৃতির অকল্যাণ আনয়ন ব্যাপারে, একমাত্র আধুনিক সভ্যজাতিই দায়ী নয়। মানুষ যখন অসভ্য ছিল তখন হইতেই নিরীহ প্রাণীদিগের হত্যা আরম্ভ করিয়া প্রাণীজগতের এত ক্ষতি করিয়া আসিতেছে যে তাহার আর পূরণ হইবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। এই পাপের ফলেই এখন ধরাপৃষ্ঠে সুস্থকায় স্বচ্ছন্দচর প্রাণী দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক প্রাণিজাতির বংশলোপ পর্য্যন্ত ঘটিয়াছে। এখন মৃৎপ্রোথিত কঙ্কালে তহোদের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অনেক বন্য পশুকে বুদ্ধিবলে পোষ মানাইয়া আমরা এখন তাহাদিগকে গার্হস্থ্য সম্পদ করিয়া তুলিয়াছি সত্য, কিন্তু এই ব্যবস্থায় তাহারা এত হীনবীর্য্য এবং দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে যে,

নিজের কীর্ত্তির জন্য নিজেকে ধিকার দিতে ইচ্ছা হয়। মানুষের এই যথেচ্ছাচার দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে, সম্ভবতঃ কয়েকটি খাদ্যপ্রদ উদ্ভিদ্ এবং আর কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় প্রাণী ছাড়া ক্রমে অন্য সকলই ধরাপৃষ্ঠ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, এবং শেষে সে গুলিরও পর্য্যন্ত বংশলোপের সম্ভাবনা দেখা দিবে। যে আধিপত্যবিস্তারের জন্য মানুষ আসৃষ্টি এত লালায়িত, উদ্ভিদ্হীন এবং প্রাণিবিরল অবস্থায় তাহার পূর্ণতা হইবে বটে, কিন্তু সে অবস্থা কখনই মানুষের জীবনরক্ষার অনুকূল হইবে না।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে বক্তব্য বিষয়টা স্ফুটতর হইবে। অসভ্য মানুষ অনৈতিহাসিক যুগে আধুনিক যুগের মানুষদিগের ন্যায় বন্দুক কামান ব্যবহার করিতে পারিত না সত্য, তথাপি তাহারা শিলাময় অস্ত্রশস্ত্রাদির আঘাতে ম্যামথ্ নামক হস্তিজাতীয় জীবের বংশনাশের যে সহায়তা করে নাই এ কথা কোনক্রমেই বলা যায় না। ম্যামথ্ আর ধরাপৃষ্ঠ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। গভীর ভূস্তরে প্রোথিত কঙ্কাল দ্বারাই এখন তাহাদের পূর্ব্ব অস্তিত্বের পরিচয় গ্রহণ করিতে হয়। অতি প্রাচীন কালে আমেরিকার সর্ব্বাংশে নানা জাতীয় বন্য অশ্ব দলে দলে আনন্দে বিচরণ করিত। আজকাল তাহাদের একটিও ভূপৃষ্ঠে নাই। জীবতত্ত্ববিদ্গণ ইহাদের তিরোভাবকেও মানুষের কীর্ত্তি বলিতে চাহেন। মানুষ গোলাগুলি চালাইয়া এই জীবগুলির বংশলোপ করে নাই সত্য, কিন্তু যে সকল সংক্রামক এবং সাংঘাতিক ব্যাধিদ্বারা তাহারা নির্ব্বংশ হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। যখন আমেরিকার বনভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল, তখন য়ুরোপ হইতে দলে দলে লোক আসিয়া দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। জীবতত্ত্ববিদ্গণ মনে করিতেছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে বৈদেশিকগণ পীড়ার বীজ অজ্ঞাতসারে সঙ্গে আনিয়া বন্য অশ্বগুলিকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়াছিল।

আমরা যে দুইটি প্রাণিজাতির উচ্ছেদের কথা বলিলাম, তাহাকে কেবল মানুষেরই কীর্ত্তি বলিয়া সকলে স্বীকার করেন না। প্রাকৃতিক অবস্থার যে সকল পরিবর্ত্তন আপনা হইতেই চলিতেছে তাহার ফলে অনেক জীবের বংশলোপ ঘটিয়াছে এবং অনেক নূতন জীব জন্মগ্রহণ করিয়া পরিত্যক্ত স্থান অধিকার করিয়াছে। জীববিজ্ঞানে এই প্রকার ঘটনার শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। ম্যামথ্ এবং বন্য অশ্বের বংশলোপকে কেহ কেহ ঐ প্রকার প্রাকৃতিক উৎপাতেরই ফল বলিতে চাহিতেছেন। কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে বাইসন্ নামক মহিষজাতীয় জন্তুর যে তিরোভাব ঘটিয়াছে, তাহার জন্য প্রকৃতিকে দায়ী করা চলে না। বাইসন্ এবং য়ুরোপের বন্য গো-জাতির উচ্ছেদের জন্য এক মানুষই দায়ী। আবাস-ভূমিগুলিকে অরণ্যবর্জ্জিত করিয়া মানুষই তাহাদিগকে নিরাশ্রয় করিয়াছিল, এবং সেই মানুষই নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া তাহাদের বংশলোপ ঘটাইয়াছে। নেকড়ে বাঘ ( Wolf ) এবং বিভার জাতীয় প্রাণীগুলিও ঐ প্রকার অত্যাচারে ইংলণ্ড ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুইডেন্, নরওয়ে, রুশিয়া এবং ফ্রান্স হইতেও ইহারা ক্রমে তাড়িত হইতেছে। আর কয়েক শত বৎসর পরে পৃথিবীর কোন অংশেই ঐ দুই প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যাইবে না। আমরা এখন কঙ্কাল দেখিয়া যেমন ম্যামথের অস্তিত্ব জানিতেছি, তখন

বিড়ালের অস্তিত্ব কেবল তাহাদের মৃৎ-প্রোথিত কঙ্কাল দেখিয়াই বুঝিয়া লইতে হইবে।

অতি প্রাচীন কালে ভল্লুক পৃথিবীর সর্ব্বাংশেই দেখা যাইত। মানুষের অত্যাচারেই তাহাদিগকে ইংলণ্ড ছাড়িতে হইয়াছে। সিংহ য়ুরোপের আর কোন অংশেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মাসিডোনিয়া এবং এসিয়া মাইনরে যে প্রচুর সিংহ ছিল, তাহা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস হইতে সুস্পষ্ট জানা যায়। জিরাফ্ এবং হস্তীও ক্রমে দুর্লভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল প্রাণীর উচ্ছেদ কার্য্যের জন্য এক মানুষই দায়ী। গরিলা এবং সিম্পাঞ্জি নামক দুই জাতীয় বনমানুষের নাম পাঠক অবশ্যই শুনিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদের প্রবর্ত্তক ডারুইন্ সাহেব মানুষকে ইহাদেরি বংশধর বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। আজকাল এ গুলিকেও আর অধিক দেখা যায় না। মানুষের সহিত একটু আধটু দূরসাদৃশ্য দেখিতে পাইয়া আজকাল অনেকে ধরিয়া বাঁধিয়া উহাদিগকে পোষ মানাইতে চেষ্টা করিতেছেন। শত শত বন-মানুষ এই খেয়ালে পড়িয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। এ প্রকার অত্যাচার আর কিছুকাল স্থায়ী হইলে, বোধ হয় ধরাপৃষ্ঠে আর ইহাদিগকেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

পক্ষী এবং পতঙ্গ জাতীয় ক্ষুদ্র প্রাণীগুলি মানুষের নৃশংসতা হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। বিখ্যাত (Dodo) পক্ষী এখন এক প্রকার পুঁথিগত জিনিস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তা'ছাড়া আধুনিক সুসভ্য মানুষের বিলাসের উপকরণ জোগাইবার জন্য যে কত পক্ষীর বংশলোপ হইতে বসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। অষ্ট্রিচ্ এবং ময়ূরের সুদৃশ্য পক্ষই তাহাদের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হয় তো দুই তিন শত বৎসরের পর পৃথিবীতে উহাদের কোন চিহ্নই পাওয়া যাইবে না। প্রজাপতি বা অপর পতঙ্গগুলি দীর্ঘজীবী নয়। দুই তিন দিন মাত্র পক্ষ বিস্তার করিয়া ইহারা আনন্দে বিচরণ করে এবং তার পরই জরাগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সংসারে কাহারো সহিত তাহাদের বৈরিতা নাই, এবং তাহারা কাহারো অনিষ্টও করে না। সুসভ্য মানুষের খরদৃষ্টি ইহাদেরও উপরে পড়িয়াছে। সুন্দর পক্ষ দুটিকে কাটিয়া রাখিবার জন্য সভ্য মানুষ জাল হাতে করিয়া দলে দলে প্রজাপতির পশ্চাতে ছুটিতেছে। এই অত্যাচারে কয়েকজাতীয় সুদৃশ্য প্রজাপতির বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে।

বড় বড় নদনদী এবং জলাশয় গুলির জল দূষিত করিয়া মানুষ নানা জলচর প্রাণীর যে সংহার-কার্য্য নীরবে চালাইতেছে, তাহা আরো ভয়ানক। জলাশয়ের জলকে নির্ম্মল রাখার কার্য্যে জলচর প্রাণী কম সহায় নয়। আমাদের কলকারখানার আবর্জ্জনা ও ড্রেণের দূষিত পদার্থযোগে নদীজল এত কলুষিত হইয়া পড়িতেছে যে, পরম হিতকর জলচর প্রাণিগণও আর জলে থাকিতে পারিতেছে না। ক্রমেই তাহারা নির্ব্বংশ হইতে বসিয়াছে। নদীগুলি এখন অনিষ্টকর জীবাণুতে পূর্ণ। টেমস্ নদীতে আর সামন্ (Salmon) মৎস্য পাওয়া যায় না, এবং আমাদের ভাগীরথী ও পদ্মা মৎস্যহীন হইয়া আসিতেছে। খুব সম্ভবতঃ আর কয়েক শত বৎসর পরে সভ্য দেশে শ্যামলতটশালিনী স্বচ্ছতোয়া নদী দুর্লভ হইবে। কৃমি ও জীবাণুপূর্ণ কলুষবাহী নদী নগর-বক্ষ দিয়া বহিয়া যাইবে। ভবিষ্যৎ মানবজাতিকে এই

বীভৎস দৃশ্য দেখিতেই হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানকে ইহার জন্য দায়ী করিলে চলিবে না। মানুষের অর্থপিপাসা এবং বিলাসপরায়ণতাকেই তখন ধিক্কার দিতে হইবে। প্রজাপতি ও ময়ূরের সুদৃশ্য-পক্ষযুগল এবং হস্তীর তুষার শুভ্র কঠিন দন্তযুগ্ম মানুষের ঘর সাজাইবার উপকরণপ্রস্তরের জন্যই যে ভগবান্ নির্ম্মাণ করেন নাই, এই সহজ কথাটা আধুনিক বৈজ্ঞানিকযুগের মানুষ যে কেন ভুলিয়া যায়, তাহা জানি না। এই সকল পাপের দণ্ড মানুষকে এক দিন গ্রহণ করিতেই হইবে। যে বজ্রের আঘাত মানবজাতি মাথা পাতিয়া লইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, তাহা প্রকৃতির কর্ম্মশালায় প্রস্তুত হইতেছে।

প্রাণিজগৎ ছাড়িয়া দিয়া উদ্ভিদ্‌দিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, মানুষের সংহার কার্য্যের ধারাবাহিকতা সেখানেও দেখা যায়। গাছ কাটিয়া বন পোড়াইয়া মানুষ জগতের এবং নিজের যে অনিষ্ট করিতেছে তাহা উপেক্ষা করিবার নয়। ভূপৃষ্ঠ নিজেই সচ্ছিদ্র। উদ্ভিদ্‌দিগের গভীর এবং সুদূর বিস্তৃত মূল মৃত্তিকাকে জমাট বাঁধিতে না দিয়া সচ্ছিদ্রতা আরো বাড়াইয়া তোলে। বর্ষার জল ভূগর্ভে প্রবেশ করিলে শিকড়-সংলগ্ন মৃত্তিকা স্পঞ্জের ন্যায় সেই জল ধরিয়া রাখে। তা'র পর যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সূর্য্য-তাপে ভূ-পৃষ্ঠ ও জলাশয়গুলি শুষ্ক হইতে আরম্ভ করে, তখন সেই অরণ্য তলের সঞ্চিত জলরাশি মাটির ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া জলাশয়গুলিকে পূর্ণ করিতে থাকে। অরণ্যের এই জলসঞ্চয় কাজটি বড় কম ব্যাপার নয়। বড় বড় জঙ্গলগুলি কাটিয়া ফেলিলেই যে দেশে জলকষ্ট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। ডার্টমুর হইতে খাল কাটিয়া ইংলণ্ডের প্লাইমাউথ্ সহরে জল যোগাইবার ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। ঐ অঞ্চলে যে দুই একটি বড় জঙ্গল ছিল তাহা কাটিয়া ফেলায়, এখন খাল প্রায় শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে। সকল দেশেই অরণ্য ধ্বংসের এই প্রকার প্রত্যক্ষ কুফল হাতে হাতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। বৃক্ষ সকল তাহাদের মূলের দ্বারা কেবল জল আট্‌কাইয়াই যে দেশের হিতসাধন করে তাহা নয়; স্থানীয় স্বাস্থ্যরক্ষাব্যাপারেও ইহাদের অনেক কাজ আছে। খুব শুষ্ক এবং খুব ভিজা বায়ুর মধ্যে কোনটিই স্বাস্থ্যের অনুকূল নয়। এক নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলীয় বাষ্প বায়ুতে মিশ্রিত থাকিলে, কেবল তাহাই আমাদের হিতকর হয়। উদ্ভিদ্-দেহ হইতে অবিরাম যে জলীয় বাষ্প বহির্গত হয়, তাহাই শুষ্কতানিবারণ করিয়া বায়ুকে প্রাণীর স্বাস্থ্য-প্রদ করিয়া তোলে। অরণ্যের ধ্বংসসাধন করিয়া স্পেন্ যে কুকার্য্য করিয়াছিল, এখন দুর্ভিক্ষ ও জলকষ্টের বেদনায় তাহার প্রায়শ্চিত্ত চলিতেছে। মার্কিনেরাও ধীরে ধীরে অরণ্য-উচ্ছেদের কুফল বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন। চীন এবং তিব্বতের সীমান্তপ্রদেশ কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে উর্ব্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দেশ অরণ্য-হীন করায় এখন তাহা প্রাণি-চিহ্ন-বর্জ্জিত মহা প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

পৃথিবীর নানা অংশে যে সকল বৃহৎ মরুভূমি আছে, তাহাদের উৎপত্তির জন্য মানুষকে অবশ্যই সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না। কিন্তু কতকগুলি স্থানে যে সকল ক্ষুদ্র মরুভূমি ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিয়া শ্যামল উর্ব্বর ভূখণ্ডকে গ্রাস করিতে আরম্ভ

করিয়াছে, তাহার জন্য মানুষই দায়ী। প্রাণিদেহের আহত অংশে ক্ষত দেখা দিলে, তাহা যেমন ক্রমেই বিস্তার লাভ করিয়া সুস্থ অংশই জুড়িয়া বসে, ক্ষুদ্র মরুভূমিগুলি সেই প্রকার ক্ষতের ন্যায়ই বিস্তার লাভ করিয়া পার্শ্বস্থ উর্ব্বর ভূভাগকে কুক্ষিগত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মরুভূমির এই প্রকার ক্রমবিস্তার ভূপৃষ্ঠের ব্যাধিবিশেষ, সুতরাং ইহার নিবারণ মানুষের সাধ্যাতীত। কিন্তু মানুষই যে বন কাটিয়া নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুভূমির উৎপাদন করিতেছে, তাহা সুনিশ্চিত। এইগুলি যখন কালক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমগ্র ভূভাগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে, তখন মানুষ নিজের কুকার্য্যের ফল আরো প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে।

---

## রসো বৈ সঃ।

এ জগত রসেতে মগন।<br>
রসেতে ডুবিয়ে রসেরে বাড়িয়ে<br>
করিতেছে সবে জীবন ধারণ।<br>
এ জগত রসেতে মগন।

না হইলে এই রসের সঞ্চার<br>
শুকাইত প্রাণ লুপ্ত এ সংসার<br>
সব শূন্যাকার হত একাকার<br>
থাকিত না কেহ জড় কি চেতন।<br>
এ জগত রসেতে মগন।

বিচিত্র রূপেতে হইয়ে প্রকাশ<br>
করিছে এ রস সবারে বিকাশ<br>
অন্তরে বাহিরে নানা রূপ ধরে<br>
তুলিছে সবারে করি সচেতন।<br>
এ জগত রসেতে মগন।

সর্ব্ব রসাধার অন্তরে ইহার<br>
রসময় হয়ে করেন বিহার<br>
হেরিলে তাঁহারে মোহ যায় দূরে<br>
আনন্দ সাগরে ভাসে ত্রিভুবন<br>
এ জগত রসেতে মগন।

আপনাতে এঁরে হেরেছেন যিনি<br>
অচেতন কভু নাহি হন তিনি<br>
অন্তরেতে তাঁর হয় অনিবার<br>
যোগেতে সবার মরম স্পন্দন।<br>
এ জগত রসেতে মগন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

---

## প্রার্থনা।

প্রতি দিন শুষ্ক কণ্ঠে করি নাম গান<br>
কই দেব এখনোও জুড়ায় না প্রাণ।<br>
এখনত মেটেনাক প্রাণের পিপাসা,<br>
কবে দয়াময় তুমি পুরাইবে আশা?<br>
কবে বর্ষাধারা সম হৃদয়ে আমার<br>
ঝরিবে মঙ্গল ধারা বল অনিবার?<br>
কবে প্রাণ ভরে আমি ডাকিয়া তোমারে,<br>
পাব তৃপ্তি, পাব সুখ, বল এ অন্তরে?<br>
ডাকি ক্ষণ তরে তাহে আশা যে মেটেনা<br>
সর্ব্বদা প্রাণের সাধে ডাকিতে বাসনা।<br>
মিটাও বাসনা মম প্রভু দয়াময়<br>
তুমি ইচ্ছা করিলেই সব পূর্ণ হয়।<br>
পাব কণ্ঠে শক্তি নব, করি নাম গান<br>
অতুল আনন্দে পূর্ণ হবে মন প্রাণ।

---

## প্রার্থনা।

প্রকৃতির সনে বাঁধা হৃদয় আমার,<br>
সুনীল গগন মেঘে ঢাকা অন্ধকার।<br>
নাহি তারা নাহি শশী, তেমনি হৃদয়<br>
নিরাশার তীব্র ঘাতে পূর্ণ সমুদয়।<br>
কিন্তু গগনের মেঘ মুহূর্ত্তে মিলায়,<br>
নির্ম্মল আকাশে পুনঃ শশী শোভা পায়।<br>
জাগে তারকায় জ্যোতি, হৃদয় আমার<br>
তেমনি করিয়া আলো নাশি অন্ধকার,<br>
এস তুমি পূর্ণ শশী, জ্যোতি প্রকাশিয়া<br>
নাশি দৈন্য, দুঃখ, তাপ জুড়াইয়া হিয়া।<br>
পৃথিবীর মোহজাল করি দাও দূর,<br>
এসো আলো কর মম হৃদি অন্তঃপুর।<br>
সরল শিশুর মত তোমার চরণে<br>
লভিয়া আশ্রয় শান্ত হব দীন জনে।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

## নানা কথা।

নিষ্কাম-ভাব। লোকের মনে যখন অন্ধভক্তি প্রবল হয়, তখন তাহারা তীর্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অপেক্ষা তীর্থকেই বড় মনে করে। মহাত্মা আবুবেকার একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি একদিন একটি প্রজ্বলিত মশাল গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি মক্কায় গিয়া মক্কার মসজিদ পোড়াইয়া ফেলিব; তাহা হইলে ভক্তেরা মসজিদের পরিবর্ত্তে মসজিদের প্রভুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিবে। আর এক দিন তিনি বলিয়াছিলেন যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে আমি স্বর্গ ও নরক নষ্ট করিয়া ফেলিতাম; স্বর্গের লোভে ও নরকের ভয়ে মানুষ ঈশ্বরের উপাসনা করে। ইহা বড়ই অন্যায়। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরোপাসনাই কর্ত্তব্য। সুপ্রভাত, মাঘ সংখ্যা।

সেবাধর্ম্ম। বিগত ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আতুরাশ্রমের দশম সাংবৎসরিক উৎসব কলিকাতা বহু বাজার ষ্ট্রীটের ১২৫নং বাটীতে সুসম্পন্ন হয়। সে দিন সেখানে আমরা যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। দীন দরিদ্র অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু বৃদ্ধ বধির সহস্রাধিক ঐ স্থানে প্রাতঃকাল হইতে সমাগত হয়। স্বেচ্ছা-সেবকেরা পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে তৈল মর্দ্দনান্তে স্নান করায় এবং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আহার করায়। যাহারা অন্ধ তাহাদিগকে হাতধরিয়া বসায়, যাহারা চলৎশক্তি রহিত তাহাদিগকে কেদারায় বসাইয়া লইয়া চলে। স্বেচ্ছা-সেবকদিগের মধ্যে ক্লান্তি নাই, বিরক্তির ভাব নাই, হিন্দু মুসলমান ও অন্য জাতীয় ভিক্ষুক বলিয়া ভেদাভেদ জ্ঞান নাই, সকলকেই সমানভাবে তুষ্ট করিবার জন্য তাহারা যেন সকলেই উদ্‌গ্রীব। এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিবার জন্য বঙ্গের ছোট লাট, হাইকোর্টের জজ ও অন্যান্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। ছোট লাটের গলায় পুষ্পমাল্য দিবার উদ্যোগ হইল ছোটলাট সে মাল্য নিজে না লইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইয়া অভ্যাগত আতুরের গলায় নিজহস্তে সাদরে পরাইয়া দিলেন। শুনিলাম ঠিক এই সময়ে মাল্য-প্রদানোদ্যত ছোটলাটের ও আতুরের একখানি ফোটো লওয়া হইয়াছে। যে বিরাট প্রাণের উদ্যোগে এই আতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা ও তাহার এই লোভনীয় পরিণতি, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বিশ্বাস। হাইকোর্টের অন্যতম জজ শ্রীযুক্ত ষ্টিফেন সাহেব ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অনেকগুলি পদস্থ ইংরাজ এই সাধুকর্ম্মের বিশেষ সহায়। স্বেচ্ছাসেবকদিগের মধ্যে কয়েকটি মুসলমান ছিলেন; বক্রী হিন্দু; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ। তাঁহারা এই সাধু কার্য্যে যোগ দিবার জন্য বেহালা বড়িশা পরুই ও অন্যান্য স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সহরতলী হইতে আসিবার জন্য এক ভাড়ায় ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়েতে যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল।

উৎসব।—হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে পণ্ডিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী একদিন উপাসনার কার্য্য করেন। কলিকাতা জানবাজারস্থিত হরিসেনা-মণ্ডলীর উৎসবেও তিনি গমন করিয়াছিলেন।

আচার্য্য।—ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বিগত তিন বৎসর ধরিয়া প্রায় নিয়মিত ভাবে প্রতি বুধবার আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বেদী হইতে যে সকল মূল্যবান ও হৃদয়গ্রাহী উপদেশ প্রদান করেন তাহার অধিকাংশই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার শরীর ক্রমে জীর্ণ হইয়া আসিতেছে। তিনি রাঁচিতে নিবাস-নিকেতন ও উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি জীবনের অবশিষ্ট সময় সেইখানে ক্ষেপণ করিবার বাসনা রাখেন। বিগত ১১ই ফাল্গুন তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী গ্রহণ করিয়া উপদেশান্তে উপাসকমণ্ডলীর নিকট হইতে প্রকাশ্য ভাবে কিছু দিনের জন্য বিদায় চাহিতে গিয়া নিজে চক্ষুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই, সমবেত উপাসকগণও অশ্রুজল বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি তাঁহার উদার ও অমায়িক ব্যবহারে সকলের প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঐ দিনকার তাঁহার প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ, আমরা যত দূর পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি, আগামী সংখ্যায় বাহির করিবার ইচ্ছা রহিল।

---

# বিজ্ঞাপন।

**আগামী ৩০ চৈত্র বুধবার বর্ষশেষ। প্রত্যেক জীবনের একটি বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন—এই বর্ষশেষদিনে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় আদি ব্রাহ্মসমাজগৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে।**

**পরদিন ১ বৈশাখ বৃহস্পতিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটি নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। যখন রাত্রি অবসন্ন এবং দিবা আসন্নপ্রায়, সেই সন্ধিক্ষণে শুভ ব্রহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ ৫ ঘটিকার সময় মহর্ষিদেবের ভবনে ব্রহ্মের বিশেষ উপাসনা হইবে।**

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।